মাসুদ রানা

চীনে সঙ্কট

কাজী আনোয়ার হোসেন

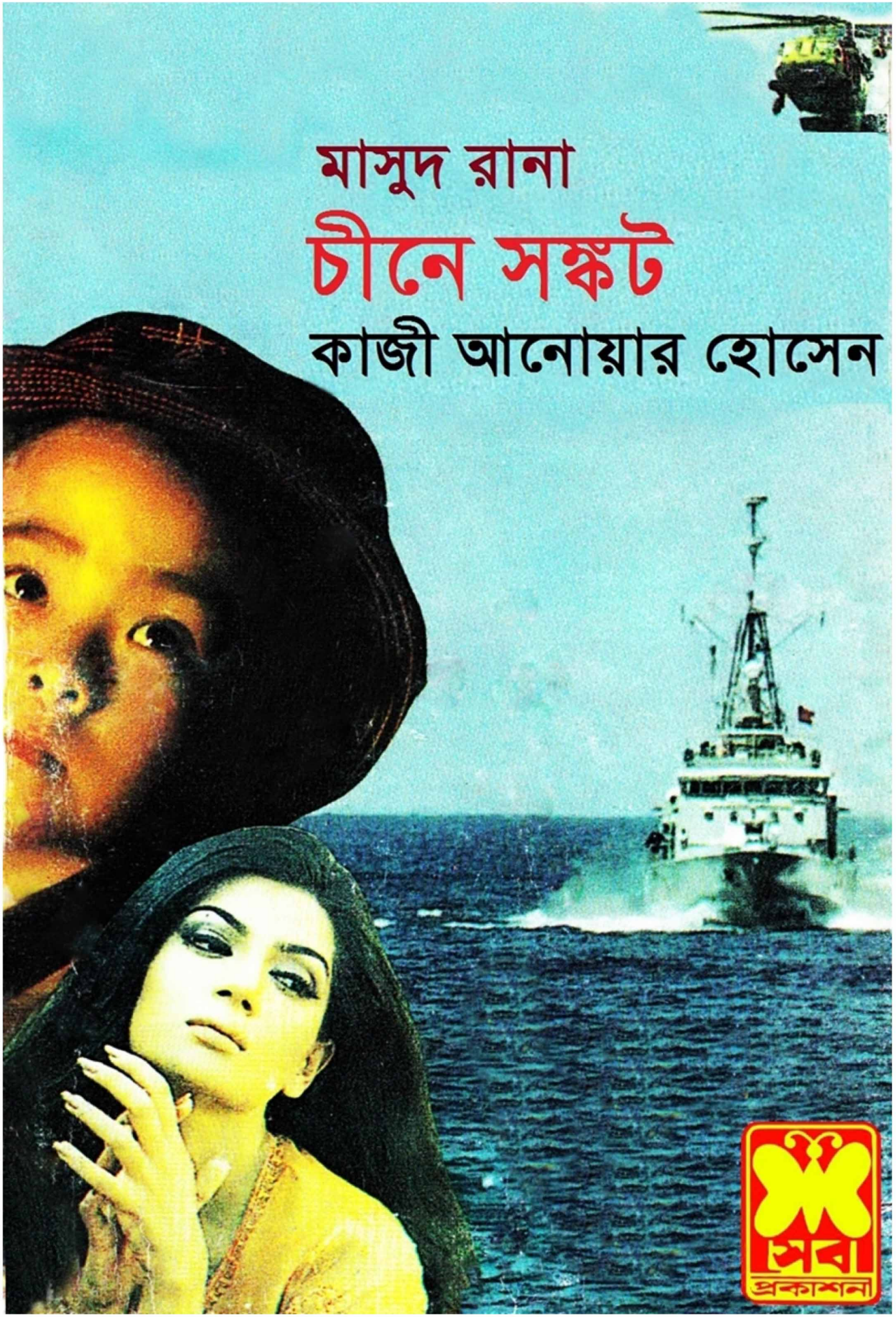

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা ৩১৫

চীনে সঙ্কট

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-7315-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-315
CHEENEY SHANGKAT
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

চৌত্রিশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।

আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

এক নজরে
মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়★ভারতনাট্যম ★স্বর্ণমৃগ ★দুঃসাহসিক★মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা★দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর★সাগরসঙ্গম★রানা! সাবধান!!★বিস্মরণ★রত্নদ্বীপ★নীল আতঙ্ক ★কায়রো মৃত্যুপ্রহর★গুপ্তচক্র★মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র ★রাত্রি অন্ধকার★জাল★অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা ★ক্ষ্যাপা নর্তক★শয়তানের দূত ★এখনও ষড়যন্ত্র ★প্রমাণ কই? বিপদজনক★রক্তের রঙ★অদৃশ্য শত্রু★পিশাচ দ্বীপ★বিদেশী গুপ্তচর★ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা★ তিনশত্রু ★অকস্মাৎ সীমান্ত ★সতর্ক শয়তান★নীলছবি ★প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক★এসপিওনাজ★লাল পাহাড় ★হৃৎকম্পন★প্রতিহিংসা★হংকং সম্রাট কুউউ★বিদায় রানা★প্রতিদ্বন্দ্বী★আক্রমণ★গ্রাস★স্বর্ণতরী★পপি★জিপসী★আমিই রানা সেই উ সেন★হ্যালো, সোহানা ★হাইজ্যাক ★ আই লাভ ইউ, ম্যান ★ সাগর কন্যা পালাবে কোথায়★টার্গেট নাইন★ বিষ নিঃশ্বাস★প্রেতাত্মা ★বন্দী গগল ★জিম্মি তুষার যাত্রা★স্বর্ণ সংকট★সন্ন্যাসিনী★পাশের কামরা★নিরাপদ কারাগার ★স্বর্গরাজ্য উদ্ধার ★হামলা★ প্রতিশোধ★মেজর রাহাত★লেনিনগ্রাদ★অ্যামবুশ★আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর★নকল রানা★রিপোর্টার★মরুযাত্রা★বন্ধু★সংকেত★স্পর্ধা★চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ★চারিদিকে শত্রু★অগ্নিপুরুষ★অন্ধকারে চিতা★মরণ কামড়★মরণ খেলা অপহরণ★আবার সেই দুঃস্বপ্ন★বিপর্যয়★শান্তিদূত★শ্বেত সন্ত্রাস★ছদ্মবেশী★কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন ★সময়সীমা মধ্যরাত★আবার উ সেন ★বুমেরাং★কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ★কুচক্র★চাই সাম্রাজ্য★অনুপ্রবেশ★যাত্রা অশুভ★জুয়াড়ী★কালো টাকা কোকেন সম্রাট ★বিষকন্যা ★সত্যবাবা ★যাত্রীরা হুঁশিয়ার ★অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯★অশান্ত সাগর ★শ্বাপদ সংকুল★দংশন ★প্রলয় সঙ্কেত★ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ ★ডাবল এজেন্ট★আমি সোহানা ★অগ্নিশপথ ★জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান★গুপ্তঘাতক ★নরপিশাচ ★শত্রুবিভীষণ★অন্ধ শিকারী ★দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ★কালো ছায়া★নকল বিজ্ঞানী★বড় ক্ষুধা★স্বর্ণদ্বীপ★রক্তপিপাসা ★অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন★নীল দংশন★সাউদিয়া ১০৩★কালপুরুষ★নীল বজ্র★মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট★অমানিশা★সবাই চলে গেছে★অনন্ত যাত্রা ★রক্তচোষা ★কালো ফাইল মাফিয়া★হীরকসম্রাট★সাত রাজার ধন★শেষ চাল★বিগব্যাঙ★অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ★মহাপ্রলয়★যুদ্ধবাজ★প্রিন্সেস হিয়া★মৃত্যুফাঁদ★শয়তানের ঘাঁটি ধ্বংসের নকশা ★মায়ান ট্রেজার ★ঝড়ের পূর্বাভাস★আক্রান্ত দূতাবাস★জন্মভূমি দুর্গম গিরি ★মরণযাত্রা ★মাদকচক্র ★শকুনের ছায়া★তুরুপের তাস★কালসাপ গুডবাই, রানা ★সীমা লঙ্ঘন★রুদ্রঝড়★ কান্তার মরু ★ কর্কটের বিষ★বোস্টন জ্বলছে শয়তানের দোসর★নরকের ঠিকানা★অগ্নিবাণ★কুহেলি রাত★বিষাক্ত থাবা★জন্মশত্রু মৃত্যুর হাতছানি★সেই পাগল বৈজ্ঞানিক★সার্বিয়া চক্রান্ত★দুরভিসন্ধি★কিলার কোবরা মৃত্যুপথের যাত্রী ★ পালাও, রানা! ★ দেশপ্রেম★ রক্তলালসা ★ বাঘের খাঁচা সিক্রেট এজেন্ট★ **ভাইরাস X-99★ মুক্তিপণ।**

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে এর প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি আইনত দণ্ডনীয়।

এক

এই নিয়ে তিনদিন প্রতি সন্ধ্যায় হংকং শেরাটনের লাউঞ্জে বিদেশী এক এজেন্টের জন্যে অপেক্ষা করছে মাসুদ রানা। সে দেখতে কেমন, নাম কি, বয়স কত, এ-সব কিছুই জানা নেই ওর ।

সন্ধ্যা লেগে আসায় লাউঞ্জ সংলগ্ন বারটি রূপসীদের কলকাকলিতে মুখর হয়ে উঠেছে। হাতে গ্লাস নিয়ে টেরেসে বেরুবার সময় রানা লক্ষ করল, কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দুটি মেয়ে। লম্বা মেয়েটা সম্ভবত ভারতীয়: শাড়িটা জর্জেট, ঝড়ে নুয়ে পড়া নারকেল-বীথি আঁকা, কপালের মস্ত টিপটা হুবহু শিবলিঙ্গ। সঙ্গের মেয়েটা একশো ভাগই চীনা, সদ্যফোটা গোলাপের মত তাজা মুখ, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ফিগার। ওদের তেরছা দৃষ্টি ও কৌতূহল স্রেফ অপচয়ই হলো, কারণ ব্যাপারটা রানা উপভোগ করল ঠিকই, কিন্তু সাবধানতার কারণে দ্বিতীয়বার ওদিকে তাকাল না। ঝাড়া প্রায় ছ'ফুট লম্বা, নড়াচড়ায় একজন কন্ডিশনড্ অ্যাথলেট-এর সাবলীল ভঙ্গি, বোঝা যায় শক্তি ও ক্ষিপ্রতার লাগাম টেনে রাখা হয়েছে: টেরেসে বেরিয়ে এসে পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরুল ও, চলে এল শেষ প্রান্তে। কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবলেও মেঘের ভাঁজে-ভাঁজে এখনও লালচে ছোপ লেগে আছে। ওর সামনে বিচিত্র অলোকসজ্জায় ঝলমল করছে হংকং ও ভিক্টোরিয়া হারবার। মেয়ে দুটো এখনও তাকিয়ে আছে, অনুভব করে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটল ঠোঁটে--নিজেকে সতর্ক করল,

খবরদার, অন্তত এই অ্যাসাইনমেন্টে কাজ ও ফুর্তি এক করে ফেলা চলবে না।

বিদেশী গুপ্তচর যোগাযোগ করতে বড় বেশি দেরি করছে। তার সঙ্গে কথা না হলে বোঝা যাবে না ঠিক কি পরিস্থিতিতে অ্যাসাইনমেন্টটা শুরু করতে যাচ্ছে ওরা। রানার হাতে সময় আছে খুবই কম, অথচ দীর্ঘ একটা পথ পাড়ি দিতে হবে ওকে। আজই অবশ্য অপেক্ষার শেষ দিন, কেউ যোগাযোগ না করলে কাল সকালে একাই রওনা দেবে ও। বস্ ওকে সেই নির্দেশই দিয়েছেন।

ভ্যাপসা গরম পড়েছে, হারবারে ভারী হয়ে আছে বাতাস। তবে রানা যে অস্থিরতা অনুভব করছে তার জন্যে আবহাওয়া বা মেয়ে দুটোকে দায়ী করা যাবে না। এ হলো একজন যোদ্ধার অস্থিরতা, ক্যারিয়ারের কঠিনতম লড়াইয়ের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার পর রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উন্মাদনা।

হারবারের ওপর চোখ বুলাল রানা। কাউলুন আর ভিক্টোরিয়ার মাঝখানে বিভিন্ন কোম্পানির এক ঝাঁক ফেরি যোগাযোগ রক্ষা করছে। প্রতিদিন কম করেও সব মিলিয়ে এক হাজারবার আসা-যাওয়া করে ওগুলো; প্রতিবার সামনে এসে পড়া ফ্রেইটার, সাম্পান, ওয়াটার ট্যাক্সি আর জাঙ্কগুলোকে নানান কৌশলে পাশ কাটাতে হয়। উদ্ভাসিত কাউলুনের পিছনে সাদা ও লাল আলোর ঝলক দেখতে পাচ্ছে রানা, কাইটাক এয়ারপোর্টে একের পর এক ওঠা-নামা করছে যাত্রীবাহী প্লেন। ও যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে মূল চীন কিছুদিন আগেও মাত্র বাইশ মাইল দূরে ছিল, ব্রিটিশরা স্বত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার পর হংকংও এখন আবার মূলের সঙ্গে জোড়া লেগেছে। এখন ক্যান্টন-কাউলুন রেলপথ ধরেও অনেক পশ্চিমা ট্যুরিস্ট হংকঙে আসে। হংকং ছোট একটা দ্বীপ হলেও শিল্পসমৃদ্ধ শহর, তবে ব্রিটিশদের ব্যবস্থাপনার কারণে এখানে বস্তি এলাকার বিস্তার ঘটেনি। তারা চলে যাবার

পর মেইনল্যান্ড থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে বেকার লোকজন চলে আসায় প্রায় রাতারাতি শহরের একটা অংশ বিশাল বস্তিতে পরিণত হয়েছে। ওদিকে বহুতল ভবনের ছাদগুলো পর্যন্ত চীনা মাফিয়া দখল করে নিয়ে ভাড়াটে বসিয়েছে।

হাতের গ্লাস খালি করে লাউঞ্জে ফিরে এল রানা। পিয়ানিস্ট অলস ও বিষণ্ন একটা সুর তুলছে, গ্লাসটা ভরে নিয়ে গাঢ় সবুজ লাউঞ্জ চেয়ারের দিকে এগোল, বারে বসা মেয়ে দুটোর দিকে এবারও তাকাল না। চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে দিল, মাথাটা রাখল কুশন লাগানো নরম টপে। লাউঞ্জে রীতিমত ভিড় এখন, আরও লোকজন আসছে। কামরাটায় আলো খুব কম, দেয়াল ঘেঁষে অর্ধবৃত্তাকারে ফেলা হয়েছে সেটী ও সোফা। খুদে টেবিলগুলো ফাঁক রেখে ফেলা হয়েছে, প্রতি টেবিলে একটা কি দুটো চেয়ার।

রানার চোখ আধবোজা, ঠোঁটে খেলা করছে অস্পষ্ট একটু হাসি; মনের পর্দায় ঢাকা, বিসিআই হেডকোয়ার্টার আর মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। পাঁচদিন আগের ঘটনা।

নিজের চেম্বারে ডেকে প্রিয় শিষ্যকে ভৌগোলিক বাস্তবতার নিরিখে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাঠ দিচ্ছিলেন রাহাত খান।

প্রথমে ভারতীয় সমরসজ্জার বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন তিনি, ওরা রাশিয়ার কাছ থেকে যা নেয়ার তা তো নিচ্ছেই, সম্প্রতি সামরিকবাহিনীকে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত করে দেয়ার মার্কিন প্রস্তাবও গ্রহণ করেছে। এরপর একে একে অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, তাইওয়ান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বললেন। পাকিস্তান ও মায়ানমারকে আলোচনা থেকে আপাতত বাদ রাখলেন তিনি। অস্ট্রেলিয়া প্রসঙ্গে বললেন, দীর্ঘমেয়াদি একটা পরিকল্পনার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ওখানে একটা সামরিক ঘাঁটি তৈরি করতে যাচ্ছে। আর নেপালে যে সিআইএ-র নীল-নকশা

অনুসারে চীনপন্থী কমিউনিস্টদের মেরে সাফ করা হচ্ছে, এ তো সবারই জানা। তাইওয়ান, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটিও গোপন কোন বিষয় নয় সব শেষে বাংলাদেশ। টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর, টেরোরিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা চাওয়ার অজুহাতে, বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দর ব্যবহার করার মৌখিক প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে পেন্টাগন। পরবর্তী পদক্ষেপ হবে সমস্ত রিজার্ভ গ্যাস পাইপলাইনের মাধ্যমে শুষে নেয়া, বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার যে প্রস্তাব দেয়া হবে তাতে সেন্ট মার্টিনে নৌ-ঘাঁটি তৈরি করে দেয়ার লোভনীয় টোপটাও থাকবে। 'মার্কিনীদের এত সব আয়োজন আর পরিকল্পনার একটাই উদ্দেশ্য, চীনকে চারদিক থেকে বেঁধে ফেলা,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু ওরাও তো হিকমতে চীন, তাই না? পাল্টা পরিকল্পনা ওদেরও একটা আছে। কি সেটা?'

এবার বেইজিঙের প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করলেন বস্। ওদের এই প্ল্যান ও টাইম শেডিউল বিসিআই গোপন সূত্রে জানতে পেরেছে। তাইওয়ান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও বাংলাদেশ, এই সাতটা রাষ্ট্র চীনের জন্যে বাস্তব হুমকি হয়ে দেখা দেবে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে। যুদ্ধ লাগলে এই দেশগুলোয় যাতে একযোগে পারমাণবিক বোমা ফেলা যায় সেজন্যে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছে বেইজিং। তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের এই প্রস্তুতি শেষ হবে।'

'তিন বা পাঁচ বছর খুব বেশি একটা সময় নয়,' বলল রানা। 'তবু এর মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে। বাংলাদেশ হয়তো চাপের মুখে নতি স্বীকার করবে না, ফলে সেন্ট মার্টিনে ঘাঁটি গাড়ার মার্কিনীদের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। নতুন প্রেসিডেন্ট এলে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে পারে।'

'ডক্টর কংসু চউ ঠিক সেই ভয়ই পাচ্ছে।' হঠাৎ ভারী ও থমথমে হয়ে উঠল রাহাত খানের অবয়ব। রানা লক্ষ করল, তাঁর

কপালের একটা শিরা দু'তিনবার লাফিয়ে উঠল।

'ডক্টর কংসু চউ?' জিজ্ঞেস করল ও। 'কে সে, স্যার?'

'চীনের টপ নিউক্লিয়ার-বম সায়েন্টিস্ট ও মিসাইল এক্সপার্ট। ওদের কাছে তার এতই মূল্য, গোটা প্রজেক্টের দায়িত্ব এককভাবে তার হাতে তুলে দেয়া হয়েছে—সে নিজের খেয়াল খুশি মত যা ইচ্ছা তাই করতে পারে, দেখার বা বাধা দেয়ার কেউ নেই। বলা হয়, গত বিশ বছরে পারমাণবিক বোমা ও রকেট তৈরিতে চীন যা কিছু অর্জন করেছে, তাতে এককভাবে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি। তবে সে শুধু বিজ্ঞানী নয়, একজন ম্যানিয়াকও বটে। তার ধারণা, ঈশ্বর নয়, একমাত্র মানুষই পারে এই দুনিয়াটাকে আক্ষরিক অর্থে স্বর্গ বানাতে। সব মানুষ নয়, একমাত্র তারই নাকি সে ক্ষমতা আছে।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, বস্ ইশারায় থামিয়ে দিলেন ওকে।

'স্বর্গ বলতে সে কি বোঝাতে চায়, তাও শোনো। তার বানানো স্বর্গে মানুষের রোগ-শোক বলে কিছু থাকবে না। মানুষ পরমায়ু তো পাবেই, সে কোনদিন বুড়োও হবে না। প্রতিটি মানুষ হবে সুদর্শন ও বুদ্ধিমান। তাদেরকে কোন কাজ করতে হবে না। অনন্তকাল ধরে শুধু খাও-দাও আর ফুর্তি করো। ধর্মগ্রন্থে যেমন আছে, যে-কোন জিনিস চাওয়ামাত্র তোমার সামনে চলে আসবে। ডক্টর কংসুর স্বর্গে মহিলাদেরই সুযোগ-সুবিধে বেশি দেয়া হয়েছে—একেকজন যত খুশি সঙ্গি রাখতে পারবে। তো, এরকম একটা স্বর্গ বানাতে হলে আগে তো গবেষণা করতে হবে, তাই না? সেই গবেষণা করতে প্রচুর টাকা দরকার তাই নিজের ক্ষমতাকে ব্যবহার করে টাকা কামাবার বুদ্ধি করেছে ডক্টর কংসু চউ। চীনা নীতি-নির্ধারকদের মত তিন কি পাঁচ বছর অপেক্ষা করতে রাজি নয় সে। তার টাইম শেডিউল হলো মাত্র দু'হপ্তা।'

চমকে উঠল রানা, তারপর আর একচুল নড়ছে না।

'হ্যাঁ, দু'হপ্তা—চোদ্দ দিন,' নিশ্চিত করলেন রাহাত খান।

'বেইজিঙের টাইম শেডিউলের অপেক্ষায় থাকতে রাজি নয় ডক্টর কংসু চউ। রাজনীতি বা রণনীতিতে কখন কার কি পরিবর্তন ঘটে, তাই হামলা করার সময়টাকে এগিয়ে এনেছে সে। তালিকাও একটু বদলানো হয়েছে।'

'নতুন তালিকায় কি বাংলাদেশ আছে?' উদ্বিগ্ন রানা একটা ঢোক গিলল।

'জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে বাদ দিয়েছে ডক্টর চউ। বাদ দিয়েছে তাইওয়ানকেও। কারণ, ওই তিন দেশে আণবিক বোমা ফেলা হলে নিজেদের ঘাঁটি ধ্বংস হওয়ায় প্রচণ্ড খেপে যাবে আমেরিকা'। চীনের তালিকায় পাকিস্তান ও মায়ানমার নেই, কারণ ওরা তাদের বন্ধুরাষ্ট্র, তবে এই ম্যানিয়াকের তালিকায় আছে। আর আছে শ্রীলঙ্কা। হ্যাঁ, বাংলাদেশও আছে। তার প্ল্যান হলো, সাত রাষ্ট্রের কাছে বোমা হামলার হুমকি দিয়ে সাতশো বিলিয়ন ডলার চাঁদা সংগ্রহ।'

'এ-ব্যাপারে চীন সরকার...'

'চীন সরকার এ-ব্যাপারে এখনও কিছু জানে না, রানা,' বললেন রাহাত খান। 'সে-প্রসঙ্গে পরে আসছি। দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, বেইজিং হস্তক্ষেপ করার আগেই কাজটা করে বসতে পারে ডক্টর কংসু। সে-স্বাধীনতা, সে-যোগ্যতা এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ তার আছে।'

'স্যার, আপনি যে-সব তথ্য পেয়েছেন, সবই কি ...?'

'অ্যাবসলিউটলি সলিড। ওখানে আমাদের বিশ্বস্ত একজন ইনফরমার আছে, আজ পর্যন্ত তার পাঠানো কোন তথ্যই ভুল প্রমাণিত হয়নি। শুধু তাই নয়, এই সব তথ্য আমরা ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স থেকেও পেয়েছি। এমন হতে পারে যে ওই একই ইনফরমারের কাছ থেকে তারাও এ-সব জেনেছে। এসপিওনাজে এথিক্স-এর কি অবস্থা তুমি তো জানোই। সে যাই হোক, বিপদ টের পেয়ে স্বভাবতই খুব ঘাবড়ে গেছে আইসিআই।

যৌথ ভাবে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে ওরা আমাদের কাছে। বলছে, যাকেই আমরা পাঠাই, তার সঙ্গে কাজ করার জন্যে একজন এজেন্টকে তৈরি রেখেছে ওরা। আমিও ভাবছি, এরকম টাফ একটা অ্যাসাইনমেন্টে তোমাকে ব্যাক করার মত কেউ থাকলে মন্দ হয় না।'

'স্যার,' বলল রানা, 'বেইজিঙের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তো খারাপ নয়, আমরা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ডক্টর চউ-এর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সব কথা খুলে বলছি না কেন?'

'সেটা স্রেফ পণ্ডশ্রম হবে,' বললেন বৃদ্ধ। 'চীনা নেতারা ডক্টর কংসু চউকে দেবতার চেয়েও বেশি সম্মান করেন। আমাদের অভিযোগ নয়, তার প্রতিবাদই গ্রহণ করবেন তাঁরা। ভাববেন, ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রের প্ররোচনায় তাঁদের সেরা বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞকে অপবাদ দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আরেকটা অসুবিধে হলো, এ বিষয়ে বেইজিঙের সঙ্গে কথা বলতে গেলেই ফাঁস হয়ে যাবে যে তাদের দীর্ঘমেয়াদী সামরিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সবই আমরা জানি। আমাদের ইন্টেলিজেন্স কত গভীরে পেনিট্রেট করে ওদের ওপর নজর রাখছে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে চাই না আমরা ওদের।'

'তারমানে গোপনে ঢুকতে হবে আমাকে চীনে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'কাজটা করতে হবে নিজের বা বাংলাদেশের জড়িত থাকার কথা ফাঁস না করে?'

'হ্যাঁ। অবশ্য যদি সেটা সম্ভব হয়।' নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন রাহাত খান। 'তবে ডক্টর চউ-এর প্রাইভেট ইন্টেলিজেন্সকে তুমি ফাঁকি দিতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। বিসিআই ও আইসিআই-এর ফিল্ড এজেন্টরা সাধারণত তথ্য বিনিময় করে না পরস্পরের সঙ্গে, এবারই প্রথম করছে। আমি খবর পেয়েছি, ওয়্যারলেসে পাঠানো মেসেজ ইন্টারসেপ্ট করার চেষ্টা হয়েছে।'

'এর মানে কি ডক্টর কংসু চউ জানে যে আমরা আসছি?'

'তা নাও হতে পারে। মেসেজ যদি পেয়েও থাকে, তা ডিকোড করা প্রায় অসম্ভব।'

'আমার অ্যাসাইনমেন্টটা কি, স্যার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'মানে, ঠিক কি করতে হবে আমাকে?'

'বলছি তার আগে জেনে নাও, আর কি তথ্য আমরা পেয়েছি। ডক্টর কংসু চউ কুয়াংটাং প্রদেশের কোথাও সাতটা পারমাণবিক বোমা আর সাতটা রকেট লঞ্চার জড়ো করেছে। অনেক আগে থেকেই ওখানে বড়সড় একটা সামরিক স্থাপনা আছে নানা ধরনের আধুনিক মারণাস্ত্র নিখুঁত করার কাজ চলে সেখানে। তোমাদের কাজ হবে মিসাইলসহ ওই সাতটা লঞ্চিং প্যাড উড়িয়ে দেয়া। আমাদের টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট আজই তোমাকে কিছু স্পেশাল ইকুইপমেন্ট দেবে। ডক্টর কংসু চউয়ের ইন্সটলেশন উড়িয়ে দেয়ার কাজে ওগুলো লাগবে তোমার। আমি চাই আগামী দু'দিনের মধ্যে হংকঙে পৌঁছাও তুমি। ভারতীয় এজেন্টের সঙ্গে কিভাবে তোমার যোগাযোগ হবে ইতিমধ্যে তা স্থির করা হয়েছে।'

'তার সম্পর্কে কতটুকু কি জানি আমরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চীনের ভেতরে তার আসা-যাওয়া আছে,' বললেন রাহাত খান। 'ওরা বলছে, খুবই নাকি যোগ্য এজেন্ট। তার সঙ্গে যোগাযোগের পদ্ধতিটাও টেকনিকাল ডিপার্টমেন্ট ব্যাখ্যা করবে তোমাকে।'

রানার মনে অনেক প্রশ্নই ভিড় করে এল, তবে জানে একটারও জবাব পাওয়া যাবে না। চুপ করে থাকল ও।

'তখন আমার কথার মাঝখানে কি যেন বলতে চাইছিলে তুমি,' মনে করিয়ে দিলেন বস্। 'কি?'

'ও, হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ডক্টর কংসু চউও স্বর্গ তৈরি করতে

চায় শুনে কবীর চৌধুরীর কথা মনে পড়ল…'

'আমার ধারণা ওরা দু'জন একই লোক, রানা। ডক্টর কংসু চউ আসলে কবীর চৌধুরীই।'

বিস্ময়ের চেয়ে অবিশ্বাসটাই বেশি করে ধাক্কা দিল রানাকে। ব্যাপারটা মেলাতেও পারছে না, মেনে নিতেও পারছে না। 'তা কিভাবে সম্ভব, স্যার? একজন বাঙালী নাম বদলে চীনা বিজ্ঞানীদের দলে ভিড়ে গেল অথচ কর্তৃপক্ষ কিছুই টের পেল না?'

'একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো, রানা,' বস্ বললেন। 'ব্যাপারটা তো একদিনে ঘটেনি। পাঁচ বছর বা তারও আগে ফিরে যাও। কবীর চৌধুরী নিজের পরিচয় চীনাদের কাছে গোপন করেছে, তোমার এই ধারণাটাও বাদ দাও। পাগল ইত্যাদি যাই বলা হোক, বিজ্ঞানী হিসেবে সে যে এক বিরল প্রতিভার অধিকারী, এটা তো আর মিথ্যে নয় চীনারা হয়তো এটা প্রথম থেকেই জানত, তাই বোমা ও মিসাইল ডেভলপ করার ব্যাপারে কবীর চৌধুরী যখন উপযাচক হয়ে দু'একটা পরামর্শ দিয়েছে তা গ্রহণ না করার তো কোন কারণ নেই। আমার ধারণা, ব্যাপারটা এভাবেই শুরু হয়। কবীর চৌধুরীর পরামর্শে ভাল ফল পাওয়ায় চীন কর্তৃপক্ষ বারবার তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। ডাক পেলে সে-ও সাড়া দিয়েছে। এভাবেই ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। চীনারা বুঝতে পারে, কবীর চৌধুরীকে ব্যবহার করতে পারলে লাভ আছে। সে-ও সুযোগটা পুরোপুরি নেয়। বিশ্বস্ততা অর্জন করার পর স্বাধীনভাবে কাজ করার শর্ত দেয়। বিনা দ্বিধায় তার সব শর্ত পূরণ করে ওরা। আর নামটা? কবীর চৌধুরী হয়তো ওই নামেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। পরে তার আসল পরিচয় অবশ্যই চীনারা জানতে পারে। কংসু চউ চীনা নাম, দু'পক্ষের কেউই ওটা আর বদলাবার গরজ অনুভব করেনি।'

'হ্যাঁ, এভাবে অনেকটাই মেলানো যায়,' বলল রানা 'কিন্তু, স্যার, কবীর চৌধুরীর ক্রাইম রেকর্ড? চীনারা কি কিছুই জানে না?

নাকি জেনেও নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে না জানার ভান করছে?'

'ভুলে যেয়ো না, রানা, দুনিয়ার কোন আদালতে কবীর চৌধুরী আজ পর্যন্ত একবারও দোষী সাব্যস্ত হয়নি। যেহেতু একবারও ধরা পড়েনি, তাই ক্রিমিনাল কবীর চৌধুরী আসলে একটা কাল্পনিক নাম। সাবধানের মার নেই ভেবে সে হয়তো চীনা কর্তৃপক্ষকে বলেছে, তার নাম ব্যবহার করে কোনও এক পাগল এখানে-সেখানে কিছু ক্রাইম করে বেড়ায়। এত বড় একজন বিজ্ঞানী, তার কথা হয়তো ওরা অবিশ্বাস করতে পারেনি। আবার তোমার কথাও সত্যি হতে পারে। চীনারা হয়তো সবই জানে, তবে তাদের কাছে স্বার্থটাই বড় কথা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা।

'ঠিক আছে,' বলে একটা ফাইল টেনে নিলেন রাহাত খান। 'এবার তাহলে এসো। গুড লাক!'

হংকং শেরাটনের লাউঞ্জে ভিড় যত বাড়ছে আলোও যেন তত কমে আসছে। খুব কাছ থেকে না দেখলে বোঝা যায় না কে কোন দেশের ট্যুরিস্ট। চেয়ারে বসে মানুষ দেখছে রানা; তবে শুধু চোখ নয়, খাটছে ওর কান জোড়াও–কি যেন শোনার প্রত্যাশায়।

লাউঞ্জে চীনারাই সংখ্যায় বেশি, তবে ব্রিটিশ আর আমেরিকানদের এক করে ধরলে ওরা দ্বিতীয় সারিতে নেমে আসবে। ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও আছে, তাদের মধ্যে আবার বেশিরভাগই পাগড়ি পরা শিখ। হঠাৎ করে আপনা থেকেই রানার পেশী শক্ত হয়ে গেল। তবে একচুল নড়েনি, কেউ তাকিয়ে থাকলেও লাউঞ্জ চেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা সুদর্শন বঙ্গসন্তানের আকস্মিক উত্তেজনা টের পায়নি। পিয়ানিস্ট নতুন একটা সুর তুলছে। গানটা অনেকবার শুনেছে রানা–'টিকিট টু দা হেভেন...'

গানটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল রানা, তারপর চেয়ার ছেড়ে অলস পায়ে লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল। ছোটখাট আকৃতি, সম্ভবত কোরিয়ান। 'ভারী সুন্দর,' স্মিত হেসে বলল ও। 'আমার অত্যন্ত প্রিয় একটা গান। এমনিই বাজালে, নাকি কারও অনুরোধে?'

'অন রিকোয়েস্ট,' জবাব দিল পিয়ানিস্ট। মুখ তুলে দূরে তাকাল। 'শি ইজ সো বিউটিফুল, শি ডিজার্ভস আ টিকিট।' ধুত্তোর! রানা হতাশ ও বিরক্ত। সন্দেহ নেই, কাকতালীয় কিছু ঘটছে। এরকম ধোঁকায় যে মাঝেমধ্যে পড়তে হয় না, তা নয়। জানে ফলস্ ক্লু, তবু ট্রেনিং-এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে ওকে। কেউ বলতে পারে না হঠাৎ কখন এক-আধটু পরিবর্তন আনা হবে প্ল্যানে। পিয়ানিস্ট সরাসরি যে লাউঞ্জ চেয়ারটার দিকে তাকাল সেটা ছায়ার ভেতর, ম্লান কমলা আলোয় কাঁধে স্তূপ হয়ে থাকা চুলই শুধু দেখা যাচ্ছে মেয়েটার। সেদিকে এগোল ও। ধীরে-ধীরে রঙচটা জিনস, সাদা শার্ট, ওগুলোর ভেতর লম্বা কাঠামো আর ভরাট স্বাস্থ্য ধরা পড়ছে চোখে। বয়সটা তেইশ-চব্বিশের বেশি না। শার্ট ঠেলে উঁচু হয়ে আছে বুক। চোখ দুটো কালো; ইঙ্গিতময়, নীরব ভাষায় সমৃদ্ধ দৃষ্টি; সুগঠিত মুখে প্রত্যয়ের ছাপ। দৃষ্টি এক হতে চোখের পাতা ঘন-ঘন ওঠানামা করল, ওগুলো যেন প্রজাপতির ডানা।

'গানের সুরটা বারবার শুনতে ইচ্ছে করে,' বলল রানা। 'অনুরোধ করায় ধন্যবাদ।' অপেক্ষা করছে ও, আর তখনই ওকে অবাক করে দিয়ে ব্যাপারটা ঘটল।

'টিকিট টু দা হেভেন,' বিড়বিড় করল মেয়েটা, তারপর গানটার সঙ্গে সম্পর্কহীন সাংকেতিক শব্দগুলো উচ্চারণ করল, 'অর টিকিট টু দা হেল—ইট ডিপেন্ডস অন ইউ।' ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসির রেখা বলে দিল, রানার বিস্ময় উপভোগ করছে।

চোখে চোখ, সাবলীল ভঙ্গিতে চেয়ারটার চওড়া হাতলে বসল

রানা।

'মাসুদ রানা,' বিশুদ্ধ উচ্চারণে পরিষ্কার বাংলায় বলল মেয়েটা, কণ্ঠস্বর মিষ্টি জলতরঙ্গ, 'বাংলাদেশের এক কৃতি সন্তান–নমস্কার।' হাত দুটো এক করে বুকের মাঝখানে, গভীর খাদে ঠেকাল। 'হংকঙে স্বাগতম। আমি চন্দনা–চন্দনা কৌশিক। দূষিত কিছু জঞ্জাল সাফ করার কাজে আমি তোমার পার্টনার।'

যেন কতদিনের চেনা–তুমি বলতে আটকাল না জিভে।

'সত্যি আমি অবাক হয়েছি।' রানা হাসছে না। 'অন্তত এরকম একটা অ্যাসাইনমেন্টে কোন মেয়ে পার্টনার আশা করিনি।'

'ধন্যবাদ এই জন্যে যে শুধু অবাক হয়েছ, অনেকের মত হতাশ বা আতঙ্কিত হওনি!' নারীসুলভ কটাক্ষ করতে ছাড়ল না চন্দনা, কথার সুরে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

'হব কিনা তা বলার সময় কিন্তু এখনও আসেনি,' মন্তব্য করল রানা।

'কথা দিচ্ছি, হবে না,' তীক্ষ্ণ শোনাল চন্দনার কণ্ঠ। সাবলীল একটা ঢেউ তোলার ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। পুরো কাঠামোর ওপর চোখ না বুলিয়ে পারা গেল না–চওড়া কাঁধ, চওড়া নিতম্ব, নরম ও একটু গোল; লম্বা, সুগঠিত পা; পুরুষ্ট উরু। চন্দনা দাঁড়িয়েছে কোমর খানিকটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে, যে পোজটাকে অসম্ভব প্ররোচক বলে মনে করে রানা। সন্দেহ নেই, ভারতীয় ললনাদের সৌন্দর্যের নমুনা হিসেবে মনকাড়া এক মডেল এই মেয়ে।

'এই, বলো তো, কথা বলার জন্যে কোথায় বসা যায়?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'ওপরে চলো, আমার স্যুইটে,' সহজ গলায় বলল রানা, যেন এতে কোনও দোষ নেই।

মাথা নাড়ল চন্দনা। 'বিদেশীদের কামরায় ওরা মাইক্রোফোন ফিট করে রাখে।'

স্যুইটের প্রতি ইঞ্চি সার্চ করেছে রানা, তবে চন্দনাকে কথাটা বলল না। প্রায় দু'ঘণ্টা হলো নিচে রয়েছে ও, ইতিমধ্যে কাজটা কেউ করেও থাকতে পারে। 'ওরা বলতে তুমি কাদেরকে বোঝাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'চীনাদের, অবশ্যই,' বলল চন্দনা, একটু অবাক দেখাচ্ছে। 'কেন, আমাদের প্রতি ইন্টারেস্টেড এমন আরও কোন পার্টি আছে নাকি?'

'এ-ব্যাপারে পরে বিশদ আলোচনা হবে,' বলল রানা। 'আপাতত শুধু এটুকু বলি, চীনাদেরকে আমি প্রতিপক্ষ বলে ভাবছি না। তবে ওরা যদি তোমার কামরায় মাইক্রোফোন লুকিয়ে রাখে, আমি আশ্চর্য হব না।'

'রাখবে না জানি, তারপরও সুযোগ পেলেই সার্চ করি,' বলল চন্দনা। 'রাখবে না এই জন্যে যে আমার কাভারটা পুরোপুরি নিচ্ছিদ্র। নেপালী আর্ট স্টুডেন্ট হিসেবে প্রায় দু'বছর হলো হংকঙের ওয়েই চান ডিস্ট্রিক্টে বাস করছি আমি। এসো, দু'জন মিলে আরও একবার না হয় সার্চ করব। ভাল লাগবে তোমার, ওখান থেকে পুরো শহরটা দেখা যায়।'

'ওয়েই চান ডিস্ট্রিক্ট?' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'ওদিকটা তো শুনেছি মেইনল্যান্ড থেকে আসা "হিউম্যান ওয়েভ" দখল করে নিয়েছে। ওখানে কোথায় থাকো তুমি?'

'ওদিকটা না বলে, বলো ওদিকের ছাদগুলো।' হেসে উঠল চন্দনা। 'হ্যাঁ, ব্রিটিশরা চলে যাবার পর মেইনল্যান্ড থেকে রোজই হাজার-হাজার বেকার লোক চাকরির খোঁজে হংকঙে ছুটে আসছে। ওয়েই চান ডিস্ট্রিক্টে ওদেরকে বলা হয় রুফটপ পিপল্। বহুতল ভবনের খোলা ছাদগুলোয় এখন বসবাস করছে প্রায় তিন লাখ চীনা। প্যাকিং কেস, ভাঙা কাঠ আর চ্যাপ্টা করা তেলের ড্রাম দিয়ে খুপরি বানিয়ে দিব্যি আছে ওরা। তৃতীয় বিশ্বের কিছু স্টুডেন্টও ওখানে জায়গা করে নিয়েছে, আমি তাদেরই একজন।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে কয়েকটা বাঁক ঘুরে সেন্ট্রাল রোডের শেষ মাথা পর্যন্ত হেঁটে এল ওরা। 'ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ,' বলে রানার আরও কাছে সরে এসে কাঁধে একটা হাত তুলে দিল চন্দনা। 'ইট'স নট পারসোনাল।'

বিশ্ব বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হংকঙের অপরূপ আলোকসজ্জা চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। প্রতিটি রাস্তায় ঝকঝকে দামী গাড়ির বহর। গোটা শহর জুড়ে অসংখ্য ফ্লাইওভার, ওগুলোর মাথায় এক সুপারমার্কেট থেকে আধমাইল দূরের আরেক সুপারমার্কেটে যাবার জন্যে রেইলিং দেয়া সেতু। কিছু বহুতল ভবন এমন কাঁচ দিয়ে মোড়া, যেন কালো পারদ টলটল করছে। দোকানে দোকানে কেনাকাটার ধুম লেগে আছে–কি বেশভূষা, কি চেহারাসুরত, প্রতিটি মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ মনে হচ্ছে। শুধু একজনকে ছাড়া।

লোকটা নার্ভাস। কি কারণে নার্ভাস বলা কঠিন। এমনকি সে ওদেরকে অনুসরণ করছে কিনা তাও পরিষ্কার নয়। পিছন দিকে না তাকিয়েই, শুধু দোকানের শো-কেসে চোখ রেখে, লোকটাকে দু'বার রাস্তা পেরুতে দেখেছে রানা। তবে অনেকটা দূরে বলে মুখটা দেখতে পায়নি। হয়তো সে ওদেরকে অনুসরণ করছে না, বরং তাকেই কেউ অনুসরণ করছে, তাই সে নার্ভাস।

চন্দনাকে কিছু বলল না ও। সে-ও লোকটাকে দেখেছে কি দেখেনি, প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হলো, লোকটা চন্দনার মত আইসিআই কিনা।

'লোকটা যদি পিছু নিয়ে থাকে,' হঠাৎ বলল চন্দনা, 'আমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। কেন, সেটা পরে বলব। তবে আমার আস্তানায় পৌঁছাবার আগে ওকে খসানো দরকার।'

'লোকটার পিছনে আরেকজন আছে, ওই আরেকজন তোমার পরিচিত,' বলল রানা। 'আমাদেরকে হারিয়ে ফেলার পর লোকটা কোথায় যায়, কার সঙ্গে যোগাযোগ করে, সবই তুমি তার মাধ্যমে পরে জানতে পারবে। ঠিক?'

'ইউ আর ইন্টেলিজেন্ট,' মন্তব্য করল চন্দনা। 'তবে দেখতে চাই লোকটাকে কিভাবে তুমি খসাও।'

চ্যালেঞ্জটা রানার বিশেষ পছন্দ না হলেও, চন্দনার হাত ধরে হন-হন করে হাঁটতে শুরু করল। একটা টেলিফোন বুদকে পাশ কাটাল ওরা, আরও ত্রিশ গজ এগিয়ে বাঁক ঘুরল, তারপর সারি-সারি অ্যান্টিক'স শপগুলোর একটায় ঢুকে পড়ল। শো-কেসের আইটেম দেখার ছলে রাস্তার ওপর নজর রাখছে রানা, বাঁক ঘুরলেই লোকটাকে দেখতে পাবে। চন্দনার হাত ছেড়ে দিয়েছে ও, তবে চন্দনা আবার ওর কাঁধে ধরেছে। গায়ে গা ঠেকে থাকায় মেয়েটার আড়ষ্ট ভাব অনুভব করতে পারছে ও।

ওরা দোকানে ঢোকার পর এক মিনিটও পেরোয়নি, হঠাৎ গুলির শব্দ হলো। কাঁচ মোড়া দোকানের ভেতর আওয়াজটা ভোঁতা শোনালেও, রাস্তায় লোকজনের ছুটোছুটি দেখে বোঝা গেল ঘটনাটা কাছেই কোথাও ঘটেছে। পিস্তলের আওয়াজ, একটাই গুলি। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে একজন চিৎকার করে উঠেছে। টহল পুলিশের একটা দল দোকানের সামনে দিয়ে ছুটে বাঁকের মুখে হারিয়ে গেল।

রানা অনুভব করল, চন্দনার নখ কাপড় ভেদ করে ওর কাঁধে ডেবে যাচ্ছে। 'চলো দেখি কি ঘটেছে।' নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে ওর সঙ্গে দোকান থেকে বেরিয়ে এল চন্দনা, কথা বলার শক্তি নেই।

লোকটা টেলিফোন বুদে ঢুকতে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে লাশ হয়ে পড়ে আছে, শরীরের অর্ধেকটা খোলা বুদের ভেতর। ভিড় ঠেলে সামনে চলে এল রানা, চন্দনার হাতটা ছাড়েনি। কাছ থেকে দেখেই চিনতে পারল ও। এ লোককে শত্রু বা মিত্র, চট করে কোন দলেই ফেলা যায় না। পাকিস্তানী ইন্টেলিজেন্স আইএসআই আর বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর স্বার্থ ও আদর্শ এক ও অভিন্ন নয়, কাজেই আসগর আলী খানকে প্রতিপক্ষ বলে

অনায়াসে ধরে নেয়া যায়। আবার আরেক দিক থেকে বিচার করলে তাকে রানার ব্যক্তিগত বন্ধুই বলতে হবে। তার সঙ্গে মাত্র দু'বার আলাপ হয়েছে ওর–একবার লন্ডনে, আরেকবার জেরুজালেমে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীদের ওপর যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, সেজন্যে আন্তর্জাতিক আদালতে তাদের বিচার হওয়া উচিত, এটা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছিল আসগর। যে-কোন সামরিক অভ্যুত্থানেরও ঘোরতর বিরোধী ছিল সে। লোকটা আইএসআই-এর এজেন্ট হওয়া সত্ত্বেও, তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ইস্যুতে মতের মিল থাকায় রানা তাকে শত্রু বলে ভাবতে পারেনি। শোকে মুষড়ে না পড়লেও, তাকে এভাবে মরে পড়ে থাকতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওর। তবে এ-ও বুঝতে পারছে যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওদের অ্যাসাইনমেন্টের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কাজেই প্রথম কাজ সম্পর্কটা আবিষ্কার করা, দুঃখ বোধ করার সময় পরে পাওয়া যাবে।

অ্যামবুলেন্সে লাশ তোলা হচ্ছে, চন্দনাকে নিয়ে পিছিয়ে এল রানা। 'ওকে তোমার কোন লোক ফলো করছিল,' বলল ও। 'ডাকো তাকে। ঘটনাটা ব্যাখ্যা করতে বলো।'

কেমন যেন থতমত খেয়ে রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল চন্দনা।

'চন্দনা! কি হলো তোমার?'

'এ তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা, রানা,' চাপা গলায় প্রতিবাদ করল চন্দনা। 'খুন হয়েছে একজন পাকিস্তানী স্পাই। আর খুন করা তো দূরের কথা, আমাদের ওপর নির্দেশ আছে আইএসআই-এর কোন এজেন্টকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া টোকাটিও মারা যাবে না। আমাদের লোক তার পিছু নিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গুলিটা সে করেনি, এ আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি।'

'আমি কি বলেছি তোমাদের লোক ওকে খুন করেছে? আমি

শুধু তার রিপোর্টটা শুনতে চাইছি। পিছু যখন নিয়েছিল, সবই সে দেখেছে, তাই না?'

চারদিকে দ্রুত কয়েকবার চোখ বুলাল চন্দনা। তারপর হতাশ ভঙ্গিতে বলল, 'তাকে আশপাশে কোথাও দেখছি না। কে জানে, সে হয়তো খুনীর পিছু নিয়েছে। কাল কোন একসময় আমার সঙ্গে যোগাযোগ হবে তার। যদি কিছু জানাবার থাকে, তখন দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে না,' তীক্ষ্ণ হলো রানার কণ্ঠস্বর, 'তার বক্তব্য অবশ্যই শুনতে হবে আমাকে। এ-ও ব্যাখ্যা করতে হবে, কি উদ্দেশ্যে আসগর আলীকে অনুসরণ করছিল সে। আমার যদি সন্দেহ হয় যে দায়সারা গোছের একটা কিছু ব্যাখ্যা দিয়ে ঘটনাটার দায়দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করা হচ্ছে, তাহলে এই অ্যাসাইনমেন্টে তোমাকে আমি সঙ্গে রাখব কিনা নতুন করে ভেবে দেখতে হবে আমাকে।'

'বোঝা গেল পাকিস্তানী স্পাইটাকে তুমি চিনতে,' বলল চন্দনা। 'ওর মৃত্যু তোমাকে এতটা আঘাত করায় বেশ অবাকই লাগছে আমার। শুধু চিনতে না, সম্ভবত বন্ধুত্বও ছিল, তা না হলে একসঙ্গে কাজ না-ও করতে পারো বলে এভাবে আমাকে হুমকি দিতে না। অথচ আমার ধারণা ছিল পাকিস্তানীরা তোমাদের শত্রু, যেহেতু একাত্তর সালে ওরা তোমাদের ওপর নির্মম গণহত্যা চালিয়েছিল।'

'তোমার ধারণা মিথ্যে নয়,' বলল রানা। 'পাকিস্তানীরা আমাদের মিত্র নয়। তবে ওদের মধ্যে কেউ-কেউ ওই গণহত্যার বিরোধী, বিচারও চায়। আসগর আলী ছিল তাদেরই একজন।'

রানার একটু কাছে সরে এসে আন্তরিক সুরে চন্দনা বলল, 'আই অ্যাম রিয়েলি সরি, রানা। তবে কথাটা আমাকে রিপিট করতে হচ্ছে—আসগরকে আমাদের যে লোক ফলো করার কথা তাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি, সেজন্যেই এত জোর দিয়ে

বলছি যে সে ওকে গুলি করতে পারে না। আপাতত এর বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তাহলে একটা আইডিয়া দাও, কার হাতে খুন হলো সে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার আইডিয়া গ্রহণযোগ্য করতে হলে প্রথমে অন্য একটা প্রশ্নের উত্তর পেতে হবে,' বলল চন্দনা। 'প্রশ্নটা হলো, হংকঙে কি করছিল আসগর আলী? উত্তরটা সহজ—পাকিস্তানও জানে যে অ্যাটম বোমা ফেলার হুমকি দিয়ে মোটা টাকা চাঁদা চাইবে চীন...'

বাধা দিল রানা, 'চীন নয়, ডক্টর কংসু চউ।'

'ওই একই কথা,' জোর দিয়ে বলল চন্দনা, 'ডক্টর কংসু চউ-এর মাধ্যমে চীনই লাভবান হতে চাইছে...'

'না, এক কথা নয়,' রানার গলায় চন্দনার চেয়েও বেশি জোর। 'তোমাকে আমি আরেকবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, চীন আমাদের শত্রু বা প্রতিপক্ষ নয়। ডক্টর কংসু চউ যা করতে যাচ্ছে চীন সরকার সে-সম্পর্কে কিছুই জানে না। চীন ভারতের ন্যাচারাল এনিমি, তোমাদের এই ধারণাটা সত্যি বা মিথ্যে যাই হোক, আপাতত কথাটা তোমাকে ভুলে থাকতে হবে। আরও পরিষ্কার করে বলছি, এই অ্যাসাইনমেন্টে আমরা এমন কিছু করব না যাতে চীনের বড় কোন ক্ষতি হয়ে যায়। ততটুকুই করব যতটুকু ডক্টর কংসু চউকে নিউট্রালাইজ করার জন্যে প্রয়োজন হয়। পরিষ্কার?'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল চন্দনা। 'তোমার কথায় সায় দিতে হলে আগে আমাকে আমার বড়কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। আমাকে ধারণা দেয়া হয়েছে, গোটা ব্যাপারটা চীন সরকারের ষড়যন্ত্র। অথচ তুমি বলছ উল্টো কথা। কাজেই আমাকে নতুন নির্দেশ পেতে হবে।'

'তোমার সততার প্রশংসা করি আমি,' বলল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নয়াদিল্লির সঙ্গে যোগাযোগ করে সব কথা জানাও তাদের। এটা চীনের ষড়যন্ত্র, এই ধারণা অবশ্যই

বদলাতে হবে। তা না হলে তোমার সঙ্গে আমার একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হবে না। এবার তোমার আইডিয়া সম্পর্কে কি বলছিলে বলো।'

'আমাদের মত পাকিস্তানীরাও ষড়যন্ত্রটা সম্পর্কে জানে। আসগরকে পাঠানো হয়েছিল চীনে অনুপ্রবেশ করার জন্যে। ডক্টর কংসুর এজেন্টরা তাকে চিনতে পেরে খুন করেছে।'

'তুমি বলতে চাইছ ডক্টর কংসুর এজেন্টরা হংকঙে আছে?'

'থাকতে পারে না?'

'পারে। কিন্তু তারা শুধু আসগরকে খুন করবে কেন? একই পথের পথিক হিসেবে আমাদের ওপরও তো গুলি চালানোর কথা।'

হেসে ফেলল চন্দনা। 'কালকের দৈনিকে বিজ্ঞাপন দাও, দয়া করে আমাদেরকেও যেন খুন করে ওরা! তুমি ইচ্ছে করে বোকা সাজছ, কাজেই আমার কিছু বলার নেই। গুলি আজ হয়নি, তার মানে কিন্তু এই নয় যে কাল হবে না।'

'এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না,' বলে হাঁটা ধরল রানা। দ্রুত পা চালিয়ে ওর পাশে চলে এল চন্দনা। একটু পর আবার বলল ও, 'আমি সত্যি চিন্তিত, চন্দনা। আসগর কেন খুন হলো, এটা জানা আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থেই খুব জরুরী।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি,' ম্লান গলায় বলল চন্দনা। 'এ-ও বুঝতে পারছি যে আমার ব্যাখ্যা তুমি মেনে নিতে পারছ না।'

'মেনে নিতে না পারার সঙ্গত কারণ আছে, চন্দনা,' বলল রানা। 'ডক্টর কংসু চউ ব্যক্তিগতভাবে আমাকে চেনে। আমাকে সে তার এক নম্বর শত্রু বলে জানে। হংকঙে তার এজেন্টরা থাকতেই পারে, কিন্তু তাদের কাছে আমার চেহারার বর্ণনা নেই, এ হতে পারে না। আমাকে বাদ দিয়ে আসগরকে খুন করবে তারা, এটা মেনে নেয়া সত্যি কষ্টকর।'

'আসগরকে খুন করে ওরা হয়তো তোমাকে সতর্ক করে

দিল।'

'বললাম না, ডক্টর চউ আমাকে চেনে! সে জানে, এভাবে ভয় দেখিয়ে আমাকে নিরস্ত করা সম্ভব নয়।'

'পছন্দ হয়নি, তবে শুনেছ,' বলল চন্দনা। 'এবার তোমার আইডিয়াটা শুনি, দেখি আমার পছন্দ হয় কিনা।'

'প্রথম কথা, আসগর আমাকে ফলো করতে পারে না,' বলল রানা। 'তার সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক, কিছু জানার থাকলে সরাসরি সামনে এসে জিজ্ঞেস করত...'

'হয়তো কাছে আসতেই চাইছিল সে, চউ-এর এজেন্টরা সেটা বুঝতে পেরে গুলি করে। তারা চায়নি আসগর তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করুক।'

'দূর থেকে দেখে আসগরকে আমি চিনতে না পারলেও,' বলল রানা, 'তার রাস্তা পেরুনোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে পারছিলাম যে সে খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে। হয়তো মারাত্মক কোন তথ্য পেয়ে আমাকে জানাতে আসছিল; কিন্তু যেভাবেই হোক বুঝতে পারে আমার কাছে পৌঁছানোর সুযোগ সে পাবে না। মন্দের ভাল বা বিকল্প উপায় হিসেবে তথ্যটা ফোন করে এমন কাউকে জানাতে চাইছিল সে, যাকে আমি চিনি। কিন্তু সে সুযোগও তাকে দেয়া হয়নি, ফোন বুদে ঢোকার আগেই তাকে পিছন থেকে গুলি করা হয়।'

'হ্যাঁ, গুলিটা পিছন থেকেই করা হয়,' বলল চন্দনা। 'মাথার পিছনটা উড়ে গেছে। কিন্তু কাজটা কে করল তা তো বলছ না।'

'সেটাই আমাকে জানতে হবে, চন্দনা।' রানা অন্যমনস্ক।

'তোমাকে নতুন একটা তথ্য দিই,' বলল চন্দনা। 'আসগর কাকে ফোন করতে যাচ্ছিল তা বোধহয় আমি জানি।'

'কাকে?'

'হংকঙে আসগর একা আসেনি, রানা। তার সঙ্গে কাইয়ুম নামে আরও একজন আইএসআই এজেন্টকে দেখা গেছে।

বোধহয় তাকেই ফোন করতে চেয়েছিল সে।'

'হতে পারে।'

'আমরা রওনা হবার আগে তুমি কি কাইয়ুমের সঙ্গে যোগাযোগ করবে?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'হ্যাঁ, করব, যদি সম্ভব হয়,' জবাব দিল রানা। 'সে কোন তথ্য দিতে পারে কিনা দেখা দরকার।'

'সেটা তোমার ব্যাপার,' বলল চন্দনা। 'আমি বাধা দিতে যাচ্ছি না।'

মনে মনে রানা বলল, তোমার বাধা মানছেটা কে!

দুই

প্রদীপের নিচেই যেমন অন্ধকার, জমকালো জৌলুসময় হংকঙের পাশেই তেমনি ছড়িয়ে আছে বিশাল ও নোংরা ওয়েই চান বস্তি এলাকা। এখানে এলে বোঝা যায় জনসংখ্যার বিস্ফোরণ কাকে বলে। প্রতিটি রাস্তায় গিজগিজ করছে মানুষ, তাদের অর্ধেকই ফেরিঅলা; বাকি অর্ধেকের সিকিভাগ বেশ্যা, পকেটমার, পুলিস, ছিনতাইকারী ও ভবঘুরে। রাস্তার পাশে এত দোকান, গুনে শেষ করা যাবে না। সেগুলো আকারে এত ছোট, কল্পনাকেও হার মানায়। গায়ে-গায়ে লেগে থাকা ভিড়ের ভেতরই ছুটছে রিকশা, এমনকি গরুর গাড়িও। ইলেকট্রনিক্সের দোকানে-দোকানে ভিসিআর অন করা, ক্যাসেট বা সিডি প্লেয়ার থেকে কান ফাটানো গান বেরুচ্ছে। রানা ও চন্দনা হাঁটল, এ-কথা বলা যাবে না,

জনস্রোত ওদেরকে ভাসিয়ে নিয়ে এল।

ছাদে উঠে এসে আরেকটা জগৎ দেখতে পেল রানা। ওর সামনের ছাদ থেকে শুরু ধরলে, চারপাশে যতদুর দৃষ্টি যায় অসংখ্য ছাদের ওপর হাজার-হাজার খুপরি, যেন এক সাগর কবুতরের খোপ। প্রতি খোপ বা খুপরি থেকে উপচে পড়ছে মানুষ। তার ভেতরই ছোট ছেলেমেয়েদের চ্যাঁ-ভ্যাঁ আর দম্পতিদের তুমুল ঝগড়ায় কান পাতা দায়। কিছু খুপরির ভেতর রঙিন টিভি আর ফোনও দেখা গেল। পয়সা ঢাললে এখানেও সব জিনিসই মিলবে। পথ দেখিয়ে একজোড়া খুপরির সামনে রানাকে নিয়ে এল চন্দনা। তুলনা করলে এগুলোর মান একটু উন্নতই বলতে হবে। বেশির ভাগ খুপরির ছাদ এত নিচু যে ভেতরে ঢোকার পর সিধে হয়ে দাঁড়ানো সম্ভব নয়, কোনটার আবার ছাদ নেই, কিংবা ছাদ আছে তো দরজা নেই। চন্দনার কুঁড়েঘরের দরজায় তালা ঝুলছিল, ভেতরে ঢুকে দাঁড়ানোও গেল। একই আকারের পাশাপাশি দুটো কুঁড়ে, লম্বায় ও চওড়ায় সমান–দশ ফুট। প্রথম কুঁড়েটায় টেবিল, চেয়ার, বুক শেলফ ও কট–সবই একটা করে। টেবিল ও বুকশেলফে পেইন্টিং-এর ওপর প্রচুর বই আর ম্যাগাজিন দেখল রানা। এক পাশে ছবি আঁকার সরঞ্জাম। পাশের কুঁড়েতে খুদে একটা ড্রেসিং টেবিল আর ছোট একটা টিভি রয়েছে, টিভির পাশে অ্যানসারিং মেশিনসহ ফোনও দেখা গেল। চন্দনা বিব্রত হবে ভেবে রানা আর জিজ্ঞেস করল না যে বাথরুমটা কোথায়।

'ফোন সহ ঘর দুটোর মাসিক ভাড়া চারশো হংকং ডলার,' বলল চন্দনা। 'প্রতিবেশীদের দৃষ্টিতে আমি মাত্রাতিরিক্ত বিলাসী জীবন যাপন করি। ওরা একেকটা কুঁড়েতে গড়ে ছ'জন করে থাকে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'তবে বুঝলাম না তুমি কেন এখানে থাকো।'

'আমার কাভারের সঙ্গে মানিয়ে যায়, তাই,' বলল চন্দনা। 'আর্ট কলেজের ছাত্রীর ফাইভ স্টার হোটেলে থাকাটা সন্দেহজনক নয়?'

'মানলাম তোমার কাভারের সঙ্গে মানিয়ে যায়, কিন্তু এই ছাদ বা কুঁড়ে মোটেই নিরাপদ নয়। কম খরচে স্টুডেন্টরা থাকতে পারে, হংকঙে এরকম নিরাপদ হোটেল অনেক আছে।'

'হংকঙে আমরা আছিই বা কদিন...'

চন্দনাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'আমি চাই না আর একটি দিনও এখানে থাকো তুমি।'

'আজ রাতেই তুমি আমাকে শিফট করতে বলছ?' চন্দনা শুধু অবাক হয়নি, চোখ দুটো কৌতূহলে চকচক করছে।

'আজ রাতে নয়, এখুনি,' বলল রানা। 'আসগর খুন হবার পর কোন রকম ঝুঁকি নেয়া আমাদের সাজে না।'

চন্দনাকে উদ্বিগ্ন দেখাল। 'ও ভগবান, কিছু একটা আশঙ্কা করছ তুমি!'

দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। 'তোমার সুটকেসে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ভরে নাও। নিরাপদ কোন হোটেলে উঠবে তুমি, ওখানেই আমরা আলোচনায় বসব।' চন্দনার দিকে পিছন ফিরে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও, লুকানো মাইক্রোফোন খুঁজছে।

রানার কাণ্ড দেখে মুচকি একটু হাসল চন্দনা, তারপর সুটকেস গোছাবার জন্যে পাশের ঘরে চলে এল। তিন মিনিটের মধ্যে কাজটা শেষ করল সে, সুটকেস হাতে সিধে হবার সময় চোখ পড়ল ফোনটার দিকে। এগিয়ে এসে অ্যানসারিং মেশিন অন করতে পরিচিত একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'যেমন কথা ছিল, মাসুদ রানাকে নিয়ে তুমি শেরাটন থেকে বেরুতে তোমাকে কাভার দেয়ার জন্যে পিছু নিই আমি। রাস্তায় বেরিয়েই আইএসআই-এর দু'জন এজেন্ট আসগর আর কাইয়ুমকে দেখতে পাই। খুব উত্তেজিত ও নার্ভাস লাগছিল ওদের, যেন কেউ ধরতে

আসছে অথচ পালাবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তোমরা একটা বাঁক ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেছ, এই সময় একটা গাড়ি এসে থামল ফুটপাথ ঘেঁষে। ছ'জন চীনা লাফ দিয়ে নেমে ধাওয়া করল আসগর আর কাইয়ুমকে। আসগর সেন্ট্রাল রোডের দিকে পালিয়ে গেল, তার পিছু নিল তিনজন চীনা। তার ভাগ্যে কি ঘটেছে আমি জানি না। তবে কাইয়ুমকে ধাওয়া করে ধরে ফেলে বাকি তিনজন চীনা, ধস্তাধস্তির সময় ওদেরই কারও গুলিতে মারা যায় সে। ওই ঘটনার পর খুব ভয় পেয়ে গেছি আমি, ফোনটা শেষ করেই গা ঢাকা দেব। ওরা চাইনীজ ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট ছিল কিনা বলা মুশকিল। ডক্টর কংসু চউ-এর পারসোনাল সিকিউরিটির লোকজনও হতে পারে। সে যাই হোক, এরপর নিশ্চয়ই আমাদেরকে টার্গেট করা হবে, কাজেই সাবধান...'

ঘাড় ফেরাতেই রানাকে দেখতে পেল চন্দনা, দুই ঘরের মাঝখানের চৌকাঠে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। 'ভগবান!' গলাটা কেঁপে গেল। 'আমার কলিগ গুলি করবে কি, সে তো আসগরের পিছনে ছিলই না! ওদিকে কাইয়ুমও খুন হয়ে গেছে। এ-সব কি ঘটছে, রানা?'

চন্দনার মত রানাও উদ্বিগ্ন। 'তুমি কিন্তু আমাকে আগে বলোনি যে তোমার কলিগও একটা মেয়ে।'

'বলাটা কি জরুরী ছিল?' নার্ভাস, কাঁপা-কাঁপা হাসি দেখা গেল চন্দনার মুখে। 'তোমাকে অবাক করে দিয়ে একটু কৌতুক করার প্ল্যান ছিল আমাদের, সেটা বোধহয় ভেস্তেই যাবে...'

'এটা কৌতুক করার সময় নয়,' নিজের অজান্তেই রানার গলা কঠিন হয়ে গেল। 'মেসেজটা ডিলিট করে তাড়াতাড়ি এসো, এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা উচিত নয় আমাদের,' বলে বাম হাতটা লম্বা করে মুঠো খুলল ও। 'এগুলো তোমার টেবিল ল্যাম্প আর কটে লুকানো ছিল।'

রানার হাতের তালুতে একজোড়া বোতাম আকৃতির

মাইক্রোফোন দেখে চন্দনার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল। 'কী সাংঘাতিক! অথচ আজ বিকেলে সার্চ করে কিছুই আমি পাইনি!'

'তাহলে তুমি বেরুবার পর কেউ রেখে গেছে,' বলল রানা। 'তার কাছে হয় ডুপ্লিকেট চাবি আছে, নাহয় কিভাবে তালা খুলতে হয় জানে। উদ্দেশ্যটাও পরিষ্কার, আমরা কি আলাপ করি শোনা।'

ফোনের অ্যানসারিং মেশিন থেকে মেসেজটা ডিলিট করে রানার পিছু নিয়ে সামনের ঘরে চলে এল চন্দনা, কপালে চিন্তার রেখা।

'আমি দরজা খুলছি,' বলল রানা, হাতে ওর প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে। 'তুমি আমার পিছনে থাকো।'

মাথা ঝাঁকাল চন্দনা। তার এক হাতে সুটকেস, অপর হাত দিয়ে রানার বাহু ধরল। রানা দরজা খুলছে, ওর কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছে সে।

ছাদের আলোছায়ার ভেতর গিজ গিজ করছে মানুষ। সবাই ব্যস্ত, বিশেষভাবে কেউ ওদেরকে লক্ষ করছে না। তবে গাঢ় ছায়ার ভেতর কে বা কারা আছে, কি করছে তারা, বোঝার কোন উপায় নেই। এটা পাঁচতলা ভবনের ছাদ। ওদের নাক বরাবর সামনে আরেকটা সাততলা ভবন, সেটার ছাদেও প্রচুর লোকজনের মাথা দেখা যাচ্ছে। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে চন্দনা দেখল ওটার চিলেকোঠার মাথায় কে যেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, সামনে বাড়ানো হাতে লম্বা ও কালো কি যেন একটা ধরা।

অকস্মাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল চন্দনার শরীরে। 'সাবধান!' চিৎকার করল সে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধাক্কা মারল রানার পিঠে।

ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছে রানা, এই সময় গুলিটা হলো। ওদের মাথার ওপর কুঁড়ের চালে লাগল বুলেটটা।

মেঝেতে ছিটকে পড়ার আগেই শরীরের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেল রানা, একটা মাত্র গড়ান দিয়ে স্থির হলো, লম্বা ও উঁচু করা হাতে

গর্জে উঠল পিস্তলটা।

ডাইভ দিয়ে ওর পাশেই পড়েছে চন্দনা, রানার সঙ্গে সিধে হয়ে ছুটল সিঁড়ির দিকে। রানা পাল্টা গুলি করায় চিলেকোঠার আততায়ী লাফ দিয়ে ছাদে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

গোলাগুলির শব্দ শুনে পাঁচতলার ছাদের মহিলা আর বাচ্চারা কান্না জুড়ে দিয়েছে। খুপরিগুলোর সব আলো প্রায় একযোগে নিভে গেছে। ছাদ থেকে এক ফ্লোর নিচে নেমে এলিভেটরের জন্যে অপেক্ষা করবে কিনা ভাবল রানা। আততায়ীকে ধরতে হলে তার আগেই রাস্তায় নামতে হবে, তাই এলিভেটরের অপেক্ষায় না থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ওরা।

সাততলা ভবনের গেটে পৌঁছাতে দেরি হয়ে গেল ওদের। সদ্য স্টার্ট নেয়া একটা প্রাইভেট কার বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে দেখে যা বোঝার বুঝে নিল রানা। গেটের সামনে কানে ট্র্যানজিস্টর চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থাকা কেয়ারটেকারকে প্রশ্ন করল চন্দনা। লোকটা কোন গুলির শব্দ শোনেনি। তবে জানাল, ছাদ থেকে নেমে আসা তিনজন স্থানীয় ভদ্রলোক এই মাত্র তাদের গাড়িতে উঠে চলে গেলেন। না, সে তাঁদেরকে চেনে না।

রানা ও চন্দনা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে না। বেশ খানিকটা হেঁটে একটা ট্যাক্সি নিল ওরা। রানা ভাবছে। আততায়ীরা যেহেতু চীনা, তাই চিরশত্রু ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কারণে আসগর ও কাইয়ুম খুন হয়েছে, এই সন্দেহ বাতিল করে দিতে হয়।

তবে মনটা খুঁত-খুঁত করছে ওর। সাততলার চিলেকোঠা থেকে চন্দনার কুঁড়েঘরের দরজা খুব একটা দূরে নয়, পেশাদার একজন খুনী টার্গেট মিস করবে না। ওর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল চন্দনা, সেজন্যে অবশ্যই কৃতজ্ঞ ও, কিন্তু ধাক্কা না দিলেও গুলিটা ওকে বা চন্দনাকে লাগত না। ওদের মাথার অনেকটা ওপরে লেগেছে বুলেট। এটা একটা

রহস্য। আরেকটা রহস্য, আততায়ী তিনজন হওয়া সত্ত্বেও গুলি করেছে মাত্র একজন। রানা পাল্টা গুলি করার পর পালাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়ে তারা। ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না। তারা কি সত্যি ওকে বা চন্দনাকে খুন করতে চেয়েছিল? নাকি উদ্দেশ্য ছিল শুধু ভয় দেখানো?

চন্দনার হাতটা ধরে একটু চাপ দিল রানা, মৃদু স্বরে বলল, 'আই অ্যাম গ্রেটফুল।'

'ডোন্ট মেনশন ইট,' বলল চন্দনা। 'কারা ওরা, রানা? ডক্টর কংসু চউ-এর এজেন্ট?'

'তাদের প্রফেশনাল হবার কথা,' জবাব দিল রানা। 'এদের কাজে প্রচুর ত্রুটি ছিল, তুমি লক্ষ করোনি?'

'হ্যাঁ। গুলিটা লাগত না। দ্বিতীয়বার অ্যাটেম্পটও নেয়নি। চলে যাওয়াটা কেমন পালাবার মত।'

রানার নির্দেশ মত পিং-পং রোডে, থ্রী স্টার হোটেল সানফ্লাওয়ার-এর সামনে থামল ট্যাক্সি। কাউন্টারে পাসপোর্ট দেখিয়ে দুই কামরার একটা স্যুইট বুক করল চন্দনা, হাতব্যাগ থেকে মাস্টার কার্ড বের করে দু'দিনের ভাড়া অগ্রিম মিটিয়ে দিল।

স্যুইটটা তিনতলায়। সুটকেস রেখে পোর্টার চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে সিটিংরুমে চন্দনার সামনের একটা সোফায় বসল রানা। 'হ্যাঁ, এবার বলো এই অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে কি জানো তুমি।'

'আমাকে বলা হয়েছে,' শুরু করল চন্দনা, 'চীনা সামরিক বাহিনী কুয়াংটাং প্রদেশে একটা মিসাইল ঘাঁটি তৈরি করেছে। জায়গাটা শিলাং-এর উত্তরে কোথাও। চীনের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী ডক্টর কংসু চউ ওই ঘাঁটির ইনচার্জ। বিজ্ঞানী হলেও, ওঅরলর্ডও বলা যায় তাকে, চীন সরকার তাকে সামনে রেখে ভারতসহ সাতটা দেশকে ব্ল্যাকমেইল করার জন্যে ওই ঘাঁটিতে

নিউক্লিয়ার ওঅরহেড ফিট করা সাতটা মিসাইল বসিয়েছে।

'আমাকে আরও বলা হয়েছে, খুঁজে নিয়ে ওই ঘাঁটিতে ঢুকতে হবে আমাদের। বাকি কাজটা তুমি সারবে, আমার সাহায্য নিয়ে। বাকি কাজ বলতে, প্রতিটি লঞ্চিং প্যাডে ডেস্ট্রয়ইং ডিভাইস বা ডেটোনেটর ফিট করে বিস্ফোরণ ঘটাবে তুমি। তবে শুরুতেই যেভাবে লাশ পড়তে দেখছি, আমি খুব একটা আশাবাদী হতে পারছি না, রানা।'

'ভয় পাচ্ছ নাকি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভয় পেলে এখনই বলো। পরে আর রিপ্লেসমেন্টের সুযোগ পাওয়া যাবে না।'

'ভয় পাচ্ছি এই সেন্সে যে কাজটা হয়তো আমাদের জন্যে ইমপসিবল হয়ে দেখা দিতে পারে। বিপদের বা মৃত্যুর ভয়? প্লীজ, রানা, হাসিয়ো না তো!' নিজেই অবশ্য একটু হাসল চন্দনা।

আগেই অর্ডার দেয়া হয়েছে, রুম সার্ভিস ওদেরকে কফি দিয়ে গেল।

লোকটা চলে যেতে এবার চন্দনাই দরজা বন্ধ করল। ফিরে এসে ভাঁজ করা হাঁটু সোফায় তুলে আরাম করে বসল সে। 'অনেক তথ্যই বিনিময় হওয়া দরকার, রানা। এই যেমন, তোমার ডেটোনেটিং ডিভাইস সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে—কোথায় ওগুলো রেখেছ, কিভাবে কাজ করে।'

'হ্যাঁ, ঠিক আছে,' বলল রানা। 'তবে এসব জানতে হলে আমার স্যুইটে যেতে হবে তোমাকে। এমনিতেও বেরুতে হবে, কারণ আজ রাতে তোমার একটা ডিনার পাওনা হয়েছে।'

'ওমা, সত্যি? থ্যাঙ্ক ইউ, রানা।' চন্দনার মুখটা আনন্দে ঝলমল করে উঠল। 'নিচের লাউঞ্জে গিয়ে বসো, তৈরি হয়ে নামতে খুব বেশি হলে দশ মিনিট লাগবে আমার।'

দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে রানা, পিছন থেকে চন্দনা জানতে চাইল, 'তুমি চাও আমি শাড়ি পরি?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। 'হ্যাঁ, খুশি হব।'

'ধন্যবাদ।'

স্যুইট থেকে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। এলিভেটরের দিকে এগোচ্ছে, হাঁটার গতি ধীরে ধীরে কমে এল। তারপর ঘুরল ও, ফিরে আসছে। দশ মিনিট অনেক লম্বা সময়, নক করে কেউ যদি নিজেকে মাসুদ রানা বলে পরিচয় দেয়, চন্দনা দরজা খুলে দিতে পারে। কাজেই ওকে সাবধান করা দরকার।

দরজাটা নিঃশব্দে খুলল রানা। তারপর যা দেখল, অনেকদিন ভুলবে না ও। সত্যি কথা বলতে কি, এরকম দৃশ্য দেখার ভাগ্য সবার হয় না।

এত আনন্দ আর উচ্ছ্বাস সম্ভবত স্বর্গীয় কোন অপ্সরীকেই মানায়। চোখ বুজে চরকির মত পাক খাচ্ছে চন্দনা, অদৃশ্য ও অশ্রুত তবলার তালে তাল মিলিয়ে কার্পেটে পা ঠুকছে, হাত দুটো সোনালি চিলের ডানা যেন, ঢেউ খেলছে বাতাসে। অস্পষ্ট হলেও রানা শুনতে পাচ্ছে কথাগুলো: 'আমার অনেক দিনের স্বপ্ন তোমাকে কাছে পাব...মাসুদ রানা, আমি তোমার অন্ধ ভক্ত...আই লাভ ইউ...'

তাড়াতাড়ি, তবে নিঃশব্দেই, দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল রানা। ও চায় না ধরা পড়ে গিয়ে লজ্জা পাক মেয়েটা।

সাবধান করার দরকার নেই। চন্দনার জন্যে করিডরেই অপেক্ষা করবে রানা।

হংকং শেরাটনের সাততলায় রানার স্যুইট। যান্ত্রিক ছারপোকার সন্ধানে দু'জন মিলে সার্চ করল ওরা, তবে কিছু পেল না। রানা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল হাতে শেভিং ক্রীম-এর একটা ক্যান নিয়ে। সতর্কতার সঙ্গে তলার দিকের একটা নির্দিষ্ট স্পট চেপে ধরে মোচড় দিতে ক্যান-এর একটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। একই পদ্ধতি বারবার প্রয়োগ করে সব মিলিয়ে ক্যানটাকে

সাতভাগ করে সাজাল ও সাইড টেবিলের ওপর।

'এগুলো?' টেবিলের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল চন্দনা।

'হ্যাঁ, এগুলো,' জবাব দিল রানা। 'মাইক্রো-এঞ্জিনিয়ারিঙের মাস্টারপীস বলতে পারো, একেবারে লেটেস্ট আবিষ্কার। ছোট চাকার মত ক্যানের এই অংশগুলো দেখতে নিরীহ ভালমানুষ মনে হলেও, এদের পেটে সাত হাত দাড়ি আছে। সাত হাত দাড়ি মানে প্রিন্টেড ইলেকট্রনিক্স সার্কিটের মাঝখানে অতি সামান্য নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোসিভ। যেমনই দেখাক, এগুলো আসলে খুদে নিউক্লিয়ার ডিভাইস, অ্যাকটিভেট করা হলে প্রতিটি পঞ্চাশ গজ পরিধির মধ্যে যা কিছু পাবে সব নিশ্চিহ্ন করে দেবে। অ্যাটমিক হলেও, তেজস্ক্রিয়ার বিকিরণ অতি সামান্য সেটুকুও ওপরে উঠে হাওয়ায় মিশে গায়েব হয়ে যাবে।

'এর বড় একটা সুবিধে হলো, লঞ্চিং প্যাড-এর কোথাও ফিট না করলেও চলবে। ওখানে লুকিয়ে রাখতে গেলে ধরা পড়ার ঝুঁকি নিতে হবে, লুকিয়ে রাখার পর জিনিসটা কেউ দেখে ফেলারও ভয় থাকবে। আমরা লঞ্চিং প্যাড থেকে খানিক দূরে মাটির নিচে পুঁতে রাখব, তাতেও এগুলো অ্যাকটিভেটর সিগন্যাল রিসিভ করতে পারবে। প্রতিটি ডিভাইস একটা করে মিসাইল আর ওঅরহেড সহ লঞ্চিং প্যাডটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেবে।'

'কিভাবে অ্যাকটিভেট করা হয়?'

'মাধ্যমটা হচ্ছে ভয়েস সিগন্যাল।' শেভিং ক্রীমের ক্যানটা অত্যন্ত সাবধানে আবার জোড়া লাগাচ্ছে রানা। 'হ্যাঁ, শুধু আমার গলার আওয়াজ পেলে অ্যাকটিভেট হবে। বিশেষ কয়েকটা শব্দের একটা কম্বিনেশন। ভাল কথা, এই ক্যানের সেন্টার টিউবে প্রচুর পরিমাণে শেভিং ক্রীম আছে, অন্তত এক মাস তো চলবেই, তারপরও এটাকে সাধারণ একটা শেভিং ক্যানের মতই দেখাবে।'

'একটা ব্যাপার এখনও আমি বুঝিনি,' বলল চন্দনা। 'ভয়েস

অ্যাকটিভেটর নিশ্চয়ই একটা ইউনিট-এর মাধ্যমে অপারেট করে, ওই ইউনিট-এর কাজ হলো গলার স্বর ইলেকট্রিকাল সিগন্যালে রূপান্তরিত করা, তারপর ওই সিগন্যাল অবজেক্ট-এ পাঠানো, অবজেক্ট যাতে অ্যাকটিভেট হতে পারে। তোমার সেই সিগন্যাল ইউনিটটা কোথায়?'

হাসল রানা। 'আছে। কিন্তু কোথায় আছে জানলে নিশ্চয়ই তুমি ওটা দেখতে চাইবে না।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল চন্দনা। 'কেন দেখতে চাইব না?'

'না, মানে, তুমি মেয়ে তো, তাই ভাবছি দেখাতে চাইলে তুমি না আবার কী ভেবে বসো...'

একটা ঢোক গিলল চন্দনা। 'কেন, কোথায় ওটা?'

'যেখানেই থাকুক, দেখে কাজ নেই তোমার,' বলল রানা, রহস্য করার সুযোগটা পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করছে।

কাঠ-কাঠ শুকনো গলায় চন্দনা বলল, 'কাজ নেই মানে? জিনিসটা অবশ্যই আমাকে দেখতে হবে।'

'আর ইউ শিওর?' রানা সিরিয়াস হবার ভান করল।

'অফকোর্স আই য়্যাম শিওর। শো মি।'

'তাহলে আমাকে কাপড় খুলতে হবে যে!'

'অ্যাঁ?' ঘাবড়ে গেল চন্দনা। 'মানে, না খুলে দেখানো যায় না?'

'উঁহুঁ। তা সম্ভব নয়।' মাথা নাড়ল রানা এপাশ-ওপাশ। 'তবে কেবল ছুঁয়ে দেখতে চাইলে হয়তো সম্ভব।'

'তাহলে–তাহলে ছুঁয়েই না হয় দেখি?'

'যেখানটা ছুঁতে হবে সেটাও অবশ্য খুব ভাল জায়গা নয়!' হাসল রানা, 'তবু অ্যাসাইনমেন্ট-পার্টনার চাইলে তো আর বারণ করা যায় না।' উঠে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরতে শুরু করল রানা। ভয়ে ভয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে চন্দনা। 'এদিকে এসো, তোমার হাতটা সামনে বাড়াও।'

একটু ইতস্তত করে হাত বাড়াল মেয়েটি।

ওর হাত ধরে আর একটু কাছে টানল রানা। হাতটা টেনে নেয়ার চেষ্টা করল চন্দনা। নীল শিফন শাড়ির নিচে সাদা ব্লাউজ ফুলে আছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকের উত্থান-পতনের গতি আরও একটু বাড়ল। এবার ওর তর্জনীটা নিয়ে ঠেকাল নিজের নিতম্বের একপাশে। খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে কয়েকবার টেপাটিপি করেই তর্জনীর ডগায় ছোট, শক্ত জিনিসটার স্পর্শ পেল চন্দনা। চামড়ার বেশ কিছুটা নিচে রয়েছে ওটা।

'হ্যাঁ, পেয়েছ,' বলল রানা। 'বেশিরভাগ পার্টসই প্লাস্টিক, তবে কিছু মেটালও আছে। আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টের কারিগররা যত্ন করে চামড়ার ভেতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। নিট, তাই না?'

'নিট, তবে যথেষ্ট নিট নয়,' চোখ তুলে বলল চন্দনা, একটু যেন হাঁপিয়ে উঠেছে। 'তুমি ধরা পড়লে, সফিসটিকেটেড এগজামিনেশন মেথড এক মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের করে ফেলবে ওটা, যতই বাজে জায়গায় ফিট করা হোক না কেন।'

'না, তা পারবে না,' চেয়ারে ফিরে গিয়ে ব্যাখা করল রানা। 'ওই নির্দিষ্ট জায়গায় ইউনিটটা বসানো হয়েছে আমাদের টেকনিশায়নদের রুচিবিকৃতির কারণে নয়, ভিন্ন একটা কারণে। অতীত-দুঃখের স্যুভেনির হিসেবে ওখানে বেশ কিছু শ্র্যাপনেল বয়ে বেড়াচ্ছি আমি। কোন্‌টা কি, ওরা আলাদা করতে পারবে না।'

ধীরে-ধীরে চন্দনার মুখ উজ্জ্বল হলো। মাথা ঝাঁকাল ও। 'ইমপ্রেসিভ, ওয়েল প্ল্যানড্।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই যে অন্তত কিছু টেকনিকাল ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশ অনেকটা পিছিয়ে আছি আমরা।'

মনে-মনে হাসল রানা, কিন্তু সে-হাসি ওর মুখে সামান্যতম ছাপও ফেলল না। মেয়েটা বিশ্বাস করেছে ওর কথা। ধরে নিয়েছে

সত্যি কথাটাই বলেছে ও।

প্রয়োজন ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য কাউকে জানানোর নিয়ম নেই। রানার গলার একপাশে আরও কিছু শ্র্যাপনেল আছে, সিগন্যাল ইউনিটটা ওগুলোর ভেতর লুকানো। প্রয়োজন দেখা দিলে ওটার অবস্থান অবশ্যই জানাবে রানা, তবে তার আগে চন্দনাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত।

মেয়েটির গোপন দুর্বলতার কথা জেনে ফেলেছে রানা, কিন্তু বদ্ধ ঘরে ওর প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ করেনি চন্দনা—এজন্যে মনে মনে খুশি হলো রানা। সস্তা কোনও মেয়ে এ নয়।

'এবার খুশি তো? চলো, তাহলে ডিনারটা সেরে নেয়া যাক,' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বলল রানা। 'যথেষ্ট রাত হয়েছে।'

'ডিনারের পর আবার কি আমরা এখানে ফিরব?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা। 'কিভাবে মেইনল্যান্ডে ঢুকব সেই প্ল্যানটাই তো করা হয়নি এখনও।'

'সব ঠিক করা আছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'কাল সকালে ব্যাখ্যা করব।'

স্যুইটের দরজায় তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

তিন

পরদিন সকাল ঠিক দশটায় নক হলো দরজায়।

রানার ঘুম ভেঙেছে ছ'টায়। হোটেলের জিমনেশিয়ামে দু'ঘণ্টা

ব্যায়াম। ধীরেসুস্থে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামানো, ব্রেকফাস্টে বসা, একই সঙ্গে ইংরেজি একটা দৈনিকের ওপর চোখ বুলানো। হংকং পুলিস কোন রাখঢাক করেনি, চাইনিজ ইন্টেলিজেন্সের বরাত দিয়ে স্পষ্ট করেই রিপোর্টারদের জানিয়েছে যে কাল সন্ধ্যায় কাইয়ুম ও আসগর নামে যে দু'জন পাকিস্তানী পাসপোর্টধারী খুন হয়েছে, তারা আইএসআই-এর এজেন্ট ছিল। খুনীদের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করে পুলিস আরও জানিয়েছে, কেস দুটো এখন আর তাদের হাতে নেই; ঘটনার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা জড়িত বিধায় তদন্তের দায়িত্ব স্বাভাবিক নিয়মেই ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট গ্রহণ করেছে। বলা হয়েছে, পোস্টমর্টেম শেষ হলে লাশ দুটো ইসলামাবাদে পাঠিয়ে দেয়া হবে।

দরজা খুলে দিতে মুক্তো ঝরা হাসি নিয়ে ভেতরে ঢুকল চন্দনা। 'রুম সার্ভিসকে কফি দিতে বলে এসেছি,' বলে রানাকে পাশ কাটিয়ে একটা সোফায় বসল। 'জানো, কাল তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি...'

'জরুরী?' দরজা বন্ধ করে সোফার দিকে ফিরছে রানা।

'প্রফেশনালি নয়।' হেসে উঠল চন্দনা। 'পারসোনালি অবশ্যই জরুরী।'

'কিন্তু কাল তো আমি স্পষ্ট মেসেজ পেয়েছি, কাজের সময় ব্যক্তিগত কোন বিষয়কেই প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।'

চন্দনার মুখের হাসি ধীরে-ধীরে নিভে গেল। 'তুমি মনে হচ্ছে আমার ওপর রেগে আছ?' ম্লান সুরে জানতে চাইল সে।

একটু দূরত্ব বজায় রেখে একটা সিঙ্গেল সোফায় বসল রানা। 'না, রাগ করব কেন। ঠিক আছে, কি বলতে চাইছিলে বলো।'

'এখন আর মূড নেই।' জিনস ঢাকা হাঁটুর ওপর কনুই রেখে, সেই হাতের তালুতে চিবুক ঠেকাল চন্দনা। 'তুমি বরং ভেতরে ঢোকার প্ল্যানটা শোনাও আমাকে। তার আগে বলে নিই, মেইনল্যান্ডে বহুবার গেছি আমি, প্রতিটি রুট চিনি, কোনটার কি

সুবিধে-অসুবিধে সব আমার মুখস্থ। তোমার প্ল্যানে আমি যদি কোন খুঁত পাই তাহলে কিন্তু সেটা বাতিল হয়ে যাবে। তখন আমার প্ল্যান ব্যাখ্যা করব আমি।'

'ফেয়ার এনাফ,' বলে শুরু করল রানা। 'অ্যারেঞ্জমেন্টটা বিসিআই করেছে। আমরা রওনা হব বোট নিয়ে। প্রথমে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ক্যান্টন-কাউলুন রেলপথ ধরে যাব, কিন্তু স্টেশনগুলোয় ডক্টর কংসু চউ-এর এজেন্টরা পাহারা দেয় শুনে সেটা বাতিল করা হয়েছে।'

'কিন্তু বোট নিয়ে যাওয়া তো আরও বিপজ্জনক,' সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিবাদ করল চন্দনা। 'কোস্টলাইন, হংকঙের দু'ধারে অন্তত একশো মাইল পর্যন্ত, চীনা গানবোট আর পেট্রলবোট কড়া পাহারা দিচ্ছে। নিঃসঙ্গ একটা বোট দেখামাত্র সন্দেহ হবে ওদের। আর একবার যদি ফাঁদে আটকা পড়ি, পালাবার কোন জায়গাই পাব না।'

'জানি,' বলল রানা। 'তবে আমরা যাচ্ছি তানকা হিসেবে।'

'ও, সে-কথা আগে বলবে তো!' চন্দনার চেহারায় স্বস্তি ফিরে এল। 'হ্যাঁ, ঠিক আছে, তানকাদের সঙ্গে গেলে কোন সমস্যা হবার কথা নয়। যাক, আমার সঙ্গে তোমার প্ল্যান মিলে যাচ্ছে। আমিও হংকঙের ওই বোট পিপ্‌ল্‌-এর সঙ্গে ভিড়ে মেইনল্যান্ডে ঢোকার কথা ভেবেছি।'

নক হলো দরজায়। কফির সরঞ্জামসহ ট্রলিটা স্যুইটে রেখে ফিরে গেল রুম সার্ভিস।

'তানকারা যাযাবর বা বেদে নয়,' চন্দনার হাত থেকে একটা কাপ নিয়ে বলল রানা, 'অথচ শত-শত বছর ধরে নৌকা, বজরা আর জাঙ্কে জীবনযাপন করছে ওরা। ওদেরকে আলাদা একটা সম্প্রদায় হিসেবে দেখা হয়। অলিখিত আইনে ডাঙায় বসবাস করার, ডাঙার কাউকে বিয়ে করার বা সরকারী চাকরি পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ওদেরকে। সম্প্রতি কিছু কিছু বিধি-নিষেধ প্রত্যাহার করা হলেও, আসলে মূল স্রোতের সঙ্গে

নিজেদেরকে ওরা খাপ খাওয়াতে পারছে না। তবে কিছু সুবিধেও ওরা ভোগ করে। জাঙ্ক নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পারে, জল পুলিস বাধা দেয় না। কোস্টলাইন ধরে একটা তানকা জাঙ্ককে যেতে দেখলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'

'ঠিক আছে, জাঙ্ক নিয়েই গেলাম আমরা,' মাথা ঝাঁকাল চন্দনা। 'তীরে আমরা নামছি কোথায়?'

ব্রীফকেস থেকে একটা ম্যাপ বের করে টেবিলের ওপর ভাঁজ খুলল রানা। 'এটা কোয়ানটাং প্রভিন্স-এর ডিটেইলড ম্যাপ। এখানে,' ম্যাপে আঙুল রাখল, 'হু চ্যানেল ধরে হুমেন-চাইকে ছাড়িয়ে যাব, জাঙ্ক নিয়ে যতদূর যাওয়া নিরাপদ বলে মনে হবে ততদূর গিয়ে তীরে উঠব, হাঁটব যতক্ষণ না রেললাইনটা পাই। আমাকে বলা হয়েছে, ডক্টর কংসু চউ-এর সায়েন্টিফিক অ্যান্ড মিলিটারি ইনস্টলেশনটা শিলাং-এর উত্তরে কোথাও। হুমেনচাই মেইনল্যান্ডের যথেষ্ট ভেতরে, ওটাকে ছাড়িয়ে গিয়ে ক্যান্টন-কাউলুন রেলপথ ব্যবহার করতে কোন অসুবিধে নেই।'

'তুমি বলতে চাইছ অতটা ভেতরে ডক্টর কংসু চউ-এর এজেন্টরা নজর রাখছে না?'

'সম্ভাবনা কম।'

'ঠিক আছে, ট্রেন ধরলাম। তারপর?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'শিলাং-এর উত্তরটা, এখানে দেখো,' বলে ম্যাপে আবার আঙুল রাখল রানা। 'জঙ্গল আর পাহাড়। তারপর শুধু পাথর। জনবসতি নেই, একেবারে বিরান।'

'তুমি আসলে প্রশ্ন তুলতে চাইছ, ডক্টর চউ রসদ ও অন্যান্য সাপ্লাই কিভাবে সংগ্রহ করে, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমিই বলো কিভাবে সংগ্রহ করে।'

'খাবারদাবার বা অন্যান্য সাপ্লাইয়ের জন্যে তার লোকজন ক্যান্টন পর্যন্ত এত দূর আসে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়,' বলল রানা,

ম্যাপে রাখা আঙুলটা একটু সরাল। 'আমার ধারণা, এখানে কোথাও ট্রেন থামায় ওরা, অর্ডার দেয়া জিনিস-পত্র নামাবার জন্যে।'

'তুমি হয়তো ঠিকই আন্দাজ করছ,' বলল চন্দনা, একটু খুশি খুশি লাগছে তাকে। 'এ যদি সত্যি হয়, আমাদের কিছুটা সুবিধেই হবে।'

'কি রকম?'

'ওদিকে আমাদের একটা কনট্যাক্ট আছে, তাইচিয়াও-এর ঠিক নিচে এক কৃষক। ম্যাপে না থাকলেও, ওদিকে সরু খাল ও নদী দুটোই আছে। ওই কৃষকের কাছ থেকে সাম্পান বা গাধা চাইতে পারব আমরা।'

'ভেরি গুড।' ম্যাপটা ভাঁজ করে ব্রীফকেসের গোপন কম্পার্টমেন্টে রেখে দিল রানা। 'এবার চলো, আমাদের তানকা ফ্যামিলিকে খুঁজে বের করি।'

'তোমার সঙ্গে আমার ডকে দেখা হবে।' সোফা ছেড়ে দাঁড়াল চন্দনা, পপলিনের ব্লু শার্ট জিনসের ভেতর ভাল করে গুঁজে নিল। 'নয়া দিল্লিতে একটা রিপোর্ট পাঠাতে হবে, হংকং থেকে এটাই আমার শেষ রিপোর্ট। তুমি দশ মিনিট পর রওনা হও।'

'ঠিক আছে।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তানকারা বেশিরভাগই ইয়াউ মা তেই টাইফুন শেল্টারের ভেতর বোট ভেড়ায়, তোমার সঙ্গে ওখানে আমার দেখা হবে।'

চন্দনা চলে যাবার পর ছোট্ট ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে হংকঙের ওপর চোখ বুলাচ্ছে রানা। সরাসরি নিচে হোটেল থেকে বেরুতেই চন্দনার নীল শার্ট দেখতে পেল; দৃঢ়, দীর্ঘ পদক্ষেপে রাস্তা পেরুচ্ছে। এত ওপর থেকেও রানার চোখে আঁটসাঁট জিনসের ভেতর গুরুনিতম্বের দোলা পরিষ্কার ধরা পড়ল। ধরা পড়ল রাস্তার ওপারে পার্ক করা কালো মার্সিডিজটাও। এই টাইপের গাড়িই হংকঙে ট্যাক্সি হিসেবে চলাচল করে। ওর ভুরু

জোড়ায় টান পড়ল গাড়িটা থেকে দু'জন চীনাকে নামতে দেখে—দু'জনেই তারা সরাসরি চন্দনার দিকে তাকিয়ে আছে। গাড়ি থেকে নেমে হন-হন করে হাঁটা ধরল তারা, বুঝতে অসুবিধে হলো না যে চন্দনার পথ আটকাবে। দু'জনই গাঢ় খয়েরি রঙের সুট পরা। এ-ধরনের সুট সাধারণত চাইনীজ ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্টরাই পরে।

রানার ধারণাই ঠিক। চন্দনার পথ আটকেছে তারা। কি যেন জিজ্ঞেস করছে। জবাবে হাতব্যাগ খুলে কিছু একটা দেখাল চন্দনা, সম্ভবত পাসপোর্ট। মনে-মনে প্রমাদ গুণল রানা। অ্যাসাইনমেন্টের এই পর্যায়ে ওরা যদি চন্দনাকে ইন্টারোগেট করার জন্যে নিজেদের অফিসে কয়েক ঘণ্টা আটকে রাখে, ওর প্ল্যানটাই এলোমেলো হয়ে যাবে।

ঘুরেই ছুটল রানা, শোল্ডার হোলস্টার পরে থাকায় নিজের ওপর খুশি। স্যুইট থেকে বেরিয়ে দ্রুত তালা দিল দরজায়। এলিভেটর ওপরেই পাওয়া গেল। লাউঞ্জ হয়ে হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়ে দেখল, চন্দনার কনুই ধরেছে এক লোক, শান্ত ভঙ্গিতে মার্সিডিজের দিকে হাঁটিয়ে আনছে ওকে। চন্দনা প্রতিবাদ জানাচ্ছে, তবে নরম সুরে। কিন্তু লোক দু'জন ওর কোনও কথায় কান দিচ্ছে না। অগত্যা, হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে, ছোট্ট করে শ্রাগ করল চন্দনা।

একের পর এক গাড়ি আসছে, রাস্তা পেরুবার কোন সুযোগই পাচ্ছে না রানা। ওদিকে চন্দনাকে নিয়ে মার্সিডিজের কাছে পৌঁছে গেছে চীনা অফিসাররা। গাড়ির দরজা খুলল একজন, ইঙ্গিতে চন্দনাকে উঠতে বলছে। এরপর যা ঘটল, দেখে প্রথমে আঁতকে উঠল রানা, পরমুহূর্তে হাসি ফুটল মুখে, মুগ্ধ না হয়ে পারল না।

সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কাছের লোকটার গলায় হাত রাখল চন্দনা। লোকটা অবাক, কি ঘটছে বুঝতে পারছে না। তারপর তার দম বন্ধ হয়ে এল, গলাটা লোহার মত আঙুল দিয়ে

চেপে ধরেছে চন্দনা। তারপরই যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে লোকটার ঊরুসন্ধিতে গুঁতো মেরে ছেড়ে দিল গলা, জবাই করা মুরগির মত রাস্তায় পড়ে ছটফট করছে লোকটা। পরমুহূর্তে একটা ফ্লাইং কিক মেরে দ্বিতীয় লোকটার হাতে বেরিয়ে আসা পিস্তলটা খসাল চন্দনা, ছুটে গিয়ে দমাদম তিন-চারটে ঘুসি বসিয়ে দিল নাকে-মুখে। লোকটা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে পিছু হটতে গিয়ে চওড়া নর্দমায় পড়ে প্রায় ডুবে গেল নোংরা পানিতে। এই সময় রানার ডাক শুনে ঘাড় ফেরাল চন্দনা। তারপর এক ছুটে রাস্তা পেরিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল। হাসছে। 'তুমি? আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ?'

'কারা ওরা?'

'বলছে, হংকং পুলিস।' চন্দনা এখন আর হাসছে না। 'কিন্তু বিশ্বাস করার কোন কারণ নেই।'

'কেন?'

'কথায় আর কাজে মিল নেই, তাই,' বলল চন্দনা। 'হংকং পুলিস সিভিল ড্রেসে বিদেশীদের পাসপোর্ট চেক করে ঠিকই, কিন্তু এরা শুধু আমাকে ধরার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছিল।'

'এর মানে বোঝো?' রাস্তায় ও নর্দমায় পড়ে থাকা লোক দুটোর ওপর চোখ রেখে বলল রানা। 'ওরা চাইনীজ ইন্টেলিজেন্স হোক বা ডক্টর চউ-এর সিকিউরিটি, তোমার কাভার নষ্ট হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি।'

'আমাদের আর হংকঙে দেরি করা উচিত নয়,' বলল রানা। 'কথা ছিল কাল সকালে রওনা হব, কিন্তু আমি আজ রাতেই বেরিয়ে পড়ার কথা ভাবছি।'

'দেখছ, ওরা কিন্তু চেঁচামেচি করছে না।' ঘাড় ফিরিয়ে চন্দনাও লোক দু'জনকে দেখল একবার। 'পুলিস বা ইন্টেলিজেন্স হলে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিত, বিশেষ করে আমাদেরকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে।'

'যেভাবে মারলে, চিৎকার করার শক্তি আছে কিনা সন্দেহ।'

আবার হাসল চন্দনা। 'ধন্যবাদ। মাসুদ রানার প্রশংসা পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়–বিরাট একটা সার্টিফিকেট।'

'কাজের কথা বলো,' মনে করিয়ে দিল রানা। 'তাহলে আজ রাতেই, কেমন?'

'আগে আমি রিপোর্টটা পাঠাই,' জবাব দিল চন্দনা। 'দশ মিনিট পর আবার তো আমাদের দেখা হচ্ছেই।'

'এক মিনিট,' ফিসফিস করল রানা।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপারে তাকাল চন্দনা। পথচারীরা মারপিট দেখে ছবির মত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল যে-যেখানে আছে। মারকুট্টি মেয়েলোকটাকে রাস্তা পেরোতে দেখে আবার চলতে শুরু করেছে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। রাস্তায় পড়ে থাকা লোকটা সিধে হয়েছে, টলতে টলতে এগিয়ে নর্দমার কিনারায় দাঁড়াল, সঙ্গীকে উঠতে সাহায্য করছে। দু'জন ভুলেও একবার এদিকে তাকাল না, মাথা নিচু করে গাড়িতে উঠে পড়ল।

'ওরা বোধহয় দেখতেই পায়নি এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি,' মার্সিডিজ চলে যেতে বলল রানা। 'ঠিক আছে, এবার তুমি যাও।'

'দেখেও হয়তো না দেখার ভান করছিল।' ঘুরে নিজের পথে হাঁটা ধরল চন্দনা। যতদূর দেখা গেল, ওর দিকে তাকিয়ে থাকল রানা।

ইয়াউ মা তেই টাইফুন শেল্টার-এর দুই প্রান্ত এমন একটা ভঙ্গিতে বাঁক নিয়ে বিস্তৃত, যেন কোনও মা তার শত-শত ভাসমান শিশুকে আলিঙ্গন করছে–এখানে শিশু মানে ঝাঁক-ঝাঁক জাঙ্ক, ওয়াটার ট্যাক্সি, সাম্পান আর ভাসমান দোকানপাট। ওগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বিশেষ একটা জাঙ্ক খুঁজছে রানা, পিছনদিকে

ওটার গায়ে কোথাও তিনটে মাছ আঁকা আছে, একটার ওপর আরেকটা। ওই জাঙ্কের মালিক লাউ ঝেমি পরিবার। টাকার বিনিময়ে বিসিআই তাদের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে। রানাকে শুধু তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে জানাতে হবে কি সে চায়। প্রথম সারির জাঙ্কগুলো দেখছে, এই সময় পাশে এসে দাঁড়াল চন্দনা। কাজটা একঘেয়ে আর সময় সাপেক্ষ। অনেক জাঙ্ককে ঝাঁক-ঝাঁক সাম্পান আড়াল করে রেখেছে, তীর থেকে ওগুলোর স্টার্ন ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে ওরা যেটাকে খুঁজছে, একটু পরই চন্দনা সেটাকে দেখতে পেল—নীল খোল, নোংরা হয়ে থাকা কমলা-রঙা বো। স্টার্নবোর্ডের ঠিক মাঝখানে মাছ তিনটে পেইন্ট করা হয়েছে।

এগোবার সময় আরোহীদের ওপর চোখ বুলাল রানা। এক লোক একমনে মাছ ধরার জাল মেরামত করছে। জাঙ্কের পিছন দিকে দুই কিশোরকে দেখা গেল, চোখে-মুখে ব্যাকুল আগ্রহ; মধ্যবয়স্কা মহিলাটি সম্ভবত ওদের মা, কাজের ফাঁকে ছেলেদের গল্প শোনাচ্ছে। কাছাকাছি চুপচাপ চেয়ারে বসে পাইপ টানছে এক বুড়ো, মুখে লম্বা, সাদা দাড়ি। জাঙ্কের মাঝখানটা ক্যানভাসে ঢাকা, তার ভেতর একপাশে লাল ও সোনালি রঙের সামান্য উঁচু একটা বেদী দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিটি তানকা জাঙ্কের অপরিহার্য একটা অঙ্গ বলা যায় এটাকে। বেদীর ওপর তামা ও পিতল দিয়ে তৈরি ছোট একটা বুদ্ধমূর্তি। মূর্তির সামনে একটা পাত্রে সুগন্ধী ধূপ জ্বলছে। আরও কাছাকাছি হতে রানা দেখল, মহিলাটি মাটির চুলোয় কাঠকয়লা জ্বেলে রান্না করছে। চুলোর ওপর লোহার শিক ফেলা, তাতে চার-পাঁচটা মাছ গাঁথা। ওরা দু'জন জাঙ্কে ওঠার জন্যে ক্যাটওয়াকে পা দিতেই জাল ফেলে মাঝবয়েসী লোকটা উঠে দাঁড়াল।

'এটা কি লাউ ঝেমি পরিবারের বোট?' মাথা নত করে জানতে চাইল রানা।

উত্তরে লোকটা দু'তিনবার মাথা নোয়াল। 'হ্যাঁ, এটাই।'

'লাউ ঝেমি পরিবার আজ দু'বার পুণ্য অর্জন করার সুযোগ পাচ্ছে,' বলল রানা।

লোকটার চোখে-মুখে কোন ভাব ফুটল না। 'এ-কথা কেন বলছেন?'

'কারণ একদিকে তারা ঋণ পরিশোধের সুযোগ পাবে, আরেক দিকে অতিথিসেবার।'

'তাহলে তো আপনি ঠিক কথাই বলছেন।' এই প্রথম হাসল লোকটা। 'আপনারা আমার সেই অতিথি, আমি আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছি। চলে আসুন।'

'এরা সবাই কি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে?' জানতে চাইল রানা।

'সবাই,' জবাব দিল লাউ ঝেমি। 'আপনাদেরকে পৌঁছে দিয়ে আমরা আমাদের পথে চলে যাব। আমরা কোথায় যাব তা কয়েকদিন আগেই ঠিক করা হয়েছে, অনেকেই তা জানে। পথে যদি কোথাও থামানো হয়, জাঙ্কে আমি একা থাকলে সন্দেহ করবে ওরা। তানকারা যেখানেই যায়, সঙ্গে পরিবারের সবাই থাকে।'

'পথে থামানো হলে আমাদের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করল লাউ ঝেমি। ক্যানভাস ঢাকা জাঙ্কের মাঝখানে চলে এল ওরা। ঝুঁকে মেঝের একটা তক্তা তুলল ঝেমি। এক প্রস্থ কাঠের সিঁড়ি বেয়ে খোলের একেবারে তলায় নেমে এল ওরা। বড় আকারের ঘাস, খাগড়া বা শর দিয়ে বোনা এক ধরনের চাটাই বা আচ্ছাদন চারদিকে স্তূপ হয়ে আছে।

'এগুলো বানিয়ে নিয়মিত সাপ্লাই দিই আমরা,' বলল ঝেমি। 'আপনারা একটা স্তূপের নিচে থাকবেন। একটু ভারী লাগবে গায়ে, তবে ফাঁক করে বোনা তো, বাতাসের কোন অভাব হবে না। এ ব্যবস্থা শুধু বিপদ দেখা দিলে।'

আবার ওরা জাঙ্কের ডেকে উঠে এল। মহিলাটি তার দুই ছেলেকে খাওয়াতে বসেছে। পিছন দিকে তাদের দাদু আগের মতই ঠায় চেয়ারে বসে আছে, একটুও নড়াচড়া করছে না; মুখে ধরা পাইপটা থেকে আঁকাবাঁকা ধোঁয়া না উঠলে চীনা ভাস্কর্য বলে চালিয়ে দেয়া যেত।

'আজ রাতে রওনা হতে পারবেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'পারা যায়,' উত্তরে বলল ঝেমি। 'তবে বেশিরভাগ জাঙ্ক রাতে বেশি দূর যায় না। কোস্টলাইন ধরে গেলে অবশ্য পথ হারাবার কোন ভয় নেই।'

'দিনে রওনা হবারই কথা ছিল,' বলল রানা, 'কিন্তু কিছু সমস্যা দেখা দেয়ায় প্ল্যানটা বদলাতে হয়েছে। আমরা সন্ধ্যায় ফিরে আসব।'

'ঠিক আছে, আমরা তাহলে সেভাবেই তৈরি হই।' কয়েকবার মাথা নুইয়ে ওদেরকে আপাতত বিদায় জানাল লাউ ঝেমি।

ক্যাটওয়াক পেরুতে চন্দনাকে সাহায্য করল রানা। কিছু দূর এসে ঘাড় ফিরিয়ে জাঙ্কটার দিকে তাকাল ও। ছেলেদের সঙ্গে জেমিও খেতে বসেছে। স্টার্নে আগের মতই বসে আছে তার বুড়ো বাবা, পাইপের ধোঁয়া অলস ভঙ্গিতে মোচড় খাচ্ছে স্থির বাতাসে। প্রবীণদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখানো চীনা ঐতিহ্যের অলঙ্ঘনীয় একটা নিয়ম, সন্দেহ নেই কেউ একজন তাকে তার খাবার দিয়ে যাবে।

রানা জানে, নিজ স্বার্থেই ওদেরকে সাহায্য করছে লাউ ঝেমি। এর বিনিময়ে বিসিআই নিশ্চয়ই তাদের জন্যে নতুন কোন নিরাপদ আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। তারপরও, লোকটার সাহসের প্রশংসা করতে হয়। ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সব কিছু হারাবার ঝুঁকি সবাই নিতে পারে না।

ওদের ট্যাক্সি পিংপং রোডে ঢুকতে চন্দনাকে রানা বলল,

'তোমাকে সানফ্লাওয়ারের সামনে নামিয়ে দিচ্ছি । ঠিক তিন ঘণ্টা পর রওনা হব আমরা, মনে আছে তো? তুমি আমার হোটেলে এসো।'

রানার হাত ধরে একটু চাপ দিল চন্দনা। 'এখুনি আমি হোটেলে ফিরছি না। কাল তুমি আমাকে ডিনার খাইয়েছ, আজ আমি তোমাকে লাঞ্চ খাওয়াব।'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে রানা বলল, 'তাহলে তো ভাল কোন রেস্তোরাঁ খুঁজতে হয়।'

'এ পর্যায়ে বাইরে বেশিক্ষণ থাকা কি উচিত হবে?' চিন্তিত দেখাল চন্দনাকে। 'তারচেয়ে তোমার স্যুইটেই যাই চলো, রুম সার্ভিসকে দিয়ে লাঞ্চ আনিয়ে নেব। তোমার সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করাও হবে।'

সামান্য হলেও বিস্মিত হলো রানা, তবে কিছু বলল না।

ওরা স্যুইটে ঢোকার কিছুক্ষণ পরই রুম সার্ভিস লাঞ্চ দিয়ে গেল। খেতে বসে রানা বলল, 'হাতে বেশি সময় নেই, তুমি আর সানফ্লাওয়ারে না ফিরলেও পারো। দু'জন একসঙ্গে বেরুব, যাবার পথে তোমার হোটেল থেকে যা নেয়ার নিয়ো।'

'না, ওখানে আমার কাজ আছে–কিছু কাগজপত্র পোড়াতে হবে। তবে ঘণ্টা দুয়েক অন্তত তোমাকে জ্বালাবার জন্যে থাকছি এখানে।'

'কে বলল তুমি কাছে থাকলে আমার গায়ে আঁচ লাগে?'

'না লাগলে সেটা আমার নিদারুণ ব্যর্থতা।' হেসে উঠল চন্দনা। 'আমার উপস্থিতিতে মাসুদ রানা যদি উষ্ণতা অনুভব না করে, নারীত্বের এরচেয়ে বড় পরাজয় আর কি হতে পারে!'

'কেন, মাসুদ রানা তোমার কে?'

'জানি কি জিজ্ঞেস করছ।' চন্দনার ঠোঁটের কোণে তিক্ত একচিলতে হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'না, তুমি আমার প্রেমিক নও। তোমাকে আমি ভালবাসিনি।'

'ভালবাসোনি, তবে ভক্ত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভক্ত? না, ভক্তও নই। আসলে ভক্ত হওয়া সম্ভব নয়। কারণ দু'জনেই আমরা প্রফেশনাল, এবং এমন দুটো দেশের প্রতিনিধিত্ব করি যাদের স্বার্থ অভিন্ন তো নয়ই, বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী।'

'কাজেই?' বুঝতে দিচ্ছে না, তবে রীতিমত বিমূঢ় হয়ে পড়ছে রানা। তাহলে আবেগে আপ্লুত হয়ে বন্ধ ঘরের ভেতর নাচছিল কেন চন্দনা? কেন বলছিল: 'আমার অনেকদিনের স্বপ্ন তোমাকে কাছে পাব। আমি তোমার অন্ধ ভক্ত, মাসুদ রানা। আই লাভ ইউ...'

'কাজেই আপাতত আমরা একসঙ্গে কাজ করলেও, তুমি আমার প্রতিপক্ষ। আর প্রতিপক্ষকে জয় করার মধ্যেই তো আনন্দ। আমি নারী, তুমি পুরুষ—তোমাকে জয় করার একটাই তো অস্ত্র আমার।' তির্যক কটাক্ষ হানল চন্দনা।

রানা থেমে যাওয়ায় শ্লেষাত্মক তর্কটা মাঝপথে নিভে গেল। ওদের খাওয়া শেষ হতে রুম সার্ভিস টেবিল পরিষ্কার করে দিয়ে গেল। হাতে কফির কাপ নিয়ে রানার সোফার হাতলে এসে বসল চন্দনা। 'এই, প্রতিপক্ষ বলায় মাইন্ড করলে নাকি?'

হাসল রানা। 'আগে আমাকে বুঝতে হবে ওটা তোমার মনের কথা কিনা।'

'ফ্যাক্ট ইজ ফ্যাক্ট,' বলে হাতের কাপ-পিরিচ টেবিলে নামিয়ে রাখল চন্দনা। 'তবে সে ফ্যাক্ট মাঝেমধ্যে ভুলে থাকতে রাজি আছি আমি।' রানার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'যখন ভুলে থাকব তখন তুমি আমার নারীত্বকে সম্মান দেখাবার সুযোগটা নিতে পারো। কথা দিচ্ছি, ঠকবে না।'

দেখার পর থেকেই চন্দনার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে রানা। ওর সুশালীন ব্যবহারে সেটা বরং আরও যেন বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে ঠাণ্ডা লাগছে ওর, কোন আকর্ষণই

অনুভব করছে না। ওর মাথায় ঢুকছে না ব্যাপারটা। নিজেকে মেয়েটা এত সস্তা করে তুলছে কেন?

কাঁধ থেকে চন্দনার হাতটা নামিয়ে দিল রানা। 'কি কাজ আছে বলছিলে না, এখন তোমার যাওয়া উচিত।'

'মেসেজটা লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার,' সোফার হাতল থেকে নেমে কোমরে দু'হাত রেখে হাসল চন্দনা। 'তবে আমিও হার মানার পাত্রী নই, মিস্টার রানা। একবার না পারিলে দেখো শতবার, আমি এই নীতিতে বিশ্বাসী।'

প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে রানা জিজ্ঞেস করল, 'সকালে যে ফাইনাল রিপোর্ট পাঠাবার কথা ছিল, সেটা পাঠিয়েছ?'

'কি?' ভুরু কোঁচকাল চন্দনা, তারপর তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ও, ওটার কথা বলছ—হ্যাঁ, পাঠানো হয়েছে।'

সোফা ছাড়ল রানা। দরজাটা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়াল। মুখে যাই বলুক, ম্লান চেহারা নিয়ে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেল চন্দনা। মাথার পিছনে সড়সড় করছে রানার চুল। কোথাও কিছু একটা উল্টোপাল্টা ঘটেছে। চন্দনার জবাবে সন্তুষ্ট হতে পারেনি ও। শুধু সতর্ক নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু হবার তাগাদা অনুভব করছে। টান ধরেছে পেশিতে, মনের আকাশে ঝড়ের পূর্বলক্ষণ, নিম্নচাপ। সাক্ষাৎ পর্বে মেয়েটা ওকে নির্ভুল কোডই বলেছিল, তবে তাতে অন্যান্য সম্ভাবনা বাতিল হয়ে যায় না। আদি ও অকৃত্রিম আইসিআই এজেন্টই মনে হচ্ছে চন্দনাকে, তবে যে-কোন বুদ্ধিমতী ও দক্ষ এজেন্টকে তাই মনে হবে। মেয়েটা ডাবল এজেন্ট, এ আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। ব্যক্তিত্বের হঠাৎ এতটা পরিবর্তন অবিশ্বাস্য। নাকি ওর সঙ্গে কৌতুক করে গেল চন্দনা? ওর সঙ্গে রওনা হবার এখন আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। তার আগে ঘটনাটা কি জানতে হবে ওকে।

স্যুইটে তালা দিয়ে দ্রুত নিচে নামল রানা। রাস্তায় বেরিয়ে দেখল সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে চন্দনা। হোটেল

সানফ্লাওয়ার বেশি দূরে নয়, হেঁটেই ফিরছে ও।

পিং-পং রোডে চলে এল রানা। রাস্তায় কোথাও থামেনি চন্দনা, কাউকে ফোন করেনি, পথিকদের কাউকে ইঙ্গিতে কোন মেসেজও দেয়নি। হোটেলের লাউঞ্জে ঢুকেও থামল না, সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে গেল তিনতলায়।

দু'মিনিট পর চন্দনার স্যুইটে নক করল রানা।

ভেতর থেকে চন্দনা জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'রুম সার্ভিস।'

দরজা খুলে গেল। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলো রানা। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে। ওরা হেসে উঠতে দ্রুত দম নিয়ে বলল, 'তাহলে এই ব্যাপার! তোমরা দু'জন!'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আরও জোরে হেসে উঠল মেয়ে দুটো। একজন এগিয়ে এসে হাত রাখল রানার বুকে। 'আমি চন্দনা, রানা,' বলল সে। 'এ আমার যমজ বোন বন্দনা। আমরা আইডেনটিকাল টুইন। এইমাত্র বন্দনাই তোমার স্যুইট থেকে ফিরল। তুমি ধরতে পারোনি, তাই না?' রানার হাত ধরে ভেতরে টেনে নিল। দ্বিতীয় মেয়েটা হাসতে-হাসতে বন্ধ করে দিল স্যুইটের দরজা।

'ধরতে পারিনি, ধরা সম্ভব নয় বলে,' বলল রানা। 'তবে কিছু একটা সন্দেহ না হলে কি ওর পিছু নিয়ে এখানে আসতাম? হ্যাঁ, অনেক অসঙ্গতির কারণ ও উৎস এখন জানা গেল। কিন্তু, এ তোমাদের কি ধরনের অর্বাচীনতা! তোমরা হয়তো কৌতুক বলবে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা এক ধরনের প্রতারণা।'

'অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা চাই,' দুই হাত এক করে শাড়ি ঢাকা ব্লাউজের মাঝখানে তুলল চন্দনা। 'তবে একদম যে সতর্ক করিনি বা আভাস দিইনি, তা কিন্তু নয়। মনে পড়ে, বলেছিলাম– "তোমাকে অবাক করে দিয়ে একটু কৌতুক করার প্ল্যান ছিল আমাদের…"?'

'আমরা কি কোন কৌতুককর কাজে এসেছি, বন্দনা? রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে হয় না তোমার?' রানার রাগ পড়ছে না।

কোন অপমানই গায়ে মাখছে না ওরা। অন্তত দুই বোনের হাসি থামার কোন লক্ষণ নেই। 'আজই তোমাকে আমরা বলব বলে ঠিক করেছিলাম।' কোনরকমে হাসি চেপে পাশে এসে দাঁড়ানো বন্দনার দিকে তাকাল চন্দনা।

বন্দনা তার দৃষ্টি দিয়ে রানাকে যেন গিলছে। 'হ্যাঁ, সত্যি, আজই বলার কথা ছিল। তবে অপেক্ষা করছিলাম কেন জানো? দেখার ইচ্ছা ছিল তুমি নিজে ব্যাপারটা ধরতে পারো কিনা।'

'আইসিআই কর্তৃপক্ষকেও কি কৌতুকে পেয়েছে?' বলল রানা। 'তাঁদের মাথায় এটা আসেনি যে একই চেহারার দু'জনকে কোন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো কৌশল হিসেবে নিতান্তই বাজে? বিপদের ঝুঁকি বেড়ে যায় বহুগুণ?'

এতক্ষণে সিরিয়াস দেখাল চন্দনাকে। 'দুঃখিত, রানা, তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। তুমি তোমার ধারণা থেকে কথাটা বলছ। কিছু প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, দু'জনের চেহারা এক হওয়ায় প্রতিপক্ষ ধাঁধায় পড়ে যায়, তাতে লাভ হয় আমাদেরই, ওদের বিহ্বলতার সুযোগ নিতে পারি। এর আগে ইউরোপ, আমেরিকা, বার্মা, পাকিস্তান আর নেপালে একসঙ্গে কাজ করেছি আমরা, সব জায়গায় অসুবিধের চেয়ে সুবিধেই পেয়েছি।' দম নিল চন্দনা। 'প্লীজ, রানা, এই শেষ মুহূর্তে তুমি আপত্তি কোরো না। শেডিউল নষ্ট হয়ে গেলে অ্যাসাইনমেন্টটা ভেস্তে যাবে।'

'ঠিক আছে,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল রানা। 'শুধু অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থে ব্যাপারটা আমি মেনে নিচ্ছি। কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, এ-ধরনের আরও যদি কিছু ঘটে, আমি আমার নিজের আলাদা পথ বেছে নেব।'

'প্রথম কথা, নিজেদেরকে আমরা রক্ষা করতে জানি,' উত্তরে বলল বন্দনা। 'তুমি আমাদেরকে ছেড়ে গেলেও গন্তব্যে নিরাপদেই পৌঁছাব আমরা, সুযোগ পেলে তোমার আগেই নিউট্রালাইজ করব ডক্টর কংসু চউকে। আমার এই কথাকে আবার হুমকি মনে কোরো না। এখানে কোন ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নেই। তোমাকে সাহায্য করতে পাঠানো হয়েছে আমাদের, আমরা তা করার জন্যে সব সময় প্রস্তুত থাকব। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সাহায্য না নাও, তখন বাধ্য হয়ে নিজেদেরকেই আমরা হেলপ করব...'

'তুই থাম তো, বন্দনা!' বোনকে মৃদু ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দিল চন্দনা। রানাকে বলল, 'না, রানা, ওর কথায় তুমি কিছু মনে কোরো না। আবার বলছি, যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, ক্ষমা করে দাও।'

অসহায় একটা ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সময় তো হয়ে এসেছে। আমি বসি, তোমরা তৈরি হয়ে নাও।'

চার

সন্ধ্যার কালিমা ইয়াউ মা তেই টাইফুন শেল্টার-এর ডক এরিয়ার দীন-হীন চেহারা আরও করুণ করে তুলেছে। যেদিকে চোখ যায় সেদিকেই শুধু হাড্ডিসার, বুভুক্ষু মানুষ গিজগিজ করছে। পানির কাছাকাছি আলো খুব কম, সাম্পান ও জাঙ্কগুলো গায়ে গা ঠেকিয়ে ঢেউয়ের তালে দুলছে। তবে দূরের হারবার আকাশটাকে

আলোকিত করে রাখায় তার গায়ে চিমনি আর মাস্তুলের একটা জঙ্গল তৈরি হয়েছে। ডকসাইড ধরে এগোবার সময় যমজ বোনদের দিকে তাকাল রানা। হোটেলে ওদের প্রস্তুতি পর্ব খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে ও। ওদের শোল্ডার হোলস্টার ঢোলা ব্লাউজের তলায় ভালভাবেই লুকিয়ে রাখা গেছে। দু'জনের কাছেই একটা করে বেরেটা আছে–ছোট, তবে কাজের জিনিস। সরু লেদার পাউচ নিয়েছে ওরা, স্ট্র্যাপ দিয়ে কোমরে বাঁধা, ভেতরে ছুরি ছাড়াও দুটো করে আলাদা কমপার্টমেন্টে স্পেশাল ইকুইপমেন্ট নিয়েছে। ওদের প্রস্তুতি দেখে মনে-মনে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করেছে রানা। নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই ওরা বহন করতে পারবে। এমনকি কোন কারণে ও যদি অচল হয়ে পড়ে, অ্যাসাইনমেন্টটা সফল করাও হয়তো ওদের পক্ষে সম্ভব।

'ওই তো, দেখা যাচ্ছে,' বলল বন্দনা, দৃষ্টি সীমায় চলে আসতে হাত তুলে লাউ ঝেমির পারিবারিক জাঙ্কের নীল খোলটা দেখাল। 'আরে, বুড়োটা দেখছি এখনও চেয়ার নিয়ে বসে আছে স্টার্নে। বাতের রোগী বোধহয়।'

হঠাৎ চন্দনাকে একটু ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। চোখ নামিয়ে নিজের বাহু দেখল চন্দনা, যেখানে রানা ওকে স্পর্শ করেছে, তারপর মুখ তুলতেই দেখতে পেল রানার ঘন ভুরুর মাঝখানে ভাঁজ পড়ছে।

'কেউ নোড়ো না,' ফিসফিস করল রানা। চোখ সরু হয়ে আছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

'কি ব্যাপার, মিস্টার রানা?' দেখাদেখি বন্দনাও ফিসফিস করল।

'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল রানা। 'তবে কিছু একটা ঘটেছে।'

'কই, কোথায়?' বন্দনা বিস্মিত। 'জাঙ্কে শুধু ওদেরকেই দেখছি, অন্য কেউ তো নেই। ওটা লাউ ঝেমি না, পাশে তার দুই

ছেলে? বুড়োটাকে তো স্পষ্টই চেনা যাচ্ছে…'

'শুধু বুড়োকে চেনা যাচ্ছে।' বলল রানা। 'বাকি কাউকেই এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না আমরা। আমি নিশ্চিত, খারাপ কিছু একটা ঘটেছে। শোনো, চন্দনা, তুমি একা এগোও–জাঙ্কের কাছাকাছি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকো, যেন আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছ।'

'আর আমরা?' জিজ্ঞেস করল বন্দনা।

'আমরা এদিক দিয়ে এগোই,' বলে কয়েকশো ক্যাটওয়াকের একটায় উঠে পড়ল রানা। প্রতিটি ক্যাটওয়াক পানির ওপর ঝুলে আছে, পৌঁছেছে সারি সারি জাঙ্কে।

ক্যাটওয়াকের শেষ মাথায় পৌঁছে নিঃশব্দে পানিতে নেমে পড়ল রানা, সাবধানে পানি কেটে এগোল। পিছিয়ে পড়েছিল, ওর পাশে চলে এল বন্দনা। ইঙ্গিতে শব্দ করতে নিষেধ করল রানা। ঝাঁক-ঝাঁক সাম্পান, জাঙ্ক, ওয়াটার ট্যাক্সির ভেতর দিয়ে পথ করে নিল ওরা। এদিকের পানি ঘোলাটে, দুনিয়ার আবর্জনা আর তেল ভাসছে। বেশ কিছুক্ষণ সাঁতরাবার পর ঝেমি পরিবারের জাঙ্কটার নীল খোল দেখল ওরা সামনে। ইঙ্গিতে বন্দনাকে অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে জাঙ্কের খোল ঘেঁষে একাই এগোল রানা। স্টার্নের কাছে পৌঁছে মুখ তুলতে আবার দেখতে পেল বুড়োকে। ডেক চেয়ারটায় বসে আছে। চেয়ারের পিঠ খাড়া, বুড়োর শিরদাঁড়াও খাড়া। চোখ দুটো সোজা দূরে তাক করা, দৃষ্টিহীন ও নিষ্কম্প। রানাকে বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই যে মরা মানুষ ছাড়া আর কারও চোখ এরকম স্থির হতে পারে না।

তারপর রানা নাইলনের কর্ডটাও দেখতে পেল, চেয়ার ও বুককে এক করে প্যাঁচানো। এই বাঁধনই বুড়োকে চেয়ারের ওপর খাড়া করে বসিয়ে রেখেছে।

বন্দনার কাছে ফিরে এল রানা। 'এসো,' ফিসফিস করে বলল তাকে। 'ওরা সম্ভবত একজনও বেঁচে নেই।'

'হায়, ভগবান!' শিউরে উঠল বন্দনা। রানার পিছু নিয়ে সে-ও এবার জাঙ্কটার পিছনে চলে এল। একসঙ্গেই নিচু খোল বেয়ে ডেকে উঠল ওরা। মাথা ঝাঁকিয়ে ক্যানভাস ঢাকা জায়গাটা দেখাল রানা। ওটার পিছন দিকের প্রান্তটা ঝুলে পড়েছে ডেকে। সাবধানে এগোল ওরা, পাটাতনের প্রতিটি অংশে পা ফেলছে পরীক্ষা করার পর। শেষ দশ গজ ক্রল করে পার হলো। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে বন্দনা, তার নিশ্বাসের শব্দে বিরক্ত বোধ করছে রানা। সে পিছিয়ে পড়ায় খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। ক্যানভাসের ঝুলন্ত প্রান্তটা দু'আঙুলে ধরল ও, অপর হাতে আগেই বেরিয়ে এসেছে লম্বা ও ধারাল একটা ছুরি।

প্রান্তটা উঁচু করল রানা। ভেতরে ওর দিকে পিছন ফিরে অপেক্ষা করছে দু'জন লোক, নাক বরাবর বো-র দিকে দৃষ্টি; ওদিকে লাউ ঝেমি আর তার দুই কিশোর ছেলের কাপড় পরে অপেক্ষা করছে আরও তিনজন। চট করে একবার বন্দনাকে দেখে নিল রানা, ইতিমধ্যে মেয়েটার হাতে সরু এক প্রস্থ তার বেরিয়ে এসেছে। চারদিকে শত-শত জাঙ্ক আর সাম্পান, গুলির শব্দ হলে কয়েক হাজার লোক আতঙ্কিত হয়ে পড়বে। আতঙ্কিত মানুষ জোট বেঁধে হিংস্র হয়ে উঠতে বেশি সময় নেয় না, কাজেই যা করার নিঃশব্দে করতে হবে ওদেরকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে বন্দনাকে সংকেত দিল রানা, পরমুহূর্তে একসঙ্গে লাফ দিল ওরা। রানার টার্গেট শেষ মুহূর্তে ঘুরতে শুরু করায় পিঠে না লেগে ছুরির ফলা ঘ্যাচ করে পাঁজরের একজোড়া হাড়ের মাঝখান দিয়ে বুকে সেঁধিয়ে গেল। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখল বন্দনা পিছন থেকে টার্গেটের গলায় তার পরাচ্ছে।

হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছুরিটা বের করে নিল রানা। পতনটা ঠেকাবার জন্যে হাত বাড়িয়ে লোকটাকে ধরতে যাবে, টলতে টলতে পিছাল সে, রানার নাগালের বাইরে গিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল ডেকে।

শব্দ শুনে বাকি তিনজন চীনা একযোগে ঘুরল, ওদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলো। বেদীর পাশে হাত চারেক লম্বা একটা মোটা বাঁশ দেখতে পেয়ে তুলে নিল রানা, ছুরিটা কোমরের বেল্টে গুঁজে হামলা ঠেকাবার জন্যে তৈরি হলো। আরেকবার তাকাতে দেখল, বন্দনার প্রতিপক্ষ ডেকে পড়ে গেছে, তার বুকে বসে গলায় পেঁচানো তারটা দু'দিকে টানছে বন্দনা। তবে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না, কারণ সরু তার আর গলার মাঝখানে হাত গলিয়ে দিয়েছে লোকটা।

তিনজনের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা লোকটাকে টার্গেট করল রানা। নাগালের মধ্যে আসতেই মাথা লক্ষ্য করে বাঁশটা নামাল, কিন্তু লাগল কাঁধে। হাড় ভাঙার শব্দকে ছাপিয়ে উঠল লোকটার আর্তনাদ। দ্বিতীয় লোকটা বিপদ টের পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে, বাঁশের নাগালে আসতে রাজি নয়। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে একটা ছুরি থ্রো করল সে। ঝট করে বসে পড়ল রানা, ছুরিটা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার পরও দাঁড়াল না, বাঁশটা ঘুরিয়ে এনে আঘাত করল তৃতীয় টার্গেটের পিস্তল ধরা হাতে। হাতে নয়, পিস্তলে লাগল বাঁশ। রানা সিধে হচ্ছে, বাঁশটা কায়দা মত ধরার সুযোগ পায়নি এখনও, এই সময় দ্বিতীয় ও তৃতীয়জন ওকে লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল।

ছিটকে ডেকের ওপর পড়ল রানা। একজন ওর বুকে চেপে বসল, দু'হাতে গলা টিপে ধরেছে। আরেকজন পা তুলছে ওর মাথায় লাথি মারবে বলে।

তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ বেরুল বন্দনার গলা থেকে, ছুটে এসে রানার বুকে বসা লোকটার পিঠে সওয়ার হলো সে, দু'হাতে মাথার চুল খামচে ধরে সর্বশক্তি দিয়ে টানছে।

অপর লোকটা লাথি মারার জন্যে পা তুলে স্থির হয়ে গেছে। হঠাৎ হড়হড় করে রক্তবমি শুরু করল। একটা ঝাঁকি খেয়ে পিছনদিকে পড়ে গেল সে, লাফ দিয়ে সরে তাকে এড়াল চন্দনা,

হাতের রক্ত মাখা ছুরির ফলা নিতম্বের ওপর ট্রাউজারে ঘষছে, রানার ওপর চোখ। ঠিক সময়মত জাঙ্কে উঠে এসেছে সে।

রানার বুক থেকে ইতিমধ্যে টেনে-হিঁচড়ে অপর লোকটাকে নামিয়ে ফেলেছে বন্দনা। কোথায় জখম হয়েছে বলা মুশকিল, তবে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ডেকে, এক চুল নড়ছে না।

হঠাৎ সাবধান করল রানা। 'পিছনে, চন্দনা!'

বন্দনার প্রথম টার্গেট জ্ঞান ফিরে পেয়ে গলার তার খুলে ফেলেছে, সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে সিধে হয়েছে সে। তার হাতে একটা ছুরি দেখতে পেল রানা, চন্দনার পিঠে তাক করা। চোখে খুনের নেশা, ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে চন্দনার দিকে।

একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। রানার কথাটা তখনও বাতাসে মিলিয়ে যায়নি, বন করে আধ পাক ঘুরেই হাতের ছুরিটা ছুঁড়ল চন্দনা। ওর টার্গেটের দুই হাত গলায় উঠে গেল, আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আছে ছুরির হাতল, তারপর ঝর-ঝর করে রক্ত বেরিয়ে এল। ছুরিটা শুধু ছুঁড়েছেই চন্দনা, তারপর কি ঘটছে দেখার সুযোগ হয়নি, কারণ ইতিমধ্যে আততায়ীদের আরেকজন পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ঘাড়ে। এই লোকটাকেই রানার বুক থেকে নামিয়েছিল বন্দনা।

লোকটা লাফ দিয়েছে হাতে ছুরি নিয়ে, সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও ছুরিটা সে চন্দনার শরীরে গাঁথছে না। লোকটাকে পিঠে নিয়ে ডেকে ছিটকে পড়ল চন্দনা। তাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরে রেখে গলায় ছুরির ডগা ঠেকাল আততায়ী, হুমকি দিয়ে বলল, 'খবরদার! কেউ এগোলেই চন্দনা খুন হয়ে যাবে!'

রানার হাতে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এল। 'তুমি ওর নাম জানো?' জিজ্ঞেস করল লোকটাকে।

'তোমার নামও জানি আমি,' হিসহিস করে বলল লোকটা। 'তোমাদের সবার ফটো আছে ডক্টর কংসু চউ, আমাদের মহামান্য বিজ্ঞানীর কাছে। তোমাকে তিনি একটা মেসেজ দিয়েছেন, মাসুদ

রানা।'

বোনের বিপদ দেখে হতবিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা। তবে তার একটা হাত বেল্টে আটকানো খোলা পাউচের ভেতর।

'কি মেসেজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হংকঙে এখন পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে, সবই আসলে তোমার প্রতি ডক্টর কংসু চউ-এর ওয়ার্নিং,' বলল লোকটা। 'এরকম ওয়ার্নিং একের পর এক আরও দেয়া হবে তোমাকে। তবে তারমানে এই নয় যে তিনি চান তুমি মাঝপথ থেকে লেজ তুলে পালাও। আমাদের মহামান্য বিজ্ঞানী তোমার জন্যে মিসাইল ঘাঁটিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, মাসুদ রানা। তুমি যদি সময়মত পৌঁছাতে পারো, তাঁর বাজীমাত করা চালটা চাক্ষুষ করতে পারবে।'

'সে যদি সত্যি আমাকে মিসাইল ঘাঁটিতে দেখতে চায়, তাহলে ওয়ার্নিঙের নামে যেতে বাধা দিচ্ছে কেন?'

'তুমি যাতে পথ হারিয়ে না ফেলো তাই আমরা চেষ্টা করছি তোমাকে বন্দী করে নিয়ে যেতে,' হেসে উঠে বলল লোকটা। 'তবে ওয়ার্নিংগুলো আসলে ওখানে পৌঁছাবার পর কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হবে তোমাকে তার নমুনা।'

হতবিহ্বল ভাবটা ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠছে বন্দনা। নিঃশব্দে একটু একটু করে এক পাশে সরে যাচ্ছে সে।

'এখন কি হবে?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'কি চাও তুমি?'

'ডক্টর কংসু চউ তাঁর মেসেজের উত্তর পাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তোমার বক্তব্য নিয়ে ফিরে যাব আমি।'

'যদি বলি আমার কোন বক্তব্য নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তারমানে কি আমাকে তুমি প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেবে না?' লোকটা হাসছে।

'যদি না দিই?'

'ডক্টর কংসু চউ-এর পাঠানো সব মিশনই সুইসাইড মিশন,' বলল লোকটা। 'মরতেই আমি এসেছি, তবে চন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে মরব।'

ইতিমধ্যে হাতে ছুরি নিয়ে লোকটার পিছনে পৌঁছে গেছে বন্দনা। দম আটকে ছুরি চালাল সে। লোকটার শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে ঘ্যাঁচ করে হাতল পর্যন্ত গেঁথে গেল ওটা। 'এত সহজ! দেখি তো কিভাবে তুমি চন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে মরো।' চিৎকার করছে বন্দনা, হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা বের করে আবার গাঁথল। তার অবশ্য কোন দরকার ছিল না, কারণ হৃৎপিণ্ড চিরে যাওয়ায় প্রথম আঘাতেই ঘায়েল হয়েছে লোকটা।

লাশটা গা থেকে ফেলে দিয়ে এক লাফে সিধে হলো চন্দনা, ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বোনকে। দু'জনের চোখেই পানি বেরিয়ে এল।

'ধন্যবাদ, চন্দনা,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল রানা। 'তুমি ঠিক সময়ে জাঙ্কে না উঠলে আমাদের কপালে খারাবি ছিল।'

'ডেকে মারামারি শুরু হয়েছে দেখে ভাবলাম এতগুলো লোকের সঙ্গে লড়তে হলে তোমাদের সাহায্য দরকার, তাই উঠে পড়ি।' বোনের দিকে তাকাল চন্দনা। 'এই বোকা, তোর ট্রেনিং কোথায় গেল? তোর ভাগে দুটো টার্গেট পড়েছিল, কিন্তু শুধু আহত করে ফেলে রাখলি কেন? মারা গেছে কিনা নিশ্চিত হওয়া উচিত ছিল না?'

বন্দনার চেহারা ম্লান হয়ে গেল। 'রানার জরুরী সাহায্য দরকার দেখে প্রথমটাকে ছেড়ে দিই,' বলল সে। 'তারপর আবছা ভাবে তোকে দেখে দ্বিতীয় লোকটার কথা একদম ভুলে যাই।' হঠাৎ হাসল সে। 'ভুলচুক যাই করি, বোনের প্রাণ বাঁচিয়েও কি তার প্রায়শ্চিত্ত হয়নি?'

বন্দনাকে আবার জড়িয়ে ধরল চন্দনা। 'দূর পাগলী, প্রায়শ্চিত্ত কিসের! তুই আমাকে চিরঋণী করে রাখলি।'

'এই ঋণ তোকে শোধ করতে হবে,' শর্ত দিল বন্দনা, 'বিপদের সময় সাহায্য করে।'

বোনের গাল টিপে দিয়ে হাসল চন্দনা, সরে এসে রানার সামনে দাঁড়াল। 'আসল কথাটাই জিজ্ঞেস করা হয়নি। তুমি জানলে কিভাবে যে লাউ ঝেমি পরিবার খুন হয়ে গেছে?'

'বুড়োর চেয়ারটা,' বলল রানা। 'আগে যেখানে দেখেছিলাম তারচেয়ে স্টার্নের আরও কাছে মনে হলো ওটাকে। তারপর খেয়াল করলাম, বুড়োর পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে না। সকালে দেখা ওই ধোঁয়ার কথাটা আমার মনে পড়ে যায়।'

'একেই বলে অবজারভেশন,' বলল চন্দনা। 'ভয় হচ্ছে, আমি না তোমার ভক্ত হয়ে পড়ি।'

'কিন্তু আমার তো ধারণা, অনেক আগে থেকেই তুমি আমার ভক্ত,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'মানে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল চন্দনা।

'না-না, বিশ্বাস করো, আড়াল থেকে সত্যি কিছু শুনিনি আমি!' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'এমনকি আমি কাউকে গোপনে নাচতেও দেখিনি।'

আড়ষ্ট হয়ে গেল চন্দনা, ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে লাল হয়ে উঠল মুখ।

'এখন আর অস্বীকার করে কোন লাভ নেই, চন্দনা,' হেসে উঠে বলল বন্দনা। 'যেভাবেই হোক তুই ধরা পড়ে গেছিস।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'সন্দেহ নেই, প্রতিপক্ষকে তুই-ই ঘায়েল করবি। আমার জেতার কোন আশাই নেই।'

'তুই চুপ কর মুখপুড়ী!' ধমক দিল চন্দনা।

'এবার কাজের কথা,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'হ্যাঁ, বলো,' জিজ্ঞেস করল বন্দনা, 'কি করতে হবে?'

'লাশগুলো হোল্ডে রাখব আমরা,' বলল রানা। 'তবে চেয়ারসহ বুড়ো যেমন আছে তেমনি থাকুক।'

'কেন?'

'এই গ্রুপটা ফিরে গিয়ে রিপোর্ট না করলে কি ঘটেছে জানার জন্যে কেউ একজন অবশ্যই আসবে। সে যখন দেখবে বুড়ো একই জায়গায় বসে আছে, ধরে নেবে গ্রুপটা জাঙ্কেই কোথাও গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছে। এতে করে হাতে আমরা অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় পাব।'

সময় নষ্ট না করে কাজে নেমে পড়ল ওরা। 'তবে প্ল্যানটা আমাদের বদলানো দরকার,' বলল চন্দনা, একটা লাশকে গড়িয়ে হোল্ডে ফেলার কাজে রানাকে সাহায্য করছে। 'যেখানেই ধরে নিয়ে যাক, ওরা যে লাউ ঝেমিকে টরচার করছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এতক্ষণে সে নিশ্চয়ই আমাদের গন্তব্য বলে দিয়েছে বা শীঘ্রি বলে দেবে। ওরা আমাদের জন্যে হুমেনচাই-এ অপেক্ষা করবে।'

'করুক অপেক্ষা, ওখানে আমাদেরকে ওরা পাবে না,' বলল রানা। 'এ-ধরনের কিছু ঘটার আশঙ্কা থেকে বিকল্প প্ল্যানও তৈরি হয়ে আছে। ক্যান্টন-কাউলুন রেলপথে পৌঁছাতে একটু বেশি হাঁটতে হবে, এই যা। আমরা হংকঙের দ্বিতীয় কোস্টলাইন ধরে রওনা হব। এখন আমাদের প্রথম গন্তব্য হবে তায়া ওয়ান। বোট থেকে নামব ঠিক নিমশান-এর নিচে।' আকাশের গায়ে তৈরি মাস্তুলের জঙ্গলে তাকাল ও। 'অন্য একটা জাঙ্ক দরকার আমাদের।'

বে-তে নোঙর ফেলা একটা জাঙ্কের দিকে তাকাল চন্দনা। 'ওটা চলবে?'

জাঙ্কটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। আকারে বেশ বড়, যদিও এঞ্জিন-বোট, তিনটে মাস্তুল আছে, নতুন পেইন্ট চকচক করছে, বোর কাছে ড্রাগন আঁকা। সাধারণ জাঙ্কের চেয়ে আকারে দুই কি আড়াই গুণ হওয়ায় এঞ্জিনও নিশ্চয় অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। আরেকটা সুবিধে, ওটা তানকা জাঙ্ক নয়, দখল করলে

বাচ্চাকাচ্চাসহ পুরো একটা পরিবারকে বিপদে ফেলা হবে না। তাছাড়া, তানকা জাঙ্ক এখন আর ওদের জন্যে নিরাপদও নয়। ওটা ফুচিয়ান প্রদেশ থেকে আসা ফুচাউ জাঙ্ক। ওদিকের জাঙ্কগুলো হংকঙে বাঁশ আর তেলের ড্রাম নিয়ে আসে। উপকূল ধরে উত্তর দিকে গেলে কেউ সন্দেহ করবে না।

পানিতে নামার প্রস্তুতি নিল রানা। ওদেরকে বলল, 'ক্রুদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না, বোধহয় তীরে ফুর্তি করতে গেছে। তবে সাবধান, এক-আধজন গার্ড নিশ্চয়ই থাকবে।'

তিনজন পাশাপাশি সাঁতরে জাঙ্কটার কাছে পৌঁছাল ওরা, তারপর সাবধানে চক্কর দিল। মাত্র একজন লোককে দেখল রানা। ন্যাড়া মাথা, বেঁটে ও শক্ত-সমর্থ। ছোট ডেকহাউসের পাশে মাস্তুলের গায়ে হেলান দিয়ে বসে আছে, মনে হলো ঘুমাচ্ছে। জাঙ্কের গায়ে রশির একটা মই ঝুলছে, এ যেন আরও একটা লক্ষণ যে ক্রুরা তীরে গেছে। সেদিকে এগোল রানা, তবে ওরা দুই বোন আগে নাগাল পেয়ে গেল। গাছ বেয়ে ওঠা কাঠবিড়ালির মত জাঙ্কের ওপর উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল বন্দনা ও চন্দনা। রানা রেইলিং টপকে ডেকে তখনও পা রাখেনি, তার আগেই অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেছে। ঘুমন্ত লোকটার ঘাড় ধরে আছে চন্দনা, যাতে সে কাত হয়ে পড়ে না যায়, আর তার পিঠে গাঁথা ছুরিটা হ্যাঁচকা টানে বের করছে বন্দনা। কাপড়ে রক্ত লাগার ভয়ে লাশটাকে ছেড়েই লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল চন্দনা। রানার সঙ্গে ধাক্কা লাগতে ঘাড় ফেরাল সে।

বন্দনা বলল, 'ঝামেলা শেষ, মিস্টার রানা।'

চন্দনা বলল, 'আরও কেউ আছে কিনা দেখা দরকার।'

'ওকে তোমরা এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করলে কেন?' ঘটনাটা এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রানার।

'নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়ার ট্রেনিং নিইনি, তাই,' জবাব দিল বন্দনা। 'খুন না করে আর কোন উপায় ছিল? ওকে ছেড়ে দিলে

ডক্টর চউ-এর স্পেশাল সিকিউরিটি, চীনা ইন্টেলিজেন্স, পেট্রল বোট, গানবোট—কারও আর জানতে বাকি থাকত না ওই জাঙ্ক নিয়ে পালিয়েছি আমরা।'

'লোকটাকে আমরা বন্দী করে হোল্ডে আটকে রাখতে পারতাম,' বলল রানা। 'তারপর সুযোগ বুঝে ডাঙার এমন কোথাও হাত-পা বেঁধে নামিয়ে দিতাম, তিন-চার দিন পর লোকজন ওকে দেখতে পেত। ততদিনে শেষ হয়ে যেত আমাদের কাজ।'

বোনের দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের সুরে বন্দনা বলল, 'এই হলো তোর রোমান্টিক হিরো, চন্দনা, মানুষের জন্যে দরদ একেবারে উথলে উঠছে। এই যে মশাই, বলি, নিজেদের প্রাণ হারাবার ঝুঁকি কোন আক্কেলে নিতে বলো তুমি? হোল্ডে আটকে রাখলে যদি পালাত, তখন কি হত?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে চন্দনা বলল, 'তুই চুপ কর, বন্দনা। আমরা বোধহয় সত্যি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।'

'একজন নিরীহ ঘুমন্ত মানুষকে খুন করে বলছ একটু বাড়াবাড়ি?' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখছে রানা।

'ঠিক আছে, মানছি, কাজটা ভুল হয়ে গেছে,' তাড়াতাড়ি বলল চন্দনা। 'তবে এ নিয়ে পরে কথা বললে হয় না? ক্রুরা যে-কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে। বিপদে পড়তে না চাইলে এখুনি আমাদের রওনা হওয়া দরকার।'

রানা চিন্তা করল, এই পর্যায়ে একা রওনা হওয়াটা নির্ঘাত বোকামি হবে, কারণ ওর সাহায্য না পেলেও নিজেদের চেষ্টায় কুয়াংটাং-এ যাবে ওরা। পৌঁছাতে পারুক বা না পারুক, চেষ্টা তো অবশ্যই করবে। তারমানে একই অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে দুটো মিশন রওনা হবে। স্বভাবতই তীব্র একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হবে। ওদের দু'জনের নীতিবোধের যে অভাব, হয়তো মূল শত্রুকে দিয়ে ওর ক্ষতি করারও চেষ্টা করবে ওরা। তারচেয়ে ওদেরকে নিজের

সঙ্গে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ, চোখে-চোখে রাখা যাবে।

তিনজন মিলে পাল তিনটে তুলল ওরা। রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসও পাওয়া গেল, কোন ঝামেলা ছাড়াই ভিক্টোরিয়া হারবারকে পিছনে ফেলে কোয়ারি পয়েন্টকে পাশ কাটাল জাঙ্ক, তুং লাং আইল্যান্ডের গা ঘেঁষে এগোচ্ছে। ডেকের নিচে থেকে সবার জন্যে শুকনো কাপড় পেল বন্দনা। তাগাদা দিয়ে রানা ও চন্দনাকে ভিজে কাপড় ছাড়াল, নিজেই সব ধুয়ে শুকাতে দিল রশিতে। দুই বোনকে ডেকে শিখিয়ে দিল রানা তারা দেখে কিভাবে ঠিক রাখতে হবে বোটের কোর্স। পালা করে হুইলে থাকার কথাও বলল। দু'ঘণ্টা করে ডিউটি। ঘুমাতে হবে নিচে।

সারারাত ফুলস্পীডে ছুটল জাঙ্ক। চারটের দিকে রানা হুইলে রয়েছে, প্রথম পেট্রলবোটকে আসতে দেখা গেল। দেখার আগে এঞ্জিনের আওয়াজ পেয়েছে ও, তীরে ও পাহাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে। তারপর অন্ধকার পানিতে সার্চ লাইটের লম্বা টানেল দেখা গেল। স্পীড আগেই কমিয়ে এনেছে রানা, হুইলের ওপর ঝুঁকে স্থির রাখছে কোর্স। আরও কাছাকাছি এসে জাঙ্কের ওপর সরাসরি সার্চ লাইট তাক করল পেট্রলবোট। ওদেরকে ঘিরে পুরো একটা চক্কর দিল, তারপর আলো নিভিয়ে স্পীড বাড়িয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে মিলিয়ে গেল এঞ্জিনের আওয়াজ।

ডেকে উঠে এল দুই বোন।

'রুটিন চেক,' বলল রানা। 'তবে খানিক পর আবার ফিরে আসবে।'

'এরপর এলে আমাদের খোঁজেই আসবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ইতিমধ্যে জাঙ্কের ক্রুরা নিশ্চয়ই ফিরেছে। জাঙ্কটাকে না পেয়ে হারবার পুলিসকে রিপোর্ট করেছে তারা।'

'তুমি বলতে চাইছ, ওই বোটে হাবরার পুলিস ছিল? ডক্টর চউ-এর স্পেশাল সিকিউরিটি নয়?'

'কারা ছিল বলা মুশকিল। জলপুলিস হলে ফিরে না-ও আসতে পারে, তার বদলে রেডিওর সাহায্যে টহলরত সামনের গানবোটকে সতর্ক করে দেবে। আর যদি পাগলবিজ্ঞানীর স্পেশাল সিকিউরিটি হয়, তাদের বোট ওই একটা হবারই বেশি সম্ভাবনা—তারমানে আমাদের পিছন থেকে আসবে।'

'বিপদটা কখন ঘটবে বলে তোমার ধারণা?' জিজ্ঞেস করল বন্দনা।

'পাঁচ মিনিট থেকে এক ঘণ্টার মধ্যে।'

'সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কি?'

'ধরে নিতে হবে স্পেশাল সিকিউরিটি আসছে,' বলল রানা। 'এটা ডীপ-ওয়াটার জাঙ্ক, লাইফ র‍্যাফট্ না থেকে পারে না। সামনে গিয়ে দেখো, পাবে।'

পাঁচ মিনিট পর কাপড় পাল্টে ফিরে এল ওরা। হ্যাঁ, বৈঠা সহ একটা লাইফ র‍্যাফট আছে; বাঁধন খুলে গানেল-এর ধারে রেখে এসেছে ওরা। রশি থেকে রানার কাপড়চোপড়ও নিয়ে এসেছে, দ্রুত পরে নিল রানা। চাঁদটা মেঘে ঢাকা থাকায় কিছুটা স্বস্তি বোধ করছে ও। চাঁদের সঙ্গে তারাও অদৃশ্য হয়েছে, অস্পষ্ট উপকূল রেখা দেখে কোর্স ঠিক রাখতে হচ্ছে ওকে। হাতঘড়ি দেখল, সাড়ে চারটে। একটু পরেই জোয়ার শুরু হবে। ভেলায় চড়তে হলে তীরে ওঠার জন্যে স্রোতের সাহায্য পাওয়া যাবে। দুই বোন ডেকে বসে নিচু গলায় কি নিয়ে যেন তর্ক করছে। এক সময় হাত তুলে ওদেরকে চুপ করতে বলল রানা। গত আধ ঘণ্টা ধরে পরিচিত একটা আওয়াজ শোনার জন্যে কান খাড়া করে আছে ও। ওরা চুপ করতেই চিনতে পারল শব্দটা।

'বোট আসছে। একটাই,' ফিসফিস করল চন্দনা।

'যদি ধরে নিই ফুলস্পীডে আসছে,' বলল রানা, 'ছয় কি পাঁচ মিনিট পর দৃষ্টিসীমায় আসবে। তোমাদের একজন হুইলটা রশি দিয়ে বাঁধো, আরেকজন ভেলাটা নিচে নামাও। নিচে একজোড়া

পঞ্চাশ গ্যালন অয়েলড্রাম দেখেছি, ওগুলো কাজে লাগাতে যাই আমি।'

'কেন?' চন্দনা অবাক। 'তেলের ড্রাম দিয়ে কি হবে?'

'কিছু একটা করা দরকার না? ওরা যাতে ভেলাটাকে ধাওয়া না করতে পারে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'এক সেকেন্ড,' বলে এক পা এক পা করে রানার সামনে এসে দাঁড়াল বন্দনা। 'মিস্টার রানা, আমাদেরকে তুমি বলেছ, চীন সরকারের কোন ক্ষতি করা যাবে না। ওই বোট যে সরকারী নয়, তা তুমি বুঝছ কিভাবে?'

'সময় হলে বোঝা যাবে,' বলল রানা। 'সরকারী পেট্রল বোট হলে কেউ ওরা পুড়ে মরবে না।'

'একটু ব্যাখ্যা করবে, প্লীজ?' বন্দনার গলায় শ্লেষ।

'এখন সময় নেই,' বলে হোল্ডের দিকে চলে এল রানা। নিচে নেমে ড্রাম দুটোকে স্টারবোর্ড দিকের খোলের গায়ে তার দিয়ে বাঁধা অবস্থায় পেল ও। বেল্টে আটকানো লেদার পাউচ থেকে সাদা এক্সপ্লোসিভ পাউডার বের করে একটা ড্রামের মাথায় ছড়াল, তৈরি করল সরু একটা রেখা। মনে মনে হিসাব করছে ও। জাঙ্কের কাছে পৌঁছাতে চার মিনিট লাগবে বোটটার। নৌ-পুলিসের পেট্রল বোট হলে প্রথমেই জাঙ্কের গায়ে ভিড়বে না, নিরাপদ দূরত্বে থেমে হ্যান্ড মাইকে ক্রুদের ডাকবে, জানতে চাইবে কারা আছে জাঙ্কে। সাড়া না পেলে সাবধান করার জন্যে ফাঁকা গুলি করবে কয়েকটা। এরপরও সাড়া না পেলে জাঙ্কের গায়ে ভিড়ে সার্চ শুরু করবে। তারমানে আরও চার মিনিট। সব মিলিয়ে আট মিনিট। এখন রানা যদি পাঁচ মিনিটের মাথায় বিস্ফোরণ ঘটাবার ব্যবস্থা করে, নৌ-পুলিস হলে তাদের কারও কোন ক্ষতি হবে না।

জাঙ্কের মেঝে থেকে ঘাস দিয়ে বোনা চাটাই তুলে, চোখ দিয়ে মেপে খানিকটা ছিঁড়ল রানা। লাইটার জ্বেলে একটা প্রান্ত

ধরাল, তারপর সেটা ড্রামের ওপর এমনভাবে রাখল, অক্ষত প্রান্তটা যাতে এক্সপ্লোসিভ পাউডার স্পর্শ করে। ও জানে, ওর আন্দাজ আধ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে।

জাঙ্কের পাশে ভাসমান ভেলায় উঠে বসেছে ওরা দুই বোন, মই বেয়ে রানাও নেমে এল। বোট বা পেট্রল বোটের স্পটলাইট এরইমধ্যে দেখতে পাচ্ছে ওরা, বড় একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে এক দিক থেকে আরেক দিকে বারবার ছুটোছুটি করছে। বন্দনার হাত থেকে বৈঠা নিয়ে চালাচ্ছে এখন রানা, ভেলাটাকে তীরের দিকে ছোটাচ্ছে। জানে বোট এসে পড়ার আগে তীরে পৌঁছানো সম্ভব নয়, তবে জাঙ্ক থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায় ও। বোটটার কাঠামো এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দিক বদলাল; এঞ্জিনের শব্দ কমে এল, স্পটলাইট জাঙ্কের ওপর স্থির হয়ে আছে। বৈঠা রেখে দিল রানা। 'শুয়ে পড়ো, কোন শব্দ কোরো না।' নিজেও শুলো, শুধু মাথাটা সামান্য উঁচু করে ভেলার কিনারা দিয়ে বোটটাকে দেখছে। স্রোতের টানে ভেসে এসে সরাসরি জাঙ্কের গায়ে ঠেকল বোট। কোন নির্দেশ বা হুমকি দেয়া হলো না, বোটের আরোহীরা মই বেয়ে জাঙ্কে উঠে যাচ্ছে। রানা যে হিসাব করেছিল তার চেয়ে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল।

প্রথমে জাঙ্ক থেকে উথলে উঠল কমলা রঙের অগ্নিশিখা, তারপর প্রায় একসঙ্গে বিস্ফোরিত হলো পেট্রল বোট ডেকের অ্যামুনিশন ও এঞ্জিনরুম। জাঙ্ক ও পেট্রল বোটের জ্বলন্ত টুকরো বৃষ্টির মত চারপাশের পানিতে পড়ছে, ভেলার ওরা তিনজন হাত দিয়ে মাথা ঢেকে রাখল। আবার যখন তাকাল রানা, দেখল দুটো আগুন এক হয়ে গেছে, বোট দুটোকে আলাদাভাবে চেনার কোন উপায় নেই, পানিতে আগুন লাগায় হিসহিস শব্দ হচ্ছে। বৈঠা তুলে নিয়ে তীরের দিকে রওনা হলো আবার রানা। কমলা আভা পানিতে একটা উজ্জ্বল বৃত্ত তৈরি করেছে। তীর বলতে গাঢ় একটা

রেখা, ক্রমশ কাছে সরে আসছে, এইসময় ঝপ করে আবার চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে ফিরে এল অটুট নিস্তব্ধতা।

ভেলার তলা ঘষা খেলো বালিতে। পানিতে নামল রানা, মাত্র গোড়ালি পর্যন্ত ডুবল। সামনেই নরম সৈকত। ভোরের প্রথম আভায় আকাশের গায়ে অর্ধবৃত্তাকার পাহাড় দেখে আন্দাজ করল ও, তায়া ওয়্যান-এর মাঝামাঝি কোথাও পৌঁছেছে ওরা, নিমশান-এর নিচে ছোট্ট একটা বে-তে। সবদিক বিবেচনা করলে মন্দ বলা যাবে না। সৈকত থেকে পঞ্চাশ ফুট দূরে একটা ঝোপের ভেতর ভেলাটাকে টেনে আনা হলো। চোখ বুজে তিন মিনিটের জন্যে ধ্যানমগ্ন হলো রানা, বিসিআই হেডকোয়ার্টারের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টে দেখা ম্যাপটা হুবহু ফিরিয়ে আনল মনের পর্দায়, স্পেশালিস্ট ভদ্রলোকের কথাগুলোও স্মৃতি থেকে তুলে এনে আরেকবার শুনল।

চোখ খুলে বে বা ইনলেটকে ঘিরে থাকা নিচু পাহাড়গুলোর দিকে তাকাল ও। এ নিশ্চয়ই কাই লাং মাউন্টেইন রেঞ্জের নিচের দিক, পাহাড়ী হলেও দুর্গম নয়। ক্যান্টন-কাউলুন রেললাইন ধরতে হলে উত্তর দিকে যেতে হবে ওদেরকে।

ওদের দুজনের কাগজ-পত্র আগেই পরীক্ষা করেছে রানা। নেপালের নাগরিক, একটা চীনা আর্ট কলেজের শেষ বর্ষের ছাত্রী, ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছে। রানা একজন ভারতীয় জার্নালিস্ট, প্রচণ্ড বামপন্থী বলে কুখ্যাত কোলকাতার একটা দৈনিকে কাজ করে। ওর পাসপোর্টের সঙ্গে যে ভিসাটা আছে, তাও জাল, যদিও প্রমাণ করা সহজ হবে না। তবে জাল কাগজ-পত্র দেখিয়ে স্থানীয় পুলিসকেই শুধু বোকা বানানো সম্ভব। বিপদ এড়াবার সবচেয়ে ভাল উপায় হলো ধরা না পড়া।

'শুধু আড়াল পেলে দিনের বেলা হাঁটব আমরা,' বলল রানা। 'তা না হলে দিনে ঘুমাব, হাঁটব রাতে।'

পাঁচ

ঘুম বা খিদে নিয়ে ওরা কোন অভিযোগ করল না। লম্বা পা ফেলে রানার সঙ্গে তাল বজায় রাখতে ওদের কোন অসুবিধে হচ্ছে বলেও মনে হলো না।

ম্যাপে দেখা পাহাড়ী এলাকাটা স্মরণ করতে রানার যদি ভুল না হয়ে থাকে, মেইন রোড ও জনবসতি থেকে যথেষ্ট দূরে রয়েছে ওরা। সামনে পর-পর অনেকগুলো জঙ্গলে ঢাকা উপত্যকা পড়বে, কিন্তু তারপর এক সময় খোলা পাথুরে প্রান্তরে বেরুতে হবে ওদেরকে।

পরদিন দুপুরের মধ্যে সবগুলো উপত্যকা পেরিয়ে এল ওরা। এরপর শুরু হলো রোদের অত্যাচার। এদিকে গাছপালা খুব কম, তবে বোল্ডারের ফাঁকে ফাঁকে লম্বা ঘাস আর কিছু ঝোপ আছে। নগ্ন পাথরে গা লাগার উপায় নেই, এত গরম যেন ফোস্কা পড়ে যাবে। বিকেলের দিকে একটা পাহাড়ী ঝর্না দেখতে পেয়ে পানি খাবার জন্যে থামল ওরা।

'খোলা জায়গায় হাঁটছি, উচিত হচ্ছে?' মাথার পিছনে হাত তুলে চুলগুলো ক্লিপ দিয়ে ভাল করে আটকাচ্ছে চন্দনা।

'ওই ছায়ায় শুয়ে পড়ো,' কয়েকটা বোল্ডার দেখিয়ে বলল রানা। ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এসে সবার আগে নিজেই শুলো। লম্বা ঘাসে একটানা বাতাস লাগায় শন্-শন্ শব্দ হচ্ছে। মনের ঘড়িতে বিশ মিনিট পর অ্যালার্ম বাজার নোটিশ দিয়ে চোখ বুজল ও।

কিন্তু ওই অ্যালার্মে নয়, রানা ঝট করে চোখ মেলল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সতর্ক করায়। মনে হলো, কাছেই ওত পেতে আছে বিপদ। কেউ ওকে লক্ষ করছে। চোখ মেলে চারদিকে তাকাল। কোথাও কেউ নেই। ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। কই, কোথায় বিপদ! অথচ অনুভূতিটা আরও তীব্র হয়ে উঠছে–কেউ দেখছে ওকে।

মেয়ে দুটোর দিকে তাকাল রানা। ওদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রানার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। ওর দু'পাশে শুয়ে আছে দুই বোন, কিন্তু মাথা তুলে চারপাশে তাকাচ্ছে।

তারপর দেখতে পেল রানা। লম্বা ঘাসের ভেতর, দাঁড়িয়ে আছে, গায়ে সবুজ শার্ট। পনেরো কি বিশ ফুট দূরে ছেলেটা, বয়স খুব বেশি হলে বারো। চোখাচোখি হতে যা দেরি, ঘুরেই দৌড় দিল।

'সর্বনাশ!' বলে লাফিয়ে উঠল চন্দনা।

লাফিয়ে উঠেছে বন্দনাও, তবে চন্দনার মত ইতস্তত না করে ছেলেটাকে ধাওয়া করল সে, এরইমধ্যে ছুরি বেরিয়ে এসেছে হাতে। চিৎকার করে বলল, 'ঘিরে ফেলো! সাবধান, যেন পালাতে না পারে!'

তিনজন তিনদিকে ছুটল ওরা। পাথরের মাঝখানে লম্বায় বিশ গজ আর চওড়ায় পনেরো গজ জায়গায় ঘাস জন্মেছে, তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার ভেতর কোথাও ছেলেটাকে পাওয়া গেল না।

'শুয়োর ছানাটা আশপাশেই কোথাও আছে,' হিসহিস করে বলল বন্দনা। 'যেভাবে হোক খুঁজে বের করতে হবে। সম্ভবত ওই ঢালের মাথা হয়ে নিচে নেমে গেছে। এসো!'

এক ছুটে ছোট্ট রিজটা পার হয়ে এল রানা, মেয়েগুলোর আগে থাকার ইচ্ছা। ঢালের এদিকে আরও ঘাস ও কিছু ঝোপ দেখা যাচ্ছে। এক-এক করে সবগুলো জায়গায় খুঁজল ও। কোথাও নেই সে। হঠাৎ এলই বা কোত্থেকে, গেলই বা কোথায়!

এভাবে অদৃশ্য হওয়া সম্ভব শুধু এলাকাটা তার চেনা থাকলে। বাম দিকের একটা ঢাল থেকে নেমে চোখের আড়ালে চলে গেল চন্দনা। একটু পরই তার নরম শিস ভেসে এল। দু'দিক থেকে ছুটে ঢালটা পেরুল রানা ও বন্দনা। চন্দনা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে রয়েছে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে ওরা ছোট একটা খামারবাড়ি দেখতে পেল। বাড়িটার পিছনে এক পাল শুয়োরের বাচ্চা কাদায় গড়াগড়ি খাচ্ছে।

'ওই বাড়িতেই ঢুকেছে,' বলল চন্দনা, ইতিমধ্যে তার হাতেও ছুরি বেরিয়ে এসেছে। 'এসো, ধরি...'

'দাঁড়াও,' বাধা দিল রানা। 'ব্যাপারটাকে এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন? তোমাদের দুই বোনের আচরণ দেখে মনে হচ্ছে পেশাদার কসাই, আর ছেলেটা যেন হাত থেকে ছুটে যাওয়া শুয়োর ছানা। ওর অপরাধটা কি? আমাদেরকে দেখে ফেলেছে, এই তো? তাতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?'

'চীন সম্পর্কে মশাই দেখছি একদমই বকলম,' ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিল বন্দনা, বোনের সাহায্যে এগিয়ে এল। 'এদিকে লোকবসতি কম হওয়ায় সরকার প্রত্যেককে ইনফরমার হিসেবে নিয়োগ দিয়ে রেখেছে। প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব এলাকায় কোন বিদেশীকে দেখলে বা কোথাও কমিউনিজম বিরোধী তৎপরতা লক্ষ করলে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনকে জানাতে হবে। এর জন্যে নগদ পুরস্কারের ব্যবস্থা তো আছেই, সংবাদদাতাকে ভাল নাগরিক হিসেবে তালিকাভুক্তও করা হবে।'

বন্দনার কথায় যুক্তি আছে, সেটা মনে রেখেই রানা বলল, 'স্থানীয় প্রশাসন এখান থেকে অন্তত দু'দিনের পথ, তারা খবর পেয়ে আমাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার আগে আমরা কোথায় থাকব, ভেবে দেখেছ?'

'দু'দিনের পথ কমিয়ে তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনা যায়,' এবার যুক্তি দিল চন্দনা। 'পোস্ট অফিস থেকে টেলিফোন করে।'

চন্দনা থামতেই বন্দনা বলল, 'এভাবে অহেতুক তর্ক করে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। চন্দনা, আয় আমার সঙ্গে।'

'না,' রানার গলায় কঠিন নির্দেশ। 'আমি অনুমতি না দিলে এক পা-ও নড়বে না তোমরা। আগে আমাকে জানতে হবে...'

'মিস্টার রানা,' বাধা দিল বন্দনা, কথা বলছে চিবিয়ে চিবিয়ে, 'নিজেকে তুমি বোধহয় একটু বেশি বড় করে দেখছ। আমরা কি করব না করব, তার জন্যে কি তোমার অনুমতি নিতে হবে? কেন?'

'এই জন্যে যে দু'পক্ষের আলোচনার সময় বিসিআই-এর তরফ থেকে আইসিআইকে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছিল এই অ্যাসাইনমেন্টে নেতৃত্ব দেব আমি।'

'কই, আমি তো এ-ব্যাপারে কিছু জানি না!' রেগে গেল বন্দনা। 'তাছাড়া, ভারত এত বড় একটা দেশ হয়ে বাংলাদেশের মত ছোট একটা প্রতিবেশীর অন্যায় আবদার মেনে নেবে, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'তোমার জানার কথা নয়, কারণ তুমি তো উটকো ঝামেলা হিসেবে আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছ,' বলল রানা। 'আমার সন্দেহ, গোপন কিছু কলকাঠি নেড়ে আইসিআইকে শেষ মুহূর্তে বাধ্য করা হয় তোমাকে চন্দনার সঙ্গে পাঠাতে। সেজন্যে এমনকি তোমাকে ওরা ব্রিফ করার সময়ও পায়নি।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে বোনের দিকে তাকাল বন্দনা। 'তুই কিছু জানিস নাকি, চন্দনা, সত্যি ওর নির্দেশ মত চলতে হবে আমাদের?'

'প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা,' বলল চন্দনা, চেহারা থমথম করছে। 'তবে ডক্টর কংসু চউকে রানা যেহেতু আগে থেকে চেনে, ওর প্ল্যান ধরেই কাজটা করব আমরা—এ-ধরনের একটা সমঝোতা হয়েছিল।'

'ওই সমঝোতার অর্থ হলো, আমার কথাই চূড়ান্ত,' বলল

রানা। 'এখন, ওই বাড়িতে ঢোকার আগে আমাকে জানতে হবে ছেলেটাকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা।'

চন্দনা বলল, 'ছেলেটাকে আমরা অ্যাসাইনমেন্টের জন্যে গুরুতর হুমকি বলে মনে করছি।'

সে থামতেই বন্দনা বলল, 'কাজেই প্রয়োজনে ওকে আমরা খুন করব।'

'না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল রানা। 'প্রথম কথা, কি করা প্রয়োজন সেটা আমি ঠিক করব। দ্বিতীয় কথা, কোন অবস্থাতেই এই বয়সের একটা বাচ্চা ছেলেকে মেরে ফেলা যাবে না, তা সে যত বড় ঝুঁকিই নিতে হোক।'

মাটিতে পা ঠুকে প্রতিবাদ জানাল বন্দনা। 'রেকর্ডে থাকুক, তোমার এই এক তরফা রুলিং আমি মানি না।'

'ওয়াকআউট করছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তোমার ওপর কড়া নজর রাখার জন্যে,' ঝাঁঝের সঙ্গে বলল বন্দনা। 'ওয়াকআউট করলে যা খুশি তাই করার লাইসেন্স পেয়ে যাবে তুমি–তোমাদের পার্লামেন্টে সরকারী দল সাধারণত যা পেয়ে থাকে।'

চন্দনার দিকে ফিরল রানা। 'আমি যা বলব তাই হবে, ঠিক আছে তো?'

মাথা নাড়ল চন্দনা। 'পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেয়া উচিত, রানা। আলোচনার সুযোগ তুমি কেড়ে নিতে পারো না।'

'ঠিক আছে, আলোচনা করেই যা করার করা হবে।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এর মানে হলো, আমাকে না জানিয়ে কিছু করবে না তোমরা।'

'ঠিক আছে।'

বাড়িটার দিকে তিনদিক থেকে এগোল ওরা, পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে। ওদেরকে অপেক্ষা করতে বলে গোটা বাড়ি বাইরে থেকে একবার চক্কর দিল রানা, আগের পজিশনে ফিরে

এসে সংকেত দিল—ভেতরে কোন পুরুষমানুষ নেই।

দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা। এটাই প্রধান কামরা, সব কাজ এখানেই সারা হয়। এক পাশে চুলো ও হাঁড়ি পাতিল, আরেক পাশে ফায়ারপ্লেস, মাঝখানে বিরাট বিছানা। বিছানার ধারে ত্রিশ-বত্রিশ বছরের এক গৃহবধূ দাঁড়িয়ে আছে, পরনে ঢোলা ড্রেস, মাথায় স্কার্ফ জড়ানো। চেহারাটা থমথম করছে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঘনঘন ফুলে উঠছে নাকের ফুটো।

'ওর ওপর নজর রাখো,' বলে গোটা বাড়ি ভেতর থেকে আরেকবার সার্চ করল রানা। পাশের সংলগ্ন দুটো ছোট কামরায় কিছু কাপড়চোপড় ছাড়া আর কিছু নেই। তবে একটা ঘরের পিছন দিকে একটা দরজা আছে। সেটা খুলে কাঠের তৈরি একটা শেড দেখল রানা।

এক মিনিট পর মেইনরুমে ফিরে এল রানা, পিঠে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢোকাল ছেলেটাকে। তার ফোলা-ফোলা মুখে সন্ত্রস্ত ভাব। 'এখানে আর কে থাকে?' ক্যান্টনিজ ভাষায় মহিলাকে জিজ্ঞেস করল ও।

'কেউ না,' দ্রুত জবাব দিল ছেলেটা ।

ঠাস করে একটা চড় কষল রানা, পাক খেয়ে এক কোণে ছিটকে পড়ল ছেলেটা। এগিয়ে এসে তার সবুজ শার্ট ধরে দাঁড় করাল ও। 'বাঁচতে চাইলে সত্যি কথা বলতে হবে। পাশের কামরায় প্যান্ট-শার্ট দেখলাম, ওগুলো কার?'

'আপনি আমার বাপ লাগেন!' হঠাৎ ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল মহিলাটি। 'বাপজান, আমার পোলারে মাপ কইরা দেন।' ঠিক এই ভাষায় না হলেও, পৃথিবীর যে-কোন এলাকার গ্রাম্য একজন মা তার নিজের আঞ্চলিক ভাষায় এভাবেই সন্তানের প্রাণ ভিক্ষা চাইবে।

ছেলেটাকে ছেড়ে দিল রানা। কাত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল সে।

'বাপজান, আমি সইত্য কথাই কমু,' বলল মহিলাটি, হাত দুটো এক করে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বুকের কাছে তুলল। 'এই হানে আমার সোয়ামি থাহে।'

'এখন সে কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মা, বলবে না!' হঠাৎ চিৎকার করল ছেলেটা।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চোখ গরম করল রানা। 'একদম চুপ!' আবার তাকাল গৃহকর্ত্রীর দিকে। 'কোথায় সে?'

'হে চইলা গেছে,' বলল মহিলা। 'পোস্ট অফিসে যাইব।'

'কি বলেছিলাম?' তিক্ত হেসে রানাকে প্রশ্ন করল চন্দনা। 'জানা কথা লোকটা পোস্টাপিসে গেছে ফোন করতে।'

'তারমানে, এখন আমাদের প্রথম কাজ লোকটাকে ধরা, তারপর তিনজনকেই খতম করা!' খুনের নেশাতেই কিনা কে জানে, উত্তেজনায় কাঁপা-কাঁপা শোনাল বন্দনার গলা। 'মিস্টার রানা, তুমি লোকটাকে ধরে আনো, আমরা এদেরকে পাহারা দিচ্ছি।'

'চুপ!' ধমক দিল রানা। মহিলাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্বামী পোস্ট অফিসে গেছে কখন?'

'এই তো।'

'ছেলের মুখে খবর শুনেই পোস্ট অফিসে ছুটল কেন?'

'দেহেন বাবা, পোলা আমার সরকারী ইস্কুলে পড়ে। তার ওপর হুকুম আছে যেহানে যা দেখব রিপোর্ট করন লাগব। হের বাবায় যাইতে চায় নাই, কিন্তু কাইল ইস্কুলে গিয়া পোলায় তো বেবাকই কইয়া দিব...'

'ভালই ছেলে জন্ম দিয়েছ!' বন্দনার গলায় ঘৃণা।

'পোস্ট অফিস এখান থেকে কত দূরে?' মহিলাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাস্তা ধইরা গেলে তিন মাইল।'

'ওদের ওপর নজর রাখো, প্রয়োজনে ছেলেটাকে বেঁধে

রাখো,'' দুই বোনকে বলল রানা। 'তবে, সাবধান, আমি না ফেরা পর্যন্ত ওদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোমরা। মনে থাকে যেন, আমি কোন অজুহাত শুনব না।'

লোকটা যদি না দৌড়ায়, তিন মাইল পেরুতে যথেষ্ট সময় নেবে, পিছন থেকে ছুটে তাকে ধরা রানার জন্যে কোন সমস্যা নয়। তবে, যদি ভেবে থাকে তাকে ধরার জন্যে কেউ পিছু নেবে তাহলে অবশ্যই সে দৌড়াবে। সেক্ষেত্রে এতক্ষণে লোকটা ওর নাগালের বাইরে চলে গেছে। পাথরের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা পথ, দু'পাশের ঝোপ প্রায় ঢেকে রেখেছে, খানিক পর-পর হোঁচট খাচ্ছে রানা। লোকটাকে ধরার জন্যে ছুটছে ঠিকই, কিন্তু ওর মন পড়ে রয়েছে খামারবাড়িতে। দুই বোন প্রায় এক কাঁটায় ওজন, কাউকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় না। ফিরে এসে যদি দেখে মা ও ছেলে দু'জনকেই খুন করেছে ওরা...আর চিন্তা করতে পারল না, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল। না, সেটা ও কোনমতেই মেনে নেবে না। সে-ধরনের কিছু ঘটলে ওরা হাড়ে হাড়ে টের পাবে সময়ে মাসুদ রানা কী ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে।

একটা পাথুরে ঢালের মাথা থেকে লোকটাকে দেখতে পেল রানা, প্রায় আধমাইল দূরে। সম্ভবত ষষ্ঠইন্দ্রিয় সতর্ক করাতেই ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে থাকল। লম্বায় তেমন বেশি না হলেও, অস্বাভাবিক চওড়া লোকটা, শক্তিশালী কাঠামো। হাতে একটা চকচকে কাস্তে দেখল রানা।

লোকটা বুঝতে পেরেছে দৌড়ে রানার সঙ্গে পারবে না। ওর দিকে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসার আর কি কারণ থাকতে পারে! কাস্তেটা মাথার ওপর তুলে ছুটে আসছে সে। সন্দেহ নেই মোটাবুদ্ধি, গোঁয়ার টাইপের চাষা। এক-আধটু ক্যান্টনিজ ভাষা যা জানে রানা, তারই সাহায্যে আন্তরিকভাবে

চেষ্টা করল লোকটাকে শান্ত করার। বলল, 'আমরা তোমাদের দেশে অতিথি হিসেবে বেড়াতে এসেছি, কোন ক্ষতি করতে আসিনি। আমার কাছে প্রচুর টাকা আছে, তার বিনিময়ে খাবার আর কয়েক ঘণ্টার জন্যে আশ্রয় চাই।'

কিন্তু কোন লাভ হলো না। লোকটার চ্যাপ্টা, নিরেট, গ্রাম্য চেহারায় সীমাহীন ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। নাক-মুখ দিয়ে অশ্লীল ও দুর্বোধ্য ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ করছে সে। হাঁটার গতি কমিয়ে আনল, সাবধানে এগোচ্ছে। আরও কাছাকাছি হতে তার চোখ দুটো চকচক করতে দেখল রানা। কে জানে, হয়তো পুরস্কারের লোভেই লোকটা এরকম বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। হঠাৎ টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে, ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছে এ লোকের।

'পুরস্কারের চেয়ে বেশি টাকা তুমি আমার কাছ থেকেই পেতে পারো,' বলল রানা, শেষ চেষ্টা করে দেখছে। 'কিছু খাবারের ব্যবস্থা করো...কথা দিচ্ছি, আমরা তোমাদের কোন ক্ষতি করব না।'

অকস্মাৎ লাফিয়ে সামনে চলে এল লোকটা, রানাকে লক্ষ্য করে সবেগে কাস্তে চালাল। একেবারে শেষ মুহূর্তে টের পেয়ে কোনরকমে পিছনদিকে পড়ে যেতে পারল রানা, কাস্তের ফলা ঘষা খেলো কাঁধে। ক্ষিপ্র বিড়ালের মত একটা মাত্র গড়ান দিয়ে সিধে হলো আবার। সামনের দৃশ্য আড়াল করে একটা পাঁচিলের মত এগিয়ে আসছে গোঁয়ার চাষা। ধীরে-ধীরে বাম ও পিছন দিকে সরে আসছে রানা।

সঙ্গে ওয়ালথার আছে, কিন্তু বের করতে সাহস পাচ্ছে না রানা। ফাঁকা জায়গায় অনেক দূর পর্যন্ত শোনা যাবে গুলির শব্দ। পোস্ট অফিস এখান থেকে খুব বেশি হলে আর বোধহয় দেড় মাইল দূরে। ওদিকে লোকবসতি থাকাটাই স্বাভাবিক। গুলির শব্দে গ্রামবাসীরা ছুটে এলে গণপিটুনি খেয়ে প্রাণ হারাতে হবে

ওদেরকে। আবার লোকটা লাফ দিয়ে সামনে এসে কাস্তে চালাল। এবার প্রস্তুত ছিল রানা, পিছিয়ে আসতে পারল, কিন্তু তারপরও আলোড়িত বাতাস ওর চোখ স্পর্শ করল, কাস্তের ফলা এক চুলের জন্যে নাকটা কেটে নিতে পারেনি। এবার লোকটা কাস্তের লম্বা ফলা কোন বিরতি ছাড়াই চালাচ্ছে, যেন ঘাস কাটায় মশগুল। বাধ্য হয়ে পিছু হটছে রানা। দ্রুত এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করছে কাস্তে, লাফ দিয়ে ভেতরে ঢোকার কোন সুযোগই পাচ্ছে না ও। লোকটা একটা তির্যক রেখা ধরে এগিয়ে আসায় পথ ছেড়ে ঝোপের রাজ্যে ঢুকে পড়েছে রানা, ওর পিছনে পাঁচিল তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক সারি গাছ। ওখানে পৌঁছাবার পর ওর আর সরবার কোন পথ থাকবে না, গেঁয়ো ভূতটার সহজ টার্গেটে পরিণত হবে। কাস্তের এই ক্ষিপ্র আসা-যাওয়া যেভাবেই হোক থামাতে হবে ওকে। এক সেকেন্ডের একটা বিরতি পেলেই চলে, ফলার নিচে সেঁধিয়ে যাবে রানা।

হঠাৎ একটা হাঁটু মাটিতে গাড়ল ও, ঝোপের গোড়া থেকে এক মুঠো শুকনো ধুলো তুলে ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। মুহূর্তের জন্যে চোখ বুজল প্রতিপক্ষ, কাস্তের ঘাস কাটার ভঙ্গিতে ছন্দপতন ঘটল। ওইটুকুই দরকার ছিল রানার। ফলার নিচে ডাইভ দিয়ে লোকটার হাঁটু ধরল, জড় কাটা গাছের মত ফেলে দিল মাটিতে। পড়ার সময় লোকটার হাত থেকে ছুটে গেল কাস্তে, তারপরও শরীরটা গড়িয়ে আবার ওটা ধরার চেষ্টা করছে। সিংহের মত তার ওপর চড়াও হলো রানা।

কঠিন পরিশ্রম করা শরীর, কাঁধের পেশী ফুলে উঠেছে, ঝটকা মেরে রানাকে গা থেকে ছুঁড়ে ফেলল লোকটা।

একই সঙ্গে দাঁড়াল দু'জন।

গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, বুনো একটা ষাঁড় বললেই হয়; প্রচণ্ড জেদীও, তবে ঘটে বুদ্ধি কম; এরকম বলদকে আগেও বহুবার প্রায় কাবু করেছে রানা। দ্রুত এগোল ও, মারার ভঙ্গি করেও

মারল না, লোকটার একটা ঘুসি এড়িয়ে ঠাস করে চড় কষল ওর গালে। রেগেমেগে বলল, 'এই গাধা, কথা কানে যায় না? বললাম না আমরা কোন ক্ষতি করতে আসিনি! কাউকে খবর দেয়ার দরকার নেই, বল্ কত টাকা চাস?'

চড় খেয়ে দু'বার পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছে ওর প্রতিপক্ষ। কিন্তু অবাক করে দিয়ে এক পলকে আবার সিধে হলো সে, তবে এবার ধরাশায়ী হলো চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি খেয়ে। কিন্তু তাজ্জব হয়ে দেখল রানা, ঠিক আগের মতই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা, যেন কিছুই হয়নি। পরমুহূর্তে ডাইভ দিল সে, কাস্তের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে হাতটা। রানা বুঝতে পারল, ভাল একটা মার না দিলে এ লোকের শিক্ষা হবে না।

শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসছে লোকটা, হাতে কাস্তে। সামনে বাড়ল রানা, প্রচণ্ড একটা লাথি মারল কাস্তের হাতলে। উদ্দেশ্য ছিল জিনিসটা হাত থেকে খসানো, কিন্তু ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত একটা দুর্ঘটনা। ঝট করে ওপর দিকে খাড়া হলো কাস্তের ফলা—ওখানে ছিল লোকটার গলা—ঘ্যাচ করে প্রায় তিন ইঞ্চি ঢুকে গেল ভেতরে। ঘড়-ঘড় করে আওয়াজ বেরুচ্ছে গলা দিয়ে, সেই সঙ্গে প্রচুর তাজা রক্ত মাত্র কয়েক সেকেন্ড ছটফট করে স্থির হয়ে গেল লোকটা। মায়া নয়, তার ওপর রাগ হচ্ছে রানার। নেহাত বোকা না হলে এভাবে কেউ নিজের মৃত্যু ডেকে আনে না।

কাস্তেটা গলায় গাঁথাই থাকল, লাশটা টেনে ঝোপের ভেতর লুকাল রানা। ভাবছে, দুর্ঘটনায় মারা না পড়লেও, শেষ পর্যন্ত লোকটাকে হয়তো খুন না করে ওর কোন উপায় থাকত না। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে খামারবাড়ির দিকে ছুটল ও।

চাষীবউ রানাকে দেখেই বুঝতে পারল, তার স্বামী বেঁচে নেই। তাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা নেই রানার, কাজেই সে চেষ্টা করল না। ব্যাপারটা যে স্রেফ দুর্ঘটনা, এটাও ব্যাখ্যা করার কোন

প্রয়োজন দেখল না–যাই বলা হোক, মহিলা তা বিশ্বাস করবে না। ইতিমধ্যে ওরা দুই বোন তার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধেছে। ছেলেটা পড়ে আছে ওদের পায়ের কাছে, হাত-পা বাঁধা।

হঠাৎ ফুঁপিয়ে উঠল চাষীবউ। রানা তার দিকে তাকাতে পারছে না।

'তোমার সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করছি আমরা,' বলল বন্দনা। 'তার আগে আমাদের সিদ্ধান্ত শোনো। একটাকে মেরে কোন লাভ নেই, কারণ যাকেই বাঁচিয়ে রাখবে সে-ই খবরটা পৌঁছে দেবে।'

'পাগল বিজ্ঞানীর কাছে এটা কোন খবরই নয় যে আমরা আসছি,' বলল রানা। 'এরা ফোন করলে ক্ষতি এইটুকুই হবে যে সে জানবে তার মিসাইল ঘাঁটির কতটা কাছাকাছি পৌঁছেছি আমরা।'

'আমরা ডক্টর কংসু চউ-এর কথা ভাবছি না,' বলল চন্দনা। 'ভাবছি আর্মি আর ইন্টেলিজেন্স-এর কথা। এরা স্রেফ মৌচাকে ঢিল মারবে, রানা।'

রানা যুক্তি দিল, 'আগেই বলেছি, চীনা আর্মি আর ইন্টেলিজেন্সকে আমি শত্রু হিসেবে দেখছি না, চন্দনা।'

'ওদের সঙ্গে তোমাদের এতই যদি পিরীত, এত ঝুঁকি নিয়ে আর কাঠখড় পুড়িয়ে এখানে আসার তাহলে কি দরকার ছিল?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল বন্দনা। 'ডিপ্লোম্যাটিক লেভেলে যোগাযোগ করে চীন সরকারকে বললেই তো পারতে যে ডক্টর চউ হামলা করতে যাচ্ছে, তাকে ঠেকানো হোক।'

'অভিযোগ করতে হলে হাতে প্রমাণ থাকতে হয়,' বলল রানা। 'আমার এই অ্যাসাইনমেন্ট আসলে সেই প্রমাণ সংগ্রহের। তারমানে অবশ্যই এই নয় যে চীনা আর্মি বা ইন্টেলিজেন্সের হাত ধরে পাগল বিজ্ঞানীর মিসাইল ঘাঁটিতে যাব আমরা। ওভাবে গেলে

ডক্টর কংসু চউ সমস্ত প্রমাণ নষ্ট করে ফেলবে, কিংবা আমাদের অভিযোগ অস্বীকার করবে। কিন্তু যদি পরিস্থিতি বাধ্য করে, চেষ্টা করব আর্মি বা ইন্টেলিজেন্সের সাহায্য নিয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করতে। কাজেই ওরা যদি খবর পায় তো পাক, ভয় পেয়ে দু'জন নিরীহ মানুষকে খুন করতে আমি রাজি নই।'

চন্দনা বলল, 'তোমার শত্রু নয়, কাজেই ওরা এলে ওদের সঙ্গে কোলাকুলি করবে তুমি। ওরাও হয়তো তোমাকে বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করবে। কিন্তু আমাদের তখন কি হবে? তোমার সঙ্গে আছি, কাভার নষ্ট হবার জন্যে এটুকুই যথেষ্ট। তাছাড়া, ভারতকে চীন তার এক নম্বর শত্রু মনে করে। আমাদেরকে ধরতে পারলে ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাবার এমন সুযোগ ছাড়বে ওরা?'

'তোমরা যদি আমার কথামত চলো,' অভয় দিয়ে বলল রানা, 'কথা দিচ্ছি, ওরা তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না।'

'তাহলে এটাই তোমার সিদ্ধান্ত, এদেরকে বাঁচিয়ে রাখবে?' জিজ্ঞেস করল বন্দনা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'তবে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখব সেটা নির্ভর করবে ওদের সততা ও আচরণের ওপর। এই পর্যায়ে আমিও চাই না আর্মি বা ইন্টেলিজেন্স জানুক আমরা কোথায় আছি।'

'তুমি যে ছেলেটার বাপকে খুন করে এলে, তার কি ব্যাখ্যা, মিস্টার রানা?' প্রায় ফুঁসে উঠল বন্দনা।

'আমি তোমাকে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য নই,' বলল রানা। 'শুধু এইটুকু বলি, সে খুন হয়নি, দুর্ঘটনায় মারা গেছে।'

হঠাৎ হেসে উঠল বন্দনা। 'তাহলে এখানেও দুর্ঘটনা ঘটতে অসুবিধে কি?'

তার হাতে ছুরি বেরিয়ে আসতে দেখে চমকে উঠল রানা। ও দরজার কাছে রয়েছে, জানে সময় মত নাগাল পাবে না, অথচ বন্দনা এরই মধ্যে ছেলেটার বুক লক্ষ্য করে ছুরি তুলেছে, ফলাটা

শুধু নামিয়ে আনা বাকি। 'বন্দনা, খবরদার!' রানার গলা থেকে বাঘের গর্জন বেরিয়ে এল, আক্ষরিক অর্থেই কেঁপে উঠল ঘরটা। 'ও মরলে তোমাকেও মরতে হবে!'

'দেখা যাক!' বন্দনার ঠোঁটে হিংস্র হাসি, চোখে খুনের নেশা। 'চন্দনা, মনে রাখিস, আমি তোর বোন!' বলেই ছুরিটা সবেগে নামাল সে।

ইতিমধ্যে রানার হাতে পিস্তল বেরিয়ে এসেছে। তবে ও গুলি করার আগেই পাশ থেকে বোনের হাত লক্ষ্য করে লাথি চালাল চন্দনা। ছুরিটা নরম টার্গেটে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল, ঠিক বিদ্ধ হওয়ার আগের মুহূর্তে লাথিটা বন্দনার মুঠোয় লাগল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, ছিটকে দেয়ালে গিয়ে লাগল ছুরি।

'তুই আমার আপন বোন হয়ে...' কথা শেষ করতে পারল না বন্দনা, ব্যথায় কুঁজো হয়ে পড়ল। 'জাঙ্কে তুই খুন হয়ে যাচ্ছিলি, আমি তোকে বাঁচালাম, আর তুই কিনা...'

'এ তারই প্রতিদান, বন্দনা,' থমথমে গলায় বলল চন্দনা। 'তুইও এখুনি খুন হয়ে যেতিস, আমি তোকে বাঁচিয়ে দিলাম।'

দুই বোন একযোগে রানার দিকে তাকাল। হাতের পিস্তলটা শুধু সামান্য একটু উঁচু করল রানা, এ-প্রসঙ্গে কোন কথাই বলল না। তবে মনে-মনে চন্দনার প্রশংসা না করে পারল না ও। মেয়েটা সত্যি বুদ্ধিমতী। কিশোর ছেলেটার গায়ে ছুরি গাঁথার আগে ওর হাতে অবশ্যই বন্দনা মারা যেত।

দু'জনকেই ইঙ্গিতে কাছে ডাকল রানা, সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল কিভাবে চাষীবউকে ইন্টারোগেট করতে হবে। তারপর ছেলেটাকে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল।

শার্টের সামনের অংশ ধরে ছেলেটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল রানা, গলার স্বরে সন্দেহের কোন অবকাশ রাখল না। 'ঘরে তোমার মা-ও একই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে। তোমার জবাব তার সঙ্গে না মিললে, দু'মিনিটের মধ্যে মারা যাবে দু'জনেই। বুঝতে

পারছ কি বলছি?'

মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা। ঘৃণা ও জেদের বদলে তার চেহারায় এখন শুধুই ভয়।

'মনে রেখো, শুধু সত্যি কথা তোমাদেরকে বাঁচাতে পারে,' ধমকের সুরে বলল রানা। 'গ্রাম থেকে তোমাদের বাড়িতে কারা আসে?'

'হাট থেকে এক লোক আসে,' জবাব দিল ছেলেটা।

'আবার কবে আসবে সে?'

'শুয়োর কিনতে আসবে, আরও তিনদিন পর।'

'তার আগে আর কে আসবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'স্কুল থেকে তোমার বন্ধুরা?'

'না, ওরা আসে শনিবারে—সত্যি বলছি।'

'তোমাদের আত্মীয়স্বজনরা?'

'তারা এলে শুধু রবিবারে আসে।'

ছেলেটাকে নিচে নামিয়ে হাঁটিয়ে ঘরে নিয়ে এল রানা। বন্দনা ও চন্দনা ওর জন্যে অপেক্ষা করছে।

'মহিলা বলছে, একজন মাত্র লোক আসার কথা,' বলল চন্দনা। 'গ্রামের হাট থেকে।'

'কবে?'

'তিন দিন পর। আর স্কুল থেকে কয়েকটা ছেলে আসবে শনিবারে। রবিবারে আসে কিছু আত্মীয়। হ্যাঁ, বাড়ির নিচে একটা চোরা-কুঠরি আছে।'

দু'জনের জবাব মিলে যাচ্ছে। এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর সিদ্ধান্ত দিল। 'ঠিক আছে। ঝুঁকিটা আমরা নেব। দু'জনের মুখেই ভাল করে কাপড় গোঁজো, তারপর হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখো চোরা-কুঠরিতে। আশা করি তিনদিনের মধ্যে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আর একহপ্তা না খেয়ে থাকলে ওরা মরবে না। চোরা-কুঠরির দরজাটা খোলা রেখে যাব আমরা।'

ছয়

নিঃসঙ্গ খামারবাড়ি, গ্রাম ও পোস্ট অফিসকে একপাশে রেখে অবশেষে কুৎসিত ও কর্কশ একটা জগতে প্রবেশ করল ওরা। এখানে আক্ষরিক অর্থেই মাটি নেই, তার জায়গায় দাঁত বের করে আছে কালো পাথর, আদিগন্ত যতদূর দৃষ্টি যায়। পাহাড়গুলো দূরে দূরে, কোনটাই তেমন উঁচু নয়, টপকে বা পাশ কাটিয়ে এগোতে অতিরিক্ত কোন অসুবিধে হলো না। সূর্য ডোবার পরও না থামার সিদ্ধান্ত নিল ওরা। কারণ একটা আশঙ্কা তিনজনকেই কুরে কুরে খাচ্ছে। ডক্টর

হংকং থেকে রওনা হবার মূল প্ল্যানের বৈশিষ্ট্য ছিল, খুব কম সময়ের মধ্যে ক্যান্টন-কাউলুন রেলপথে পৌঁছানো। বিকল্প প্ল্যান ধরে আসায়, একদিন আগে রওনা হওয়া সত্ত্বেও, ওখানে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয়ে যাবে ওদের। এই পাথরের রাজ্য শেষ হলেই শুরু হবে ফুচাং শহর। দু'পাশে দুটো লেক থাকায় শহরটাকে এড়িয়ে যাবার কোন সুযোগ নেই, ভেতর দিয়েই পথ করে নিতে হবে। তারমানে সময়ের চেয়ে কতটা পিছিয়ে পড়বে ওরা, এ-ব্যাপারে পরিষ্কার কোন ধারণাও পাওয়া যাচ্ছে না। এই অবস্থায় মনে চিন্তা জাগা স্বাভাবিক, পাগল বিজ্ঞানী নার্ভাস হয়ে পড়লে কি ঘটবে?

ডক্টর চউ যতই মেসেজ দিক–রানার জন্যে অপেক্ষা করছে, মিসাইল নিক্ষেপ চাক্ষুষ করাবে–তার স্পেশাল সিকিউরিটি

যেভাবে একের পর এক মার খাচ্ছে, তাতে সে যদি হামলা শুরু করার টাইম শেডিউল এগিয়ে আনে? হয়তো এরইমধ্যে সাতটা দেশকে ফ্যাক্স করে জানিয়ে দিয়েছে সে, প্রতিটি দেশের জন্যে চাঁদা ধরা হয়েছে একশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার, চব্বিশ বা আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে গোপন কোনও অ্যাকাউন্টে যে যার চাঁদা জমা করো, তা না হলে রাজধানীতে বোমা পড়বে।

জানা কথা, এ-ধরনের হুমকির কাছে কোন দেশই নতি স্বীকার করতে চাইবে না। ব্যাপারটা সত্যি কিনা বিশ্বাস করতেই তো কষ্ট হবে। খোদ চীন সরকার এরকম একটা অযৌক্তিক, অবাস্তব ও অসম্ভব কিছু দাবি করতে পারে না, এটা সবাই বুঝবে। ডক্টর কংসু চউ? চীনের অ্যাটম বোমা স্পেশালিস্ট ও মিসাইল এক্সপার্ট? ব্যাটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গেছে! সবগুলো রাষ্ট্র একযোগে প্রতিবাদ জানাবে, চীন সরকারকে বলবে—পাগলা কুত্তা সামলাও বাপু, কখন কাকে কামড়ে দেয়! উত্তরে চীন সরকার দুঃখপ্রকাশ করে বলবে, ব্যাপারটা তারা তদন্ত করে দেখছে।

কিন্তু সে সময় চীন সরকার পাবে না। সাতশো বিলিয়ন মার্কিন ডলার রোজগার করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে আরও খেপে যাবে চৌধুরী, কে জানে, হয়তো সাতটা বোতামেই চাপ দিয়ে বসবে। টুইন টাওয়ারে আত্মঘাতী বিমান হামলার পর দুনিয়ার চেহারা নাকি বদলে গেছে, ওই সাতটা বোতামে চাপ দিলে কপালপোড়া ধরণীর চেহারা আরেকবার বদলাবে।

কে জানে, আর হয়তো বারো ঘণ্টা পরই ঘটনাটা ঘটবে।

রাত দশটায় একটা পাহাড়ের কাঁধে আহার ও বিশ্রামের জন্যে থামার নির্দেশ দিল রানা। পিঠে নতুন কিছু বোঝা থাকায় তিনজনই ওরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

হাজার হোক বাঙালী তো, ভাতের লোভ ছাড়ে কিভাবে, অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ওরা দুই বোন খামারবাড়ি থেকে কেজিখানেক চালও নিয়ে এসেছে। দশমিনিট বিশ্রাম নিয়ে শুকনো

ঝোপ কেটে এনে একজোড়া বোল্ডারের মাঝখানে চুলো বানাল, ভাঁজ করা কম্বল থেকে বের করল অ্যালুমিনিয়ামের ছোট একটা পাতিল, বোতলের পানি দিয়ে চাল ধুয়ে চড়িয়ে দিল ভাত। চালের সঙ্গে পাতিলে ফেলা হলো কয়েকটা গোল আলু আর মটরশুঁটি। প্লেট নেই, তার বদলে পলিথিন ব্যবহার করল ওরা। ভাত বেড়ে ওই পাতিলেই লবণ, পিঁয়াজ আর মরিচ দিয়ে হাঁসের ডিম ভাজা হলো।

রানার সঙ্গে ওদের দ্বন্দ্ব থাকলেও, পুরুষ মানুষের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখার ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসরণ করে দুই বোনই ওরা বিশেষ যত্ন নিল ওর। তাতে স্বার্থবুদ্ধির কোন ভূমিকা নেই, বরং আন্তরিকতারই প্রকাশ ঘটল, লক্ষ করে কৃতজ্ঞ বোধ করল রানা। কিছু ব্যাপার এত সূক্ষ্ম, বিশেষভাবে খেয়াল না করলে ধরা যায় না। দুটো মাত্র কম্বল নিয়ে এসেছে ওরা, তার মধ্যে একটা একটু ছেঁড়া। কোন কারণ না দেখিয়ে রানার কাছ থেকে সেটা চেয়ে নিল বন্দনা, বদলে ভাল কম্বলটা বিছিয়ে বসতে দিল ওকে। ভাজা ডিম ভাগ করার সময় খেয়াল রাখল রানার পাতে যাতে পোড়া অংশটুকু না পড়ে। ওরা দু'জন কফি খাবে না, অথচ না চাইতেই বানিয়ে দিল রানাকে।

পাথরের রাজ্যে পানি নেই, তাই মশাও নেই। কম্বলের ওপর শুয়ে চোখ বোজার আগে রানা বলল, 'ঠিক একটায় রওনা হব আবার। তারমানে দু'ঘণ্টার বেশি ঘুমানো যাবে না।'

'এই চন্দনা! তোদের ঘুম ভাঙাবে কে, শুনি?' চাপা হাসির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল বন্দনা, তারপর নিজেই জবাব দিল, 'এখানে আর আছেই বা কে, তোরা বোধহয় আমাকেই জেগে থাকতে বলছিস?'

রানা কিছু বলতে গিয়েও বলল না, কারণ দুই বোন চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে খুনসুটি শুরু করল। কান পাতলে হয়তো শুনতে পেত, কিন্তু রুচিতে বাধল—তাছাড়া, ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ

দুটো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বলতে পারবে না, খসখস শব্দে সজাগ হলো রানা। একচুল নড়েনি, শুধু চোখ জোড়া সামান্য খুলে গেছে। দুটো কম্বলের মাঝখানে ব্যবধান মাত্র পাঁচ হাত, দু'বোনের একজন এরই মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে এসেছে। দিগন্তে নেমে আসা চাঁদের গায়ে নারীমূর্তিটাকে বিশাল দেখাচ্ছে, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, একরাশ চুল বাতাসে উড়ছে মুখের দু'পাশে। নিষ্প্রাণ কাঠ হয়ে পড়ে থাকল রানা, তবে গলা শুকিয়ে আসায় ঢোক গিলতে হলো, ভয় পাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ধক্-ধক্ আওয়াজটা না বাইরে থেকেও শোনা যায়।

খুব ধীরে-ধীরে, সাবধানে এল মেয়েটা। সে কে, রানার কোন ধারণা নেই, এই মুহূর্তে চোখ খোলা থাকলেও চিনতে পারত না। ব্যাপারটা কি ঘটছে? নিজেকে প্রশ্ন করল ও। না, এর মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। নেই এমনকি এতটুকু নোংরামিও। সে চন্দনা হোক বা বন্দনা, ওর কাছে তার এই আসা স্বাভাবিক জৈবিক তাড়নারই প্রকাশ–মধুর আহ্বান, সেই সঙ্গে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণও।

রানাকে ছুঁলো মেয়েটা। গালে গাল ঘষল। উত্তেজনা ও আবেগের রাশ টেনে রেখেছে সে, দ্বিধাগ্রস্ত, লজ্জা ভুলে দুঃসাহসী হয়ে উঠলেও আড়ষ্ট ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। শরীরে হাত বুলাচ্ছে, পাশে শুয়ে নড়াচড়া করছে, ভাবছে রানার ঘুম ভাঙার জন্যে এর বেশি কিছু করা কোন মেয়ের পক্ষে সম্ভব নয়।

মড়ার মত পড়ে থাকল রানা। নিজেকে প্রশ্ন করল, কেন সাড়া দিচ্ছি না? উত্তরটা সহজ–প্রথম কথা, ভেতর থেকে সাড়া পাচ্ছে না। তাছাড়া, তিনজনের সম্পর্কের মধ্যে একটা ভারসাম্য রয়েছে, একজনের ডাকে সাড়া দিলে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে। তৃতীয় কারণ–রানার সন্দেহ, দ্বিতীয় মেয়েটা যেই হোক, সে-ও জেগে আছে।

তবে ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে কোন লাভ হলো না। এ-সব ছল ধরে ফেলতে মেয়েদের কোন অসুবিধে হয় না। ফিরে যাবার সময় ওর কানে ফিসফিস করল সে, 'এই আমার প্রথম পরাজয়। তুমি মুনি-ঋষি হলে অপমানটা হয়তো ক্ষমা করতে পারতাম।'

গলার আওয়াজ চিনতে পারল রানা। বন্দনা। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। তারপর শুনতে না চাইলেও দুই বোনের চাপা কথোপকথন শুনতে হলো ওকে।

'ছি, মুখপুড়ী, ছি!' চন্দনার গলা। 'তুই এত নিচে নামতে পারলি! লজ্জায় আমার...'

বন্দনার গলায় হাসি।

'আবার হাসছিস! তোর কি লজ্জা বলে কিছু নেই?'

'এ আমার দুঃখের হাসি রে, বড় তেতো। তোর প্রতি সাংঘাতিক ঈর্ষা হচ্ছে আমার। কেন শুনবি?'

'থাক, আর ঢং করতে হবে না...'

'না, শোন। তুই যা পারিস, আমি তা পারি না। আমি কাউকে ভালবাসলে তাকে আমার পেতে হবে। কিন্তু তুই পাবি না জেনেও ভালবাসতে পারিস। এখানেই তোর সঙ্গে আমার পার্থক্য। যে-কথা বলছিলাম। ওকে তুই ভালবেসেছিস কিনা জানি না, তবে বাসলে ভুল করবি না।'

'বন্দনা!' চন্দনার গলায় চাপা রাগ।

'অস্বীকার করে লাভ নেই, ভাই, আমরা দু'জনেই চাই ওকে,' ম্লান গলায় বলল বন্দনা। 'তুই ভক্ত হয়ে চাস, আমি চাই প্রতিপক্ষ হয়ে। হিংসে হচ্ছে এই কারণে যে মানুষটা শুধু ভক্তের ডাকেই সাড়া দেবে, পায়ে ঠেলবে প্রতিপক্ষকে। অথচ নির্মম প্রহসন কি জানিস, আমি কোনদিনও ওর ভক্ত হতে পারব না। এটাই আমার নিয়তি।'

'ঘুমটা তো নষ্ট করেছিসই, এখন আবার লেকচার মেরে

অত্যাচার করছিস। অথচ আসল প্রসঙ্গে একটা শব্দও করছিস না।'

'আসল প্রসঙ্গ আবার কি?'

'আমাকে তুই বিশ্বাস করতে বলিস যে খালি হাতে ফিরেছিস?' ফিসফিসে গলায় জিজ্ঞেস করল চন্দনা। 'দেব-দেবীদের কিরে, মিথ্যেকথা বলবি না–রানা তোকে কি বলল রে?'

'বলব না। বললে তুই বিশ্বাস করবি না।'

'বিশ্বাস করার মত হলে কেন বিশ্বাস করব না। বল না, ভাই!' চন্দনার গলায় মিনতি।

'তাহলে শোন। একবর্ণও মিথ্যে বলছি না। রানা বলল, তুমি কেন এসেছ? সে কেন এলো না? আমি তো তার জন্যে জেগে আছি। যাও, তাকে পাঠিয়ে দাও!'

দুম করে আওয়াজ হলো, সম্ভবত বন্দনার পিঠে কিল পড়ছে। হঠাৎ সময় সম্পর্কে সজাগ হলো রানা, ফ্লুয়োরেসেন্ট ডায়ালে চোখ রেখে দেখলো একটা বাজতে আর মাত্র দশ মিনিট বাকি।

কম্বলের ওপর উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙল ও, মুখে হাতচাপা দিয়ে হাই তুলল মিছিমিছি, তারপর বলল, 'এই, কত ঘুমাও তোমরা! ওঠো, ওঠো–রওনা হবার সময় হয়েছে।'

সারারাত বিরতিহীন হেঁটে ভোরের দিকে ফুচাং শহরের কিনারায় পৌঁছাল ওরা। দুই লেকের মাঝখানে পাঁচ মাইল দৈর্ঘ্য নিয়ে বড় শহর ফুচাং, সূর্য ওঠার আগেই ঘড়-বাড়ি থেকে প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল মানুষের ঢল। ওরা যে পাহাড়ের ঢাল থেকে শহরটা দেখছে সেটার নিচে বিশাল এক প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির দেখা গেল, ভক্তরা ফুল ও সুগন্ধী নিয়ে ভেতরে ঢুকছে, তাদের মধ্যে গেরুয়া পরা কিছু বিদেশীকেও দেখা গেল, বেশিরভাগই ইউরোপিয়ান। ট্যুরিস্টের পাঁচমিশালী একটা দল দেখা গেল–মায়ানমার, নেপাল, কোরিয়া, থাইল্যান্ড আর ভুটানের লোক তারা। খামারবাড়ি থেকে

চীনাদের কিছু কাপড়চোপড় নিয়ে এসেছে ওরা, দ্রুত সেগুলো পরে নিল, তারপর ঢাল থেকে নেমে ভিড়ে গেল ট্যুরিস্ট দলের সঙ্গে।

সূর্য ওঠার পর শহরে ঢুকল ওরা। পাবলিক ট্র্যান্সপোর্ট বলতে কিছুই চোখে পড়ল না—না বাস, না ট্যাক্সি। কিছু রিকশা দেখা গেল, একটাও খালি নয়। প্রতিটি রাস্তা দখল করে রেখেছে হাজার হাজার সাইকেল। যার সাইকেল নেই সে হাঁটছে। ফুটপাথ জনসমুদ্র বললেই হয়।

শহরের মাঝামাঝি আসতে তিন ঘণ্টা লাগল। এখানে পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য দেখার সুযোগ হলো ওদের। একটা নয়, সারি সারি অনেকগুলো রক্ত-মাংসের পাহাড়। প্রতিটি পাহাড় অসংখ্য মানুষের সমষ্টি। প্রতিটি পাহাড় সচলও বটে। বেশ কিছুক্ষণ ভাল করে দেখার পর ওগুলোকে বাস বলে অনুমান করা গেল।

পেটে কিছু দেয়ার জন্যে রাস্তার পাশের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকল ওরা। টেবিলে বসে শিম ও আলুর ভাজি দিয়ে গরম ভাত খাচ্ছে লোকজন। কেউ ভাতের সঙ্গে রান্না করা ব্যাঙ ও সাপও খাচ্ছে। পাউরুটি, ডিম আর চা নিরাপদ মনে হলো রানার। ওরা দু'জন অবশ্য ভাতই খেলো, ভাত না হলে ওদের চলবে না।

দুপুরের বেশ খানিক আগেই শহর পিছনে ফেলে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা, দুপুর পর্যন্ত একটানা হেঁটে আরেকটা পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছতে চায়। বেলা তখন প্রায় দেড়টা, হঠাৎ সামনে পড়ল চওড়া একটা মেটো পথ। ঝপ্ করে একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে পড়ল রানা, তা না হলে ধরা পড়ে যেত।

রানার সঙ্কেত পেয়ে সাবধানে হেঁটে এল দুই বোন, নিঃশব্দে ওর দু'পাশে শুলো। ওদের সামনে বেশ বড় একটা টিনশেড, শেডের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দশটা ট্রাকের একটা বহর, রেগুলার চাইনিজ আর্মির একটা কনভয়। শেডের মাথায় চিমনি দেখা যাচ্ছে। সৈন্যরা ভেতরে ঢুকে বড় আকৃতির ট্রে বের করে ট্রাকে

তুলছে, প্রতিটি ট্রেতে দশটা করে পাউরুটি। শেডটা আসলে রুটি তৈরির কারখানা, এখান থেকে সম্ভবত শুধু সেনা ছাউনিতেই পাউরুটি সাপ্লাই দেয়া হয়।

প্রতি ট্রাকে মাত্র দু'জন করে সৈনিক, ড্রাইভার আর হেলপার। ট্রাকগুলো হয় লোকজন নিয়ে এসেছে, কিংবা আনতে যাচ্ছে। পাউরুটি তোলা হচ্ছে মাত্র একটা ট্রাকে। কনভয়ের প্রথম ট্রাক এরইমধ্যে স্টার্ট নিয়ে চলতে শুরু করেছে।

'আমরা শেষ ট্রাকে উঠব,' ফিসফিস করল রানা। 'ওটা যখন রওনা হবে, সামনেরগুলো ততক্ষণে বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে যাবে।' হাত তুলে বাঁকটা দেখাল ওদেরকে। 'কাজটায় ঝুঁকি আছে, তবে সময় মত পৌঁছাতে হলে এ-সুযোগ হাতছাড়া করা চলে না।'

দুই বোনের চোখ উত্তেজনায় চকচক করছে, রানা থামতে একসঙ্গে মাথা ঝাঁকাল ওরা।

এঞ্জিনগুলোর গর্জনে বাতাস ভারী হয়ে উঠল। শেষ ট্রাকের ড্রাইভার ও হেলপার শেড থেকে বেরিয়ে এল, হাতে একটা করে পাউরুটি। তীর বেগে বেরিয়ে এসে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজন। কি ঘটছে বোঝার সুযোগ পেল না, জ্ঞান হারাল সৈনিক দু'জন। ধরাধরি করে ট্রাকের পিছনে তোলা হলো তাদেরকে। চন্দনা রানার সঙ্গে ক্যাবে উঠল, পিছনে সৈনিকদের নিয়ে ব্যস্ত বন্দনা—মুখে কাপড় গুঁজে হাত-পা বাঁধছে। স্টার্ট দিয়ে ট্রাক ছাড়ল রানা। শেডে কোন জানালা নেই, দরজাটা খোলা থাকলেও ভেতর থেকে কেউ বেরুচ্ছে না। এক লাইনে রওনা হয়ে গেল কনভয়। ক্যাবের পিছনে ছোট্ট জানালা আছে, রানা ও চন্দনাকে একটা করে পাউরুটি দিল বন্দনা।

'কনভয়ের সঙ্গে কতক্ষণ থাকব আমরা?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা, শুকনো পাউরুটিই চিবাচ্ছে।

'আমরা যেদিকে যাব সেদিকেই যদি চলতে থাকে, নামব

কেন,' বলল রানা।

'আমার সত্যিই খুব মজা লাগছে,' হেসে উঠে বলল চন্দনা। 'যেন বাঘের লেজ ধরে আছি।'

সায় দিয়ে রানাও হাসল; ও এই ভেবে খুশি যে নির্জন পাহাড়ী পথ ধরে ফুলস্পীডে ওদের গন্তব্যস্থান অর্থাৎ পুব দিকেই ছুটছে বাঘটা। এক সময় রোদের তেজ কমে এল, আকারে বদলে লম্বা হলো ছায়াগুলো, এই সময় রাস্তার ধারে একটা রোডসাইন দেখতে পেল রানা, তাতে লেখা–টিয়াংটানওয়ে। এলাকাটা ম্যাপে দেখা আছে রানার, বুঝতে পারল এখান থেকে ক্যান্টন-কাউলুন রেলপথ আর মাত্র কয়েক মাইল দূরে। সামনের তেমাথায় পৌঁছে হঠাৎ বাঁক নিল কনভয়, দিক বদলে পুবে রওনা হলো।

'বাঘের লেজ এবার ছাড়তে হয়,' চন্দনাকে বলল রানা। 'তবে রাস্তার ওপর ট্রাক রেখে পালালে আমাদের খোঁজে গোটা এলাকা চষে ফেলবে ওরা।'

'তোমার মতলবটা কি, মিস্টার রানা?' ক্যাবের পিছনের জানালায় মুখ ঢুকিয়ে জিজ্ঞেস করল বন্দনা। 'ট্রাকটাকে পকেটে করে নিয়ে যেতে চাও?'

কনভয়ের প্রথম ট্রাকটাকে ছাড়িয়ে আরও সামনে চলে গেল রানার দৃষ্টি। সরু ও খাড়া একটা পথ ধরে ওপরে উঠছে ওরা। পথটা সমতল হয়েছে পাহাড়ের চওড়া কার্নিসে, কার্নিসের এক পাশে খাদ, খাদের নিচে সরু লেক। 'ওই লেকে ফেলতে হবে ট্রাকটা,' বলল রানা। 'তার আগে একটা ঝোপের ভেতর লোক দু'জনকে লুকাতে হবে। তুমি পিছনে চলে যাও, চন্দনা। ঘন ঝোপ দেখতে পেলে ট্রাক থামাব আমি। দু'জন মিলে ওদেরকে নিচে ফেলে দেবে, তারপর টেনে ঝোপের ভেতর ঢোকাবে। ইতিমধ্যে ট্রাক ছেড়ে দেব আমি, তোমরা ছুটে এসে চড়বে আবার। ঠিক আছে?'

চন্দনা মাথা ঝাঁকালেও, পিছন থেকে বন্দনা বলল, 'দুঃখিত,

মিস্টার রানা। ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। কি করে বুঝব যে তুমি আমাদেরকে ফেলে ট্রাক নিয়ে পালাবে না?'

তিক্ত হাসল রানা। শান্ত গলায় বলল, 'তাহলে তোমরা কেউ হুইল ধরো, আমি পিছনে যাচ্ছি।'

'চন্দনা,' পিছন থেকে বলল বন্দনা, 'ড্রাইভিং সীটে বস তুই।'

'তুমি কিছু মনে কোরো না, রানা,' সীট বদল করার সময় নিচু গলায় বলল চন্দনা। 'ও ছোটবেলা থেকেই ঝগড়াটে, মানুষকে শুধু শুধু খুঁচিয়ে মজা পায়।'

রানা কিছু বলল না, চন্দনাকে ড্রাইভিং সীট ছেড়ে দিয়ে উল্টোদিকের দরজা খুলল, বন্দনার বাড়ানো হাতটা ধরে চলে এল ট্রাকের পিছনে।

'রাগ করলে নাকি?' হাসছে বন্দনা। 'আসলে তোমার সঙ্গ পাবার লোভে একটু কৌশল করলাম।'

কথা না বলে ড্রাইভার ও হেলপারের বাঁধন পরীক্ষা করল রানা।

'কাল রাতের ঘটনাটাও একটু ব্যাখ্যা করা দরকার,' আবার বলল বন্দনা। 'ওটা ছিল আমার মুহূর্তের দুর্বলতা...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'কিছুই ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, বন্দনা। তবে আমার তরফ থেকে এইটুকুই বলার আছে: যদি পারো ক্ষমা করে দিয়ো।'

'এই ক্ষমা তুমি আগে চাইলে খুশি হতাম,' তিক্ত হেসে বলল বন্দনা। 'কিন্তু তা তুমি চাওনি।'

রানা তাকিয়ে থাকল, যেন বন্দনা আর কি বলে শোনার অপেক্ষায় আছে।

'ভাবছ কামজর্জর বন্দনার প্রতি নয়, অপরাধ করেছ কোমল ও পবিত্র নারীসত্তার প্রতি,' ম্লান সুরে বলল বন্দনা, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'খুশি হতাম দুটোকে যদি এক করে দেখতে পারতে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওর ঠোঁটে একটা আঙুল ঠেকাল বন্দনা। 'কিছু বোলো না, প্লীজ। প্রবোধ বা সান্ত্বনার কোন প্রয়োজন নেই আমার। কারণ এ-ও বুঝি যে এ একদিক থেকে খুব ভাল হয়েছে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে আরেকজনের কাছে তুমি সাক্ষাৎ দেবতা হয়ে উঠেছ...'

হঠাৎ ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনেই ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, ট্রাকের পিছন থেকে অজ্ঞান লোক দু'জনকে টেনে রাস্তায় ফেলল। আবার সচল হলো ট্রাক, তবে গতি খুব মন্থর। ধরাধরি করে লোক দু'জনকে ঝোপের ভেতর টেনে আনল ওরা। শেষ একবার ওদের বাঁধন পরীক্ষা করে ট্রাক ধরার জন্যে ছুটল রানা, বন্দনা আগেই রওনা হয়েছে।

সরাসরি ক্যাবে উঠল রানা, এবার ওর সঙ্গে বন্দনাও। আবার সীট বদল করতে হলো–রানা বসল ড্রাইভিং সীটে, ওর এক পাশে দুই বোন।

ইতিমধ্যে চওড়া কার্নিসে উঠে এসেছে কনভয়। ওদের ট্রাক প্রায় ত্রিশ গজ পিছিয়ে পড়েছে। 'স্পীড কমাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমি গো বললেই লাফ দিয়ে নেমে পড়বে তোমরা। নামার পর কার্নিসে বা পথে থাকবে না, ঝোপের ভেতর লুকাবে–ঢালের খানিকটা নিচে নেমে। ঠিক আছে?'

'হ্যাঁ।'

ত্রিশ সেকেন্ড পর নির্দেশ দিল রানা, 'গো!'

ওরা দুজন লাফ দিয়ে নেমে যেতেই বন বন করে ডানদিকে হুইল ঘোরাল রানা; তারপর যখন অনুভব করল সামনের চাকাগুলো রাস্তার কিনারা টপকাচ্ছে, অমনি কাত হয়ে ঢলে পড়ার ভঙ্গিতে ক্যাব থেকে নিজেও নেমে এল। ট্রাকের আঘাতে লেকের পানি বিস্ফোরিত হলো, শব্দটা পাহাড় প্রাচীরে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে। প্রায় একযোগে ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে পড়ল গোটা কনভয়।

তবে এরই মধ্যে একটা শুকনো নালা ধরে ছুটতে শুরু করেছে ওরা তিনজন। দেড় মাইল দৌড়ে এসে একটা ছোট পাহাড়ের নিচে বিশ্রাম নেয়ার জন্যে থামল রানা। 'হিসেবে যদি ভুল না করি, এই পাহাড়টা পেরিয়ে কিছুদূর গেলেই রেললাইনটা পেয়ে যাব,' বলল ও। 'মেইন ফ্রেইট ট্রেন দিনে দু'বার চলাচল করে, সকাল ও সন্ধ্যায়। বিসিআই-এর ক্যালকুলেশন যদি ঠিক হয়, পাগল বিজ্ঞানীর লোকেরা এই এলাকারই কোথাও থেকে সাপ্লাই সংগ্রহ করে। এখন আমাদের কাজ লাইনের ধারে অপেক্ষা করা।'

রানা থামতেই প্রতিবাদের সুরে বন্দনা বলল, 'কারেকশন, প্লীজ!'

'ইয়েস?'

'আমার আপত্তি, মিস্টার রানা, ডক্টর কংসু চউকে পাগল বলাতে। একজন ক্রিমিনালকে পাগল বললে তার অপরাধকে হালকা করে দেখা হয়। সে বাঙালী হওয়ায় তার প্রতি তোমার দুর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু যে-লোক আমার দেশে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলতে চাইছে, আমি তাকে শয়তান ছাড়া আর কিছু ভাবতে রাজি নই।'

'আমি তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি, সে সত্যিই বদ্ধ উন্মাদ,' বলল রানা। 'তুমি তাকে যা খুশি তাই বলতে পারো, আমি আপত্তি করব না। তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সে বাঙালী, এ-কথা তুমি জানলে কিভাবে? ডক্টর কংসু চউ-এর আসল পরিচয় আমরা তো আইসিআইকে জানাইনি।'

'আরে, তাই তো!' চন্দনাও বিস্মিত। 'বন্দনা, এই তথ্য কোথায় পেলি তুই?'

বন্দনা হাসল। 'যোগ্য একজন এসপিওনাজ এজেন্ট গোপন তথ্যের জন্যে সব সময় অফিসের ওপর নির্ভর করে না। তার নিজস্ব সোর্সও থাকতে হয়। তুমি যাকে পাগল বিজ্ঞানী বলছ তার আসল নামটাও আমি জানি, মিস্টার রানা। ওই কবীর চৌধুরীর

সঙ্গে আমার একবার দেখাও হয়েছিল। কোথায় দেখা হয়েছিল জিজ্ঞেস কোরো না, কারণ শুনতে তোমার ভাল লাগবে না।'

'তুমি গোপন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বাংলাদেশে ঢুকেছিলে, তখন কবীর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আভাসে এ-কথাই বলতে চাইছ, তাই না?' রানা হাসল।

রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বন্দনা বলল, 'আর, চন্দনা, তোকেও বলি–চিরকালই তুই আমাকে আন্ডারএস্টিমেট করেছিস। দু'চার মিনিটের হলেও, আমি তোর বড়, এই কথাটা কখনও ভুলবি না।'

চন্দনা বিহ্বল। 'এ-সব কি বলছিস তুই! আমি আবার কবে তোকে আন্ডারএস্টিমেট করলাম!'

'বাদ দে, কি বলেছি ভুলে যা,' শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াল বন্দনা, আরেক দিকে তাকাল। 'তবে একটা কথা। মারিয়া পুজো গডফাদার-এর ডন ভিটো কর্লিয়নিকে দিয়ে কি বলিয়েছে, তোর মনে পড়ে? বড় ছেলেকে ধমক দিয়ে সে বলেছিল, নিজেদের দুর্বলতা বা মতপার্থক্যের কথা বাইরের কারও সামনে প্রকাশ করা উচিত নয়। আমারও সেই কথা। মাসুদ রানা কে? একজন আউটসাইডার। ওর সামনে প্রশ্নটা তুই না করলেও পারতিস। তোর বরং এমন ভাব করা উচিত ছিল, যেন আমার মত তুইও জানিস ডক্টর চউ বাঙালী, আর তার নাম কবীর চৌধুরী।'

কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে চুপ করে থাকল চন্দনা।

'ভবিষ্যতে এরকম ঘটনা, এরচেয়ে হতবুদ্ধিকর ঘটনাও অনেক ঘটতে পারে,' আবার বলল বন্দনা, আড়চোখে লক্ষ করছে রানাকে। 'তখন কিন্তু তোকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে আমি তোর বোন–একই মায়ের সন্তান।'

পরিষ্কার উপলব্ধি করল রানা, বন্দনার শেষ কথাটার মধ্যে বিশেষ একটা তাৎপর্য আছে। মনের পুরানো সন্দেহটা আরও

জোরাল হয়ে উঠল। দুই বোনই আইসিআই-এর এজেন্ট, অথচ তাদের মধ্যে একজন কেন বিশেষ ভাবে ওকে শত্রু বলে গণ্য করছে?

হতবুদ্ধিকর অর্থাৎ চমকপ্রদ কোন ঘটনা ভবিষ্যতে ঘটতে পারে, সেজন্যে বোনকে আগেভাগে সাবধান করে রাখল বন্দনা; কি হতে পারে সেটা?

নিঃশব্দে পাহাড়ে উঠছে ওরা। চূড়ার কাছাকাছি এসে রানা নির্দেশ দিল ক্রল করে এগোতে। চূড়ার সমতল মাঝখানটা পার হয়ে এলো ওরা, তারপর কিনারা দিয়ে নিচে তাকাতেই চাঁদের আলোয় চকচক করতে দেখল দীর্ঘ একজোড়া লাইন।

ঢাল বেয়ে নেমে এসে ছোট-বড় বোল্ডারের আড়ালে ঢুকল ওরা। জায়গাটা রেললাইনের সঙ্গে প্রায় একই লেভেলে, কাভার ও অজারভেশন পোস্ট হিসেবে আদর্শ।

'আশপাশে মানুষজন আছে বলে তো মনে হচ্ছে না,' বলল বন্দনা। 'মিসাইল ঘাঁটিটাও এখান থেকে বেশ অনেকটা দূরে। তাহলে এখানে কেন অপেক্ষা করছি আমরা?'

'ব্যাপারটা একবার ব্যাখ্যা করা হয়েছে,' বলল রানা।

'সে ব্যাখ্যা কতটা গ্রহণযোগ্য, সেটাই হলো প্রশ্ন। এতবড় একটা ঘাঁটি, প্রচুর সাপ্লাই দরকার, ডক্টর কংসু চউ চাইলেই তো লাইনটা ঘাঁটি ছুঁয়ে যেতে পারত। তা সে চায়নি কেন? কিংবা, এখানে একটা স্টেশন থাকলেও তো চলত। তাই বা নেই কেন?'

রানা জবাব দিল, 'কবীর চৌধুরী বলতে গেলে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যে ঘাঁটিটাকে ব্যবহার করছে। নিজের লোকজন ছাড়া ঘাঁটির আশপাশে অন্য কারও উপস্থিতি সহ্য করতে রাজি না। স্টেশন থাকলে লোকজন আসা-যাওয়া করবেই। আমরা এ খবরও পেয়েছি যে কাছাকাছি রেগুলার আর্মির একটা ব্যাটালিয়ন থাকলেও, না ডাকলে ঘাঁটিতে ঢোকার অনুমতি নেই তাদের।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, দেখি ট্রেন সত্যি এখানে থামে কিনা,' বলল বন্দনা। 'তার আগে আরেকটা প্রসঙ্গ। মিস্টার রানা, ঘাঁটিতে পৌঁছে মিসাইলগুলো আমরা কিভাবে ধ্বংস করব?'

'চন্দনা তোমাকে বলেনি?'

'তুমি ওকে যা বলেছ, ও আমার কাছে সেটাই রিপিট করেছে,' বলল বন্দনা। 'ওর মনে এ সংশয় জাগেনি যে তুমি ওকে সত্যি কথাটা না-ও বলে থাকতে পারো।'

'কেন আমি মিথ্যে কথা বলতে যাব?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কবীর চৌধুরী টরচার করলেও আমরা যাতে তথ্যটা ফাঁস করতে না পারি।'

'সবই তো দেখছি বোঝো। তাহলে জানতে চাইছ কেন?'

'কেন জানতে চাইছি, এই সহজ কথাটা তোমার মাথায় ঢুকছে না?' রীতিমত রেগে উঠল বন্দনা। 'তুমি যদি বন্দী হও, কিংবা যদি মারাই পড়ো, তখন কি হবে? মিসাইলগুলো ধ্বংস করার দায়িত্ব তখন আমাদের ঘাড়ে চাপবে না?'

'চাপবে,' বলল রানা। 'ওগুলো তোমরা ধ্বংস করবেও–নিজস্ব পদ্ধতিতে। আইসিআই নিশ্চয়ই তোমাদেরকে কৌশলটা শিখিয়ে দিয়েছে।'

দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকল বন্দনা। তারপর বলল, 'চন্দনা, তুই কিছু বলছিস না কেন?'

'হ্যাঁ, রানা ব্যর্থ হলে মিসাইলগুলো আমাদেরকেই ধ্বংস করতে হবে,' একমুহূর্ত ইতস্তত করে বলল চন্দনা। 'কিভাবে, বস্ তা-ও বলে দিয়েছেন। ব্রিফ করার সময় তুই ছিলি না, তাই জানিস না।'

'কিভাবে, চন্দনা?'

এবারও উত্তর দেয়ার আগে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল চন্দনা। 'সেটা আমি তোকে পরে জানাব।'

হেসে উঠে রানা বলল, 'আমি আউটসাইডার, বন্দনা, কাজেই

আমার সামনে কথাটা তোমার জানতে চাওয়া উচিত হয়নি।' এরপর চন্দনার দিকে ফিরল ও। 'তোমার ইতস্তত করার কারণটা আমি আন্দাজ করতে পারছি, চন্দনা। শুনতে চাও?'

চন্দনা কথা বলছে না।

'হ্যাঁ, বলো, শুনি,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল বন্দনা।

'তোমাদের বস্ নির্দেশ দিয়েছেন, আমি ব্যর্থ হলে তোমরা মিসাইল ধ্বংস করবে ঠিকই, তবে শুধু ভারতের জন্যে নির্দিষ্ট করা মিসাইলটা। বাকিগুলোর ব্যাপারে তাঁর কোন নির্দেশ নেই। ঠিক কিনা, চন্দনা?'

চন্দনা কিছু বলার আগে বন্দনা তাড়াতাড়ি বলল, 'বস্ সেরকম নির্দেশ দিয়ে থাকলে উচিত কাজটাই করেছেন। প্রথমে আমরা নয়া দিল্লিকে রক্ষা করব। তারপর সুযোগ পেলে দেখা যাবে।'

অকস্মাৎ কর্কশ একটা যান্ত্রিক গর্জন ওদের কানের পর্দা ফাটিয়ে দেয়ার উপক্রম করল। দুশো সি.সি.-র তিনটে প্রকাণ্ড মোটরসাইকেল পাহাড় প্রাচীরের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ল, কিছু দূর ছুটে এসে ধুলোর একটা মেঘ তৈরি করে দাঁড়িয়ে গেল একযোগে। লোকগুলোর পরনে চাইনিজ রেগুলার আর্মির ডিজাইনে তৈরি ইউনিফর্ম, তবে রঙ আলাদা—নীল ট্রাউজার, ক্রীম-হোয়াইট টিউনিক, নীল হেলমেট। টিউনিকের কলার আর হেলমেটে ইনসিগনিয়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মিসাইল-এর আকৃতি। সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, কবীর চৌধুরীর স্পেশাল ফোর্স। কঠিন, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল ও। মোটরসাইকেল থেকে নেমে লোক তিনজন যে যার পোর্টেবল মেটাল ডিটেকটরের ভাঁজ খুলল। রেললাইনের দীর্ঘ একটা অংশ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পরীক্ষা করছে তারা।

'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না,' রানার কানে ফিসফিস করল চন্দনা।

'আমারও,' জবাবে বলল রানা। 'এর মানে হলো কবীর চৌধুরী জানে তার ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। রেললাইনে বিস্ফোরক আছে কিনা দেখার জন্যে লোক পাঠিয়েছে, অর্থাৎ আজ তার সাপ্লাই আসার কথা।'

রানা অনুভব করল ওর হাতের তালু ঘেমে যাচ্ছে। এই মুহূর্তের উত্তেজনা নয়, কারণটা হলো সামনে কি আছে তাই নিয়ে উদ্বেগ। কল্পনার চোখে সম্ভাব্য বিপদ আর বাধার একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছে ও, সেই সঙ্গে ভেবে রাখছে কিভাবে সেগুলোকে এড়াবে। মিসাইল ঘাঁটির কমপাউন্ডে ঢুকতে পারাটাই হবে সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জ। কবীর চৌধুরীকে সারপ্রাইজ দেয়ার কোন সুযোগ নেই, তাই হয়তো ওর সঙ্গিনীদের একজনকে বা হয়তো দু'জনকেই বলি দেয়ার প্রয়োজন হতে পারে। রানার চোয়ালের পেশি শক্ত হয়ে উঠল। সেরকম পরিস্থিতি দেখা দিলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করবে না ও। চন্দনা ও বন্দনা খরচযোগ্য। মাসুদ রানাও খরচযোগ্য। দেড়শো কোটি মানুষকে বাঁচানোর জন্যে ওদেরকে যদি মরতে হয়, হাসি মুখেই মরবে ওরা—অন্তত সেটাই উচিত।

লোকগুলোর ইন্সপেকশন শেষ হলো সন্ধ্যার দিকে। লাইনের ধারে খানিক পর পর একটা করে ফ্লেয়ার রাখল দু'জন লোক, দুই সারিতে অনেকগুলো। অপর লোকটা ওয়াকি-টকিতে কারও সঙ্গে কথা বলছে। দূর থেকে ভেসে এল ট্রাক এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার আওয়াজ। এক মিনিটের মধ্যে ছয়টা হেভী-ডিউটি প্যানেল লরি দৃষ্টিপথে বেরিয়ে এল, অর্ধবৃত্ত তৈরি করে রেললাইনের দিকে পিছন ফিরে স্থির হলো। এঞ্জিনগুলো থামতে অন্য আরেকটা শব্দ শুনল রানা। শক্তিশালী রেল এঞ্জিন কাছে চলে আসছে। ফ্লেয়ারের অস্থির আলোয় বেরিয়ে এল ট্রেন, হলুদ হেডলাইট যেন কালো, আঁকাবাঁকা একটা সাপের নিঃসঙ্গ চোখ। আরও কাছে আসতে ট্রেনের আকৃতি পরিষ্কার হলো। অত্যন্ত উঁচু ক্যাব, বগিগুলো

অস্বাভাবিক লম্বা।

প্রকাণ্ড এঞ্জিন থামার পর ফুঁসছে, বাষ্প আর ধোঁয়ার মেঘ উড়িয়ে ফ্লেয়ারের উজ্জ্বল আলো ম্লান করে তুলছে। কাঠের বাক্স, হার্ডবোর্ডের কার্টন আর চটের ব্যাগ দ্রুত তোলা হচ্ছে ট্রাকগুলোয়। কিছু বস্তা চিনতে পারল রানা; ওগুলোয় চাল, ময়দা, নুড্‌ল্‌স্‌ আর ফল আছে। কাছাকাছি একটা ট্রাকে শুকনো মাংস তোলা হলো।

কবীর চৌধুরীর লোকজন দক্ষতার সঙ্গে মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে শেষ করল সব কাজ। আরও একবার বাষ্প ও ধোঁয়া ছেড়ে সগর্জনে রওনা হলো ট্রেন। এরপর এক-এক করে নিভতে শুরু করল ফ্লেয়ারগুলো। মোটরসাইকেল আরোহীরা ট্রাক বহরের পিছনে থাকল গার্ড হিসেবে।

কাঁধে চন্দনার স্পর্শ পেল রানা। 'তিনজনকে মেরে মোটরবাইকগুলো কেড়ে নিলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল সে। 'ট্রাকের পিছু নিয়ে সোজা কবীর চৌধুরীর ঘাঁটিতে পৌঁছে যেতে পারতাম।'

'এত সহজ নয়, চন্দনা,' বলল রানা। 'গেটে থামিয়ে কাগজপত্র দেখতে চাইবে। এসো, চাকার দাগ অনুসরণ করব আমরা।'

ট্রাকগুলোর পিছু নিয়ে মোটরসাইকেল আরোহীরা অদৃশ্য হয়ে গেল, খানিক পর এঞ্জিনের শব্দও মিলিয়ে গেল দূরে। পাথুরে জমিন হলেও, রাস্তার ওপর চাকার দাগ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে মোড় নেয়ার পর রাস্তাটা আর কোন বাঁক নেয়নি, নাক বরাবর সোজা এগিয়েছে। মাঝেমধ্যে বিশ্রামের জন্যে বিরতি নিয়ে একটানা হাঁটল ওরা, রানার হিসাবে ঘণ্টায় সাত মাইল। ভোর চারটের দিকে কমবেশি চল্লিশ মাইল পেরিয়ে এল। ইতিমধ্যে হাঁটার গতি কমে এসেছে, পা আর চলতে

চায় না। তবে রানা থামল হঠাৎ, আরও জরুরী একটা কারণে–ষষ্ঠইন্দ্রিয় ওকে সাবধান হতে বলছে।

শিকারী কুকুরের গন্ধ শোঁকার মত চাকার দাগ অনুসরণ করছিল রানার চোখ, হঠাৎ রাস্তায় একটা হাঁটু গাড়ল ও। ওরা দুই বোন ওর দু'পাশে প্রায় ঢলে পড়ল।

'এবার ক্ষমা করো, রানা!' কাতরকণ্ঠে বলল চন্দনা। 'তুমি কি আমাদের মেরে ফেলতে চাও? দোহাই লাগে, আর এক পা-ও হাঁটতে বোলো না।'

'হাঁটতে আর হবেও না,' বলে ইঙ্গিতে রাস্তাটা দেখাল রানা, চাকার দাগ হারিয়ে গেছে এলোমেলো করা কাঁকর আর ধুলোর মধ্যে।

'এর মানে কি?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল চন্দনা। 'এখানে এসে নিশ্চয়ই ওরা গায়েব হয়ে যায়নি।'

'না,' বলল রানা। 'তবে এখানে থেমেছিল। আবার যখন রওনা হয়, পিছনের ধুলো এলোমেলো করে দিয়ে গেছে, সেজন্যেই চাকার কোন দাগ নেই। এর একটাই অর্থ হতে পারে। সামনে কোথাও একটা চেক পয়েন্ট আছে।'

রাস্তাটা দু'সারি গাছের মাঝখানে; একদিকের কিনারায় সরে এসে শুয়ে পড়ল রানা, ইঙ্গিতে ডেকে নিল ওদেরকে। হামা দিয়ে এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি করে এগোচ্ছে, নজর বুলাচ্ছে দু'পাশের গাছগুলোর ওপর। একটু পরেই দৃষ্টি কেড়ে নিল ছোট, কচি দুটো গাছ, একটা অপরটার ঠিক উল্টোদিকে। কাছাকাছি গাছটার গোড়া ধরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে ওর দৃষ্টি, স্থির হলো স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছোট্ট ও গোল একটা জিনিসের ওপর, মাটি থেকে প্রায় চার ফুট উঁচুতে। উল্টোদিকের গাছের ডালে আরেকটা।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে ওরাও ইলেকট্রনিক চোখ দুটো দেখতে পেয়েছে। গাছটার আরও কাছে সরে এসে সরু তারটাও খুঁজে পেল রানা, কাণ্ড বেয়ে নেমে এসে রাস্তা ধরে দূরে হারিয়ে

গেছে। আর কোন সন্দেহ নেই যে এই এলাকা হলো কবীর চৌধুরীর মিসাইল ঘাঁটির আউটার পেরিমিটার। সশস্ত্র প্রহরীর চেয়ে ইলেকট্রনিক চোখ অনেক বেশি কাজের জিনিস, সহজে কারও চোখে পড়বে না। আগে থেকে না জানিয়ে এই রাস্তা ধরে কেউ গেলে এলাকার ভেতর দিকে কোথাও নিশ্চয়ই অ্যালার্ম বেজে উঠবে।

ইলেকট্রনিক চোখ দুটোকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢোকা সম্ভব, কিন্তু জানা কথা সামনে আরও চেক পয়েন্ট আছে, সবশেষে আছে গার্ড পোস্ট ও টহল দল। তাছাড়া, একটু পরই সকাল হয়ে যাবে, তখন আড়াল ছাড়া এগোনো যাবে না।

রাস্তা পেরিয়ে এসে জঙ্গলে ঢুকল রানা, ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠছে। জঙ্গলটা বেশ ঘন হওয়ায় এদিকে তাকিয়ে থাকলেও কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না। চূড়ায় ওঠার পর দেখল চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে। দূরে থাকাতেই অস্পষ্টভাবে ধরা পড়ল বিস্তৃত কমপাউন্ডটা।

ছোট কয়েকটা পাহাড়ের মাঝখানে, ফাঁকা জায়গার ভেতর বিশাল একটা ফুটবল খেলার মাঠের মত লাগল মিসাইল ঘাঁটিটাকে। দুই প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে গোটা মাঠ ঘেরা। মাঠের মাঝখানে, জমিনে ডুবে আছে মিসাইল সাইলোগুলো। পাহাড়ের চূড়া থেকে মিসাইলের সরু ও তীক্ষ্ণ নাক পরিষ্কারই দেখতে পাচ্ছে ওরা–সাতটা মারাত্মক নিউক্লিয়ার বর্শা, সাতটা রাজধানীর অস্তিত্ব চিরকালের জন্যে ধ্বংস করে দেয়ার জন্যে তৈরি। আলোর উজ্জ্বলতা ক্রমশ বাড়ছে, সেইসঙ্গে আরও তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি।

সাইলোগুলো কংক্রিটের তৈরি, তবে রানা দেখল কংক্রিট অ্যাপ্রন চারদিকে ষাট কি সত্তর ফুটের বেশি বিস্তৃত নয়। অ্যাপ্রন-এর কিনারা ঘেঁষা মাটিতে ডেটোনেটর সেট করতে হলে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হবে। প্রতিটি সাইলো পরস্পরের কাছ থেকে প্রায়

একশো গজ দূরে; এর মানে হলো, ডেটোনেটর সেট করতে প্রচুর সময় লাগবে, ভাগ্যের সহায়তাও দরকার হবে। অথচ ওই দুটোরই খুব অভাব রানার। মনে মনে কয়েকটা প্ল্যানই তৈরি করে রেখেছিল ও, দৃশ্যটার ওপর চোখ রেখে সেগুলো এক এক করে বাতিল করে দিতে হচ্ছে।

মূল প্ল্যানটা ছিল, রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে কমপাউন্ডে ঢুকবে, যোগাড় করতে পারলে পরনে থাকবে প্রহরী বা সিকিউরিটি ফোর্সের ইউনিফর্ম, তারপর এক-এক করে প্রতিটি সাইলোয় ডেটোনেটর ফিট করবে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিটি সাইলোতে পাহারা রয়েছে, কোন দলে দু'জন, কোন দলে তিনজন। পাঁচজনের আরও একটা দল পেরিমিটার ধরে বিরতিহীন টহল দিচ্ছে। কাঠের মেইন গেটটা কমপাউন্ডের দূর প্রান্তে। ওদের সরাসরি নিচে আরও একটা ছোট গেট দেখা যাচ্ছে, এটাও কাঠের; দু'পাশে কাঁটাতারের বেড়া। গেটের সামনে চারফুট জায়গার ভেতর পায়চারি করছে একজন গার্ড। সেটা কোন সমস্যা নয়। সমস্যা ভেতরে, প্রতিটি সাইলোয় যারা দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের মুখোমুখি, কমপ্লেক্স-এর উল্টোদিকে, ডানপাশের প্রায় অর্ধেকটা দখল করে আছে লম্বা কাঠের একটা কাঠামো, দেখেই বোঝা যায় ট্রুপ ব্যারাক। ওদিকেই, এক প্রান্তে, পাশাপাশি বেশ কয়েকটা পাকা দালান রয়েছে, সবগুলোর ছাদে গিজ গিজ করছে অ্যান্টেনা, রাডার স্ক্রীন, ওয়েদার-গ্যাদারিং ডিভাইস ও সিগন্যাল ইকুইপমেন্ট। সন্দেহ নেই, ওই দালানগুলোই কবীর চৌধুরীর অপারেশন হেডকোয়ার্টার। সূর্যের প্রথম রশ্মি হঠাৎ কিছুতে প্রতিফলিত হওয়ায় ওপর দিকে তাকাল রানা, ওর দৃষ্টি গোটা কমপাউন্ডকে ছাড়িয়ে সরাসরি উল্টোদিকের পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল। চূড়ার ওপর বেশ বড় একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। বাড়ির সামনের অংশের সবটুকু জুড়ে রয়েছে কাঁচের দীর্ঘ বিস্তৃতি, আসলে

লম্বা একটা জানালা। আধুনিক একটা বাড়ি, তিনতলা, তবে ছাদটা চীনের প্রাচীন স্থাপত্য রীতির অনুকরণে তৈরি, দেখতে অনেকটা প্যাগোডার মত, কালো ও লাল বর্ডার পেইন্ট করা। পজিশন দেখে বোঝা যায়, গোটা কমপ্লেক্সের ওপর নজর রাখার জন্যেই ওখানে তৈরি করা হয়েছে বাড়িটা।

রানার দৃষ্টি কমপাউন্ডে নেমে এল, প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য গাঁথা হয়ে যাচ্ছে মনের পর্দায়—গেটের সংখ্যা, মধ্যবর্তী দূরত্ব, সাইলোগুলোয় গার্ডদের পজিশন, কোন্ সাইলোয় ক'জন গার্ড, কাঁটাতারের বেড়া থেকে প্রথম সারি সাইলোর দূরত্ব ইত্যাদি। তবে একটা জিনিস দেখেও রানা বুঝতে পারল না কি কাজ ওটার।

কাঁটাতারের বেড়ার ঠিক ভেতরেই, কমপাউন্ডের চারপাশ জুড়ে, মাটিতে বসানো হয়েছে চ্যাপ্টা ধাতব ডিস্ক। ছয় ফুট পরপর ওগুলো, গোটা কমপাউন্ডকে ঘিরে রেখেছে। ওরা দুই বোনও আগে কখনও এ-ধরনের ডিস্ক দেখেনি।

'ড্রেনেজ সিস্টেমের অংশ হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা। 'কিংবা হয়তো মাটির তলায় আলাদা কোনও ফ্যাসিলিটি আছে, ওগুলো স্টীল পিলারের মাথা।'

'কি জানি,' বলল রানা। 'তবে অনেকক্ষণ ধরেই খেয়াল করছি, ওগুলোর ওপর পা ফেলছে না কেউ, বরং সযত্নে এড়িয়ে যাচ্ছে। আমরাও তাই করব।'

বন্দনা বলল, 'কোনও ধরনের অ্যালার্ম সিস্টেম হতে পারে। হয়তো পা পড়লেই কোথাও কিছু বেজে উঠবে।'

তবে রানার ধারণা, জিনিসটা অবশ্যই সাধারণ কিছু নয়, ওটা থেকে সাবধান থাকা দরকার।

আবার রাত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই করার নেই ওদের। মাঝখানের সময়টা ঘুমিয়ে কাটাবে ওরা। তবে এখানে, এই পাহাড় চূড়ায় নয়। উল্টোদিকের পাহাড়ের ওপর ওই বাড়ি আর

লম্বা জানালা বিরক্ত করছে রানাকে। ঝোপে, গাছ আর পাথরের আড়ালে থাকায় কেউ ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু মন বলছে জানালার পিছন থেকে এদিকের পাহাড়ে-পাহাড়ে নজর রাখছে কবীর চৌধুরীর লোকজন চোখে বিনকিউলার তুলে। তিনজনই ওরা ক্রল করে চূড়ার কিনারা থেকে পিছিয়ে এল। ঢালে পৌঁছে চারপাশে তাকাল রানা, বিশ্রাম নেয়ার জন্যে নিরাপদ একটা জায়গা দরকার। ঢালের আরও খানিক নিচে ছোট একটা গুহামুখ দেখা যাচ্ছে, এত সরু যে ক্রল করে কোনরকমে ভেতরে ঢোকা যাবে। গুহাটা পরীক্ষা করে খুশি হলো ও। মুখটা ছোট হলেও ভেতরে তিনজনের শোবার মত জয়াগা আছে। সুযোগ পেয়ে আর কথা নেই, ওরা দু'জন সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল। দু'জনের মাঝখানে শুয়েছে রানা, ওদের গায়ে গা ঠেকিয়ে। হাত দুটো মাথার পিছনে, রানা তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে। রাতে অনেকগুলো সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে, জানে কোনটাই প্রীতিকর হবে না।

সাত

তৃতীয়বার ঘুম ভাঙতে উঠে বসল রানা, শরীর থেকে চন্দনার হাত আর বন্দনার উরু আস্তে করে সরিয়ে দিয়ে। এর আগে আরও দু'বার ঘুম ভেঙে ছিল ওর—প্রথমবার একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনে, দ্বিতীয়বার স্পীডবোটের এঞ্জিন ব্যাকফায়ার করায়। তৃতীয়বার চোখ মেলে নিজেকে মনে করিয়ে দিল,

হেলিপ্যাডটা খুঁজে বের করতে হবে, দেখতে হবে লেক বা নদীটা কোনদিকে।

গায়ে হাত পড়ায় ওদের ঘুম ভেঙে গেছে।

চোখ রগড়ে, হাই তুলে, আড়মোড়া ভেঙে রানার দিকে তাকিয়ে হাসল বন্দনা। 'মিস্টার রানা, আমাদের মিশনটা এই যে রোমান্টিক হতে পারল না, এরজন্যে কিন্তু এককভাবে তুমিই দায়ী। আরে মশাই, এ যুগে এমন সাত্ত্বিক পুরুষ হলে চলে নাকি, তা-ও আবার একজন এসপিওনাজ এজেন্টের? সত্যি কথা বলতে কি, তুমি এরকম নরম ভেজিটেবল জানলে এই মিশনে আমি আসতে চাইতাম কি না সন্দেহ। বিশ্বাস করো, আমি রীতিমত অপমানিত বোধ করছি! আর চন্দনা...'

'তুই যত পারিস নির্লজ্জ হ,' তাড়াতাড়ি বলল চন্দনা, 'কিন্তু দয়া করে আমাকে জড়াবি না।'

'আমি কেন জড়াব, তুই তো অনেক আগে থেকেই জড়িয়ে আছিস!' হেসে উঠল বন্দনা। 'কে মরে কে বাঁচে বলা তো যায় না, কাজেই ব্যাপারটা মিস্টার রানার জানা দরকার।'

'বন্দনা!' চোখ রাঙাল চন্দনা। 'তুই থামবি?'

'ঠিক আছে, ডিটেইলসে গিয়ে তোকে বিব্রত করছি না,' বলল বন্দনা। 'মিস্টার রানাকে শুধু এটুকু জানাই যে ওর ওপর রীতিমত একটা কোর্স কমপ্লিট করেছিস তুই স্রেফ ব্যক্তিগত কৌতূহল থেকে। কেমন দেখতে, ক'ফুট লম্বা, কি খেতে পছন্দ করে, স্বভাব-চরিত্র—মোট কথা, ওর সম্পর্কে হেন কোন বিষয় নেই যা তোর মুখস্থ নয়। কাজেই, ওর অবহেলা আমাকে যদি অপমান করে থাকে, তোকে নিশ্চয়ই হতাশায় অসুস্থ করে তুলেছে। পারলে অস্বীকার কর!'

রাগে, ক্ষোভে নীল হয়ে গেল চন্দনা, রানার দিকে তাকাতে পারছে না। রানাই ওকে উদ্ধার করল। 'ঝগড়া বা খুনসুটি যাই করো তোমরা, আমি এখান থেকে বেরিয়ে যাবার পর, কেমন?

তবে সময় পাবে মাত্র পাঁচ মিনিট। কোন শব্দ না পেলে তোমরাও বেরিয়ে পড়বে এখন থেকে ঠিক পাঁচ মিনিট পর।'

গুহা থেকে বেরোতে গিয়ে মুখের কাছে স্থির হয়ে থাকল রানা, দিনের উজ্জ্বলতা চোখে সইয়ে নিচ্ছে। জঙ্গলের নিজস্ব কিছু বিচিত্র শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। এক মিনিট পর দাঁড়াল, চারদিকে চোখ বুলিয়ে মিসাইল ঘাঁটির উল্টোদিকে হাঁটছে। সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত ওদিকে ওরা যাবে না।

কিছুদূর এগোতেই পানির শব্দ পেল রানা। গুহার পিছন দিকের ঢালে চলে এল। এখানে একটা পাহাড়ী ঝর্না বইছে, নিচু জায়গা থাকায় ছোট্ট একটা লেকও তৈরি হয়েছে। সিদ্ধান্ত নিল গোসল করে দাড়ি কামানো দরকার।

লেক থেকে উঠে দাড়ি কামানো শেষ করেছে, দেখল সাবধানে ঝোপ ফাঁক করে ওকে খুঁজছে বন্দনা, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে চন্দনা। একটা হাত তুলে ঝাঁকাল ও। দুই বোন আনন্দে নেচে উঠল, ছুটে আসার সময় চাপা গলায় হাসছে। একটা পাথরে হেলান দিয়ে বসে থাকল রানা, লেকের পানিতে দুই বোনের হুড়োহুড়ি দেখছে। কাছেই পাকা পেয়ারা ঝুলছে একটা গাছে, কয়েকটা পেড়ে লেকের পানিতে ছুঁড়ে দিল, নিজেও খেলো একটা। বেশ মিষ্টি পেয়ারা।

হাতে প্রচুর সময় আছে, তাই ওদেরকে পানি থেকে ওঠার জন্যে তাগাদা দিচ্ছে না রানা। চারপাশে চোখ রাখছে, তবে মন ও মাথা অন্য কাজে ব্যস্ত। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে দেখা মিসাইল ঘাঁটির ছবিটা খুঁটিয়ে আরেকবার পরীক্ষা করছে ও। আগে করে রাখা সবগুলো প্ল্যান বাতিল হয়ে গেছে। ভেতরে ঢুকে ডেটোনেটর ফিট করতে হলে নতুন প্ল্যান দরকার।

ভেতরে ওদের ঢোকাটা আড়াল করার জন্যে জায়গাটার চারপাশে কোথাও ভাল একটা কংক্রিটের পাঁচিল পর্যন্ত নেই। একবার ভেবেছিল, ডাইভারশন ক্রিয়েট করার জন্যে ওদের

দু'জনকে ভেতরে পাঠিয়ে কবীর চৌধুরীর হাতে বন্দী হতে দেবে–ওরা তাকে জানাবে যে রানা একটা দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তারপর রানা নিজে ঢুকে শেষ করবে কাজটা, এবং সবশেষে উদ্ধার করবে ওদেরকে। কিন্তু ঘাঁটির লেআউট দেখার পর এটাও বাতিল করে দিতে হয়েছে। ও মারা গেছে, বাকি দু'জন ধরা পড়েছে, এই দুটো ঘটনা কবীর চৌধুরীর মনে নিরাপত্তা সম্পর্কে মিথ্যে একটা ধারণার জন্ম দেবে ঠিকই, কিন্তু তা থেকে লাভবান হবার কোন সুযোগ নেই ওদের। কারণ, প্রতিটি সাইলোর মুখে সতর্ক, সশস্ত্র গার্ড রয়েছে।

কাঁটাতারের বেড়া বা গেটে ওদেরকে পৌঁছাতে হবে খোলা জায়গা পার হয়ে। এর কোন বিকল্প নেই। বেড়া ভেঙে বা গেট টপকে যেভাবেই হোক কমপাউন্ডে ঢুকতে হবে। সবশেষে ডেটোনেটরগুলো বসানোর জন্যে হাতে পেতে হবে প্রচুর সময়। এই কঠিন কাজে সফল হতে হলে রীতিমত যুদ্ধ করে জিততে হবে ওদেরকে। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

প্রতিটি সাইলোয় গার্ড আছে, এটাই আসল বাধা। এই সমস্যার একটাই সমাধান–গার্ডদের দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে দিয়ে শুধু সাইলো নয়, গোটা কমপাউন্ড ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

লেক থেকে উঠে চীনা ড্রেস বদলে নিজেদের জিনস আর শার্ট পরছে ওরা। ঝোপের ভিতর শুয়ে চোখ বুজল রানা। প্রায় নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ওর দু'পাশে বসল ওরা। 'ঘুমালে নাকি?' ফিসফিস করল চন্দনা।

চোখ খুলে মাথা নাড়ল রানা। ওখানেই শুয়ে-বসে সময়টা কাটিয়ে দিল ওরা। বিশেষ কোন কথা হলো না। এক সময় পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল সূর্য। এবার উঠতে হয়।

আবার ক্রল করে পাহাড়টার চূড়ায় উঠছে ওরা। কমপাউন্ডের উল্টোদিকের পাহাড়ে বিরাট জানালাসহ বাড়িটার কথা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছে না রানা। ভুলতে পারছে না কম্পাউন্ডকে

ঘিরে বসানো ধাতব ডিস্কগুলোর কথাও।

চূড়ায় উঠে ঝোপ ফাঁক করে নিচে তাকাতেই দেখল গোটা কমপাউন্ড জুড়ে চলছে কর্মব্যস্ততা। টেকনিশিয়ান, মেকানিক, গার্ড–কেউ বসে নেই। গার্ডদের এখন পালাবদলের সময়। সম্ভবত রুটিন কাজের অংশ হিসেবে দুটো মিসাইল চেক করা হচ্ছে। সাইলোর ভেতর উঁচু করা হলো ওগুলো, তারপর নিচু করা হলো, এরকম কয়েকবার।

দৃশ্যটার প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ করছে রানা; মনে আশা, ছোট হলেও তাৎপর্যপূর্ণ এমন কিছু দেখতে পাবে যেটা ওদের কাজকে কিছুটা সহজ করে দেবে। কিন্তু তেমন কিছুই চোখে পড়ল না। কাজটা সত্যি খুব কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে দুই বোনের একজনকে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হবে। আপন মনে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। এই পরিস্থিতিতে ওদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে না দিয়ে ওর কিছু করার নেই। তাছাড়া, ওরা তো জেনেই এসেছে যে এটা একটা সুইসাইড মিশন।

'ওই শালার ডিস্কগুলো কি হতে পারে?' হঠাৎ কথা বলে ওঠায় চমকে রানার দিকে তাকাল চন্দনা।

ওর মাথার চুল হাত দিয়ে একটু এলোমেলো করে দিল চন্দনা, আরও একটু সরে এল গায়ের কাছে, কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোমাকে যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি। এত দুশ্চিন্তায় ভোগো কেন?'

'হোক এটা সুইসাইড মিশন,' বলল রানা, 'কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে তিনজনই যাতে বেঁচে থাকি। ঠিক দুশ্চিন্তা করছি না, চন্দনা, বলতে পারো আমি একটা কঠিন ধাঁধার সমাধান খুঁজছি।' আরও অনেক কথা বলার ছিল ওর, কিন্তু জানে তার সময় এখনও আসেনি।

'আমাদেরকে কাজে লাগাও,' বিড়-বিড় করল চন্দনা। 'দায়িত্ব দিয়ে দেখো, আমরা তোমাকে হতাশ করব না।'

শুনতে পেয়ে রানার অপর পাশ থেকে হেসে উঠল বন্দনা। 'হ্যাঁ, মশাই, যে-ভাবে খুশি কাজে লাগাও বা ব্যবহার করো, কথা দিচ্ছি আমি অন্তত কোন আপত্তি করব না।'

'তুই থাম তো, মুখপুড়ি!' চাপা গলায় ধমক দিল চন্দনা।

'প্লীজ, এখন নয়!' অনুরোধ করল রানা।

মাথা তুলে নিচের ডিস্কগুলোর দিকে আবার তাকাল ও। ওগুলোর মসৃণ, চকচকে সারফেস গোপন কিছুই ফাঁস করছে না। বন্দনার ধারণা ঠিকও হতে পারে, ওগুলো হয়তো সত্যি কোন অ্যালার্ম সিস্টেমের অংশ। কিংবা হয়তো কোনও প্রোটেকটিভ সিস্টেমের ইলেকট্রিফায়েড গ্রিড। যাই হোক, ওগুলোর অস্তিত্ব ভয়ানক অস্বস্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছে ওকে।

'প্ল্যানটা বলি এবার,' শুরু করল রানা। 'প্রথম কাজ একটা ডাইভারশন ক্রিয়েট করা। তোমাদের একজন ঝোপের আড়াল নিয়ে কমপাউন্ডের উল্টোদিকে চলে যাবে, তারপর নিজের দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। একমাত্র এভাবেই আমরা ভেতরে ঢুকে ডেটোনেটর সার্কিট বসানোর সুযোগ বা সময় পেতে পারি। যে-ই যাও তোমরা, ওদের মনোযোগ ধরে রাখার কাজটা বেশ কিছুক্ষণ বন্দী না হয়ে চালিয়ে যেতে হবে, এদিকে আরেকজন যাতে তার কাজটা করার সময় পায়। কে যাবে তা ঠিক করার আগে আরেকটা কথা। তোমাদের এই কাজে মারাত্মক ঝুঁকি আছে। ধরা পড়লে নির্যাতন করে মারবে কবীর চৌধুরী। তবে ভাগ্য অতটা প্রসন্ন না-ও হতে পারে। ওরা হয়তো ধরার চেষ্টাই করবে না, চেষ্টা করবে সরাসরি গুলি করে ফেলে দিতে। এখন বলো, কে যাবে?'

'আমি,' দুই বোন একযোগে বলল, তবে বন্দনা বোধহয় একটু আগে।

'ঠিক আছে, বন্দনাই,' রাজি হলো রানা।

'তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে,' বলল বন্দনা। 'তোমার কথা

শুনে মনে হলো আমি ডাইভারশন ক্রিয়েট করতে পারলে চন্দনা ডেটোনেটরগুলো বসানোর জন্যে কমপাউন্ডে ঢুকবে।'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু তুমি? তুমি তাহলে কি করবে?'

'আমি যে কাজটা সবচেয়ে ভাল পারি সেটাই করব,' বলল রানা। 'চন্দনাকে কাভার দেব।'

'বাহ্, তুমি তো দেখছি ভাল মজা পেয়েছ!' প্রতিবাদ করল বন্দনা। 'আমাদের দুই বোনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে তুমি বেশ নিরাপদ আড়ালে থাকতে চাও, তাই না?'

রানা হাসল, শান্ত গলায় বলল, 'আমি শুধু চন্দনাকে কাভার দেব না, অন্য আরও কাজ করব।'

'কি সেটা?'

'হেডকোয়ার্টারে ঢুকে জিম্মি করব কবীর চৌধুরীকে,' বলল রানা। 'ধরা পড়লে তোমাদেরকে মুক্ত করাটা তখন পানির মত সহজ হয়ে যাবে।'

'রানার কথায় যুক্তি আছে,' এ বিষয়ে এই প্রথম মন্তব্য করল চন্দনা।

যুক্তিটা অগত্যা মেনে নিলেও, গজ-গজ করে কিছু বলল বন্দনা, তবে কি বলল বোঝা গেল না।

'আমার কাছে কিছু এক্সপ্লোসিভ পাউডার আছে, সঙ্গে রাখতে পারো,' তাকে বলল রানা। 'বিস্ফোরণের আওয়াজ, আর থেমে থেমে বেরেটার ফাঁকা গুলি ওদের মনোযোগ কাড়ার জন্যে মনে হয় যথেষ্ট।'

'আমার কাছে আরও ভাল জিনিস আছে,' বলে লেদার পাউচ থেকে ছোট একটা মেটাল বক্স বের করল চন্দনা। সেটা খুলতে ভেতরে মারবেল আকারের অনেকগুলো ছোট বল দেখা গেল, গা থেকে খুদে নব বেরিয়ে আছে। 'দেখেই আশা করি চিনতে পারছ?' রানাকে জিজ্ঞেস করল। 'হ্যাঁ, মিনি গ্রেনেড। কিন্তু মিনি

শুধু আকারেই, একেকটার শক্তি একজোড়া হ্যান্ড-গ্রেনেডের সমান।' কয়েকটা মারবেল বন্দনার হাতে গুঁজে দিল ও।

পিছিয়ে এসে সিধে হলো বন্দনা। 'চক্কর দিয়ে উল্টোদিকে পৌঁছাতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগবে আমার,' বলল সে। 'ততক্ষণে সন্ধে হয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ। এখন থেকে প্রত্যেকে আমরা একা হয়ে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'যে-যার কাজ সেরে আবার এখানেই আমরা মিলিত হব, ঠিক আছে?' মাথা ঝাঁকাল দুই বোন। 'আরেকটা কথা, বন্দনা। তুমি যদি কোন কারণে ডাইভারশন ক্রিয়েট করতে ব্যর্থ হও, তারপরও এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টা পর চন্দনা তার কাজ শুরু করবে।'

দুই বোন পরস্পরের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল। তবে আলিঙ্গনটা হলো ক্ষণস্থায়ী। ঘুরে ঢাল বেয়ে নেমে যাচ্ছে বন্দনা।

'আবার দেখা হবে, বন্দনা,' পিছন থেকে নরম সুরে বলল রানা।

'হবেই, আমি জানি, মাসুদ রানা,' জবাব দিল বন্দনা, পিছন ফিরে তাকাল না। এবার 'মিস্টার' নেই নামের আগে।

চন্দনাকে পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ না ঝোপ ও গাছপালার আড়ালে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল বন্দনা। তারপর, যেই ঘুরতে যাবে, অমনি ওকে হকচকিয়ে দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল চন্দনা ওর বুকে।

রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছে মেয়েটা। রানা বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে ওঠার আগেই ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেলল সে। বিড়বিড় করে বলছে, 'প্লীজ, রানা, ওকে তুমি ক্ষমা কোরো। জানি ওর প্রতিটি কথায় দুঃখ পেয়েছ তুমি। কিন্তু বিশ্বাস করো, বন্দনা সত্যি অত খারাপ নয়...'

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করছে রানা। 'আরে, এমন

বোকা মেয়ে তো দেখিনি! এই, কে বলল ওর কথায় দুঃখ পেয়েছি আমি?'

'অস্বীকার কোরো না, আমি জানি!' ধরা গলায় বলল চন্দনা, রানাকে কোনমতে ছাড়ছে না। 'তুমি যদি ওকে ক্ষমা না করো, ওর কঠিন অমঙ্গল হবে, রানা। প্লীজ...'

'ঠিক আছে, তুমি যদি শুনে খুশি হও তো বলি—ওর কোন কথায় আমি যদি দুঃখ পেয়ে থাকি, সে-সব আমি মনে পুষে রাখিনি, ওর করা এবং না-করা অপরাধ আমি ক্ষমা করে দিলাম। এখন খুশি?'

রানাকে ছেড়ে একটু পিছিয়ে গেল চন্দনা, ভেজা চোখ তুলে হাসছে। 'হ্যাঁ, খুশি! প্রার্থনা করো, আমার বোন যাতে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে।'

'হে আল্লাহ, বন্দনাকে তুমি বহাল তবিয়তে এখানে ফিরিয়ে এনো!'

আবার, তবে এবার ধীরে ধীরে, রানার গায়ের সঙ্গে সেঁটে এল চন্দনা। এবার রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরার মধ্যে কেমন যেন একটা আশ্রয় পাবার আকুলতা কাজ করছে; যেন পরম নির্ভরতার সন্ধানে আছে সে, আত্মসমর্পণ করতে চায়।

'আবার কি হলো?' সামান্য হলেও বিব্রত রানা।

রানার বুকে গাল ঘষল চন্দনা। 'কিছু হয়নি। তবে মরি কি বাঁচি ঠিক নেই তো, না বলা কথাটা এখুনি তোমাকে শোনাতে চাই।'

'কি কথা, চন্দনা?'

বুক থেকে মুখ তুলে রানার চোখে চোখ রাখল চন্দনা। 'যা খুশি ভাবো আমাকে,' বলে চুমোর বন্যায় ভরিয়ে দিল রানার কপাল, চোখ, ঠোঁট আর গলা। 'তুমি আমার আদর্শপুরুষ—এই কথাটা! বন্দনা একটা বর্ণও মিথ্যে বলেনি, সত্যি তোমার অন্ধ ভক্ত আমি—তোমার সব কথা সত্যিই আমার মুখস্থ।'

হাতে কঠিন একটা কাজ, রানা সাড়া দিতে ইতস্তত করছে। কিন্তু চন্দনা যখন অদম্য হয়ে উঠল, যখন ফিসফিস করে বলল, 'তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করলে ধরে নেব আমি অভিশপ্ত একটা মেয়ে, ভগবান আমাকে পছন্দ করেন না...' তখন আর নিজেকে ধরে রাখা সম্ভব হলো না। এরপর দু'জনেই ওরা পরস্পরকে নিয়ে প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠল।

ধীরে-ধীরে গাঢ় হলো সন্ধ্যা, তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওদের নিচে বিশাল মিসাইল-ঘাঁটির সারি সারি লাইট পোস্টের আলো উজ্জ্বলতর হলো। হাত তুলে কাঁটাতারের বেড়াটাকে দু'ভাগ করে রাখা কাঠের ছোট একটা গেট দেখাল রানা। গেটের ঠিক ভেতরেই কাঠের একটা সাপ্লাই শেড আছে। গেটের সামনে মাত্র একজন সেন্ট্রি, এদিক থেকে ওদিক ছ'পা হেঁটে পায়চারি করছে। 'ওই লোকটা আমাদের প্রথম টার্গেট,' চন্দনাকে বলল ও। 'ওকে কাবু করে গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকব। এসো।'

'এখুনি?' চন্দনা বিস্মিত। 'বন্দনা রওনা হয়েছে বিশ মিনিটও হয়নি!'

'ধরা পড়লে ওকে টরচার করা হবে, চন্দনা,' বলল রানা। 'এখানে আমাদের থাকা ঠিক নয়।'

ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর ফাঁক খুঁজে নিয়ে ক্রল করে নামছে রানা, চন্দনা ঠিক ওর পিছনেই আছে। দু'জনেই সাবধান, ঝোপগুলোয় যাতে ঘষা না খায়। ঢালের নিচে নামার পর ওদের কাছ থেকে সেন্ট্রির দূরত্ব দাঁড়াল পনেরো ফুটেরও কম। রানার হাতে একটা ছুরি বেরিয়ে এসেছে।

সেন্ট্রির রাইফেল শোল্ডার স্লিং-এর সঙ্গে ঝুলছে, কাজেই পড়ে গিয়ে পাকা মেঝেতে শব্দ করার ভয় নেই। এখন দেখতে হবে রাইফেলসহ লোকটাই না পড়ে যায়। ছুরিটা ঢিলে আঙুলে ধরে আছে রানা, উত্তেজনায় যেন আঙুল শক্ত না হয়, সে ব্যাপারে

বিশেষভাবে সচেতন। সুযোগ এই একটাই পাওয়া যাবে। ব্যর্থ হলে গোটা মিশন এখানেই শেষ। দুটো কাঠের মোটা থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে গেটটা। প্রতিবার থাম পর্যন্ত পৌঁছে থামছে সেন্ট্রি, ঘুরে আরেক থামের দিকে ফিরছে গুনে-গুনে ছয় কদম হেঁটে। ছুরিটা এত জোরে ছুটল, ওটার গতিপথ চন্দনা দেখতেই পেল না। সেন্ট্রির গলা দিয়ে ঢুকে গেটের একটা মোটা থামে গেঁথে গেছে ফলা, মস্ত পেরেকের মত ওটার সঙ্গে আটকে রেখেছে সেন্ট্রিকে। ছুরিটাকে অনুসরণ করে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে তার পাশে পৌঁছে গেছে ওরা। তাকে ধরে মেঝেতে ধীরে-ধীরে শোয়াল রানা। চন্দনা স্লিংসহ রাইফেলটা খুলে নিল কাঁধ থেকে।

'জ্যাকেট আর হেলমেট খুলে পরো,' নির্দেশ দিল রানা। 'ছুটোছুটি শুরু হলে ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারবে। সাবধান, মেটাল ডিস্কে পা দিয়ো না।' লাশটাকে এরই মধ্যে টেনে ঝোপের ভেতর সরিয়ে এনেছে ও।

জ্যাকেট ও হেলমেট পরে কমপাউন্ডে ঢুকে পড়ল চন্দনা, সাপ্লাই শেডের গাঢ় ছায়ায় অপেক্ষা করছে। ওর পাশে দাঁড়িয়ে শেভিং ক্যানটা খুলছে রানা। তিনটে খুদে নিউক্লিয়ার ডিভাইস চন্দনাকে দিল ও, নিজে রাখল বাকি চারটে।

'শেষ মাথার তিনটে সাইলো তোমার,' বলল ও। 'হেলমেট আর জ্যাকেট থাকায় ওদিকে পৌঁছাতে তোমার সমস্যা হবে না। ডেটোনেটর মাটির সামান্য নিচে ঢুকিয়ে দিলেই হবে, বেশি গর্ত করার দরকার নেই।'

'কিন্তু বন্দনাকে তুমি অন্য কথা বলেছ। ডেটোনেটর আমি বসাব, তুমি আমাকে কাভার দেবে...'

'তোমার কাজ খানিকটা হালকা করে দিচ্ছি,' বলল রানা। 'তুমিও আমার কাজ খানিকটা সহজ করে দেবে। কিভাবে, শোনো...'

'ফেং?' হঠাৎ চীনা ভাষায় কে যেন ডাকল। 'গেট খালি কেন,

ফেং?'

রানার হাতে আবার বেরিয়ে এল ছুরিটা। শেডের আড়াল থেকে বুট জুতোর আওয়াজ ভেসে এল। লোকটা দ্রুত পায়ে বাঁক ঘুরে গেটের দিকে আসছে। গাঢ় ছায়া থেকে স্যাঁৎ করে তার পিছনে পৌঁছে গেল রানা, কানের নিচ দিয়ে ঢুকে মগজে পৌঁছে গেছে ছুরির ডগা। লাশটাকে শুইয়ে দ্রুত তার ইউনিফর্ম খুলে নিল রানা, সেগুলো পরে রাইফেলটাও কাঁধে ঝোলাল। 'আমি এখন গেটে পায়চারি করব,' ফিসফিস করল ও। 'তোমাকে কাভারও দেব। কাজ শেষ করে আরও দূরে সরে যাবে তুমি, একটা আড়াল বেছে নিয়ে এক-এক করে মারবেলগুলো ফাটাবে।'

'তারমানে আমাকে তুমি ডাইভারশন তৈরি করতে বলছ?' তীক্ষ্ণ হলো চন্দনার দৃষ্টি। 'আমরা তাহলে বন্দনার জন্যে অপেক্ষা করছি না?'

'এখন এ প্রশ্ন অর্থহীন, চন্দনা,' হিসহিস করে বলল রানা। 'ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে, এখন আর কারও জন্যে অপেক্ষা করার প্রশ্ন ওঠে না। তুমি যাও!' চন্দনা যাচ্ছে কি না দেখার জন্যে সময় নষ্ট করল না, ছায়া থেকে বেরিয়ে গেটে চলে এল, নিহত সেন্ট্রির অনুকরণে পায়চারি করছে।

হেলমেট পরা মাথা নিচু করে মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটছে চন্দনা, গেট থেকে দেখতে পেল রানা। তার ভাগের প্রথম সাইলোর কাছাকাছি পৌঁছে থামল সে, মুঠো থেকে পায়ের সামনে মাটিতে ফেলে দিল একটা ডেটোনেইটর, জুতোর ডগা দিয়ে খুঁচিয়ে মাটি খুঁড়ছে। বুদ্ধিমতী, মনে-মনে প্রশংসা করল রানা, দাঁড়িয়েই কাজ সারছে। ষাট ফুট দূর থেকে সাইলোর গার্ডরা এখন যদি চন্দনার দিকে তাকায়, দেখবে তাদের এক সঙ্গী কংক্রিট অ্যাপ্রনের কিনারায় দাঁড়িয়ে হাত থেকে পড়ে যাওয়া কিছু একটা খুঁজছে।

পায়চারি না থামিয়ে চট করে একবার হাতঘড়ি দেখল রানা।

বন্দনা ওদের কাছ থেকে বিদায় নেয়ার পর মাত্র বাইশ মিনিট পার হয়েছে। মুখ তুলে দেখল, দ্বিতীয় সাইলোর কংক্রিট অ্যাপ্রনের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে চন্দনা। এক সেকেন্ড পর ঝুঁকল সে, কিছু একটা তোলার ভান করল, আবার সিধে হয়ে মাঠের কিনারা ধরে দূরতম প্রান্তের সাইলোর দিকে পা বাড়াল। মনে মনে আবার তার প্রশংসা না করে পারল না রানা। হেলমেট আর জ্যাকেট পরে থাকায় এমনিতেই চন্দনাকে চীনা গার্ড বলে মনে হচ্ছে, তারপরও ধোঁকা দেয়ার জন্যে অভিনয় শুরু করেছে সে, হাঁটছে খাটো গার্ডদের ভঙ্গি নকল করে–প্রতিটি পদক্ষেপ ছোট অথচ দ্রুত, যেন পায়ের তলায় চাকা লাগানো আছে।

কাজটা এত সহজ হবে, রানা কল্পনাও করেনি। হাতঘড়ির ওপর একটা চোখ রেখে গোটা কমপাউন্ডের ওপর ঘন-ঘন চোখ বুলাচ্ছে ও। কোথাও কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা চোখে পড়ছে না। একজন গার্ডের সঙ্গে ওভারঅল পরা তিনজন টেকনিশয়ানকে এগিয়ে আসতে দেখল চন্দনা, এখন সে যদি দিক পরিবর্তন না করে তাহলে সর্বশেষ সাইলোর কাছাকাছি ওদেরকে পাশ কাটাবে সে। শুধু টেকনিশিয়ান হলে আলাদা কথা ছিল, চন্দনা গার্ডের সামনে পড়তে চাইছে না; দিক বদলে আরেক দিকে চলে যাচ্ছে সে।

হঠাৎ রানার শিরদাঁড়ায় শিরশিরে একটা অনুভূতি হলো। সর্বশেষ সাইলোর কাছাকাছি এই মুহূর্তে কেউ নেই, অথচ সেদিকে আর ফিরেও তাকাচ্ছে না চন্দনা, দ্রুত হেঁটে মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছে। কাজ শেষ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোথায় যাচ্ছে সে? ওদিকে পাশাপাশি দুটো ওভারহেড ট্যাংক, একটা ওয়াচটাওয়ার, একটা কমিউনিকেশন টাওয়ার, ছোট কয়েকটা শেড আর দুটো দালান দেখা যাচ্ছে। তারপর গাঢ় ছায়া ও অন্ধকার। সেই অন্ধকারে হারিয়ে গেল চন্দনা। রানার মনে প্রশ্ন জাগল, ওদিকে কি বন্দনাকে দেখেছে সে? তা না হলে কেন গেল?

ব্যাপারটা রহস্যময়। তবে কার কি ভূমিকা তা নিয়ে চিন্তা করার সময় পরেও পাওয়া যাবে। এই মুহূর্তে ওর কাজ ওকে শুরু করতে হবে। গেট ফেলে প্রথম সাইলোর দিকে হাঁটা ধরল রানা।

দশ ফুটও এগোতে পারেনি, বুম-বুম গ্রেনেড বিস্ফোরণের শব্দে গোটা কমপাউন্ড কেঁপে উঠল। কি ঘটছে বুঝতে পেরে ছুটল রানা। ও একা নয়, কমপাউন্ডের সবাই ছুটোছুটি শুরু করেছে। চন্দনার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল ও। হাতের কাজ অসমাপ্ত রেখে ডাইভারশন ক্রিয়েট করাটাকেই জরুরী বলে মনে করেছে সে। প্রথম দুটো সাইলোর কংক্রিট অ্যাপ্রনের কিনারায় ডেটোনেটর বসাতে রানার কোন সমস্যাই হলো না। একদল গার্ডের পিছু নিয়ে ছুটছে ও। তৃতীয় সাইলোকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল দলটা। তাদের পিছনে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল রানা। উঠতে দেরি করছে ও। আসলে তো নখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে ভেতরে নিউক্লিয়ার ডিভাইস ঢোকাচ্ছে। কাজটা করার ফাঁকে হাতঘড়িতে চোখ বুলাল। বন্দনা রওনা হবার পর মাত্র ছাব্বিশ মিনিট পেরিয়েছে। কাজ শেষ। সিধে হচ্ছে রানা। আর মাত্র একটা সাইলো বাকি। মাঠের ডান দিকে চোখ পড়তে স্থির হয়ে গেল ও, পা উঠতে চাইছে না। ব্যারাক থেকে পিল-পিল করে বেরিয়ে আসছে কবীর চৌধুরীর ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র সৈনিকরা, দ্রুত গোটা কমপাউন্ডে ছড়িয়ে পড়ছে তারা। ডাইভারশন আসলে বুমেরাং-এ পরিণত হয়েছে। রানার প্রথম প্ল্যানটা ছিল, ডাইভারশন তৈরি করা হবে মিসাইল ঘাঁটির বাইরে থেকে, ফলে শত্রুর খোঁজে ঘাঁটির গার্ড ও সৈন্যরা কমপাউন্ড থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু বন্দনার বদলে কাজটা চন্দনা শুরু করায় হিতে বিপরীত ঘটছে।

আরও দুটো গ্রেনেড বিস্ফোরিত হলো, প্রথম দুটো যেদিকে ফেটেছে তার উল্টোদিকে চল্লিশ গজ দূরে। একদল সৈনিক রাইফেল উঁচিয়ে ছুটল সেদিকে। শেষ প্রান্তের দুটো শেডে দাউ-

দাউ করে আগুন ধরে গেল। গোটা কমপাউন্ড জুড়ে মহা বিশৃংখলা শুরু হয়েছে। কমান্ডাররা গার্ড ও সৈন্যদের দিক নির্দেশনা দিতে পারছে না। কে কোত্থেকে হামলা করছে কারও কোন ধারণা নেই।

হাতের কাজটা শেষ করতে রানার কোন সমস্যা হলো না। চার নম্বর সাইলোর গার্ডরা পোস্ট ছেড়ে সরে গেছে খানিকটা, তাকিয়ে আছে আরেকদিকে। গোটা মাঠে অনেক গার্ডই উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, হাতে রাইফেল রেডি, শত্রুকে চিনতে পারলেই গুলি করবে। তাদের মত রানাও কংক্রিট অ্যাপ্রনের কিনারায় শুয়ে কাজটা শেষ করল।

আরও দুটো গ্রেনেড ফাটল ওভারহেড ট্যাংকের পাশে। ওদিক থেকে ছুটে পালিয়ে আসছে কয়েকজন গার্ড, তাদের মধ্যে একজনকে চন্দনা বলে সন্দেহ হলো রানার। সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো তাকে সর্বশেষ সাইলোর কংক্রিট অ্যাপ্রনের শেষ সীমায় শুয়ে পড়তে দেখে।

কাজটা শেষ করে সিধে হচ্ছে চন্দনা, এই সময় গোটা কমপাউন্ড জুড়ে গম-গম করে উঠল শক্তিশালী লাউডস্পীকার সিস্টেম, চীনা ভাষায় নির্দেশ দিচ্ছে—সবাইকে গ্যাস মাস্ক পরতে হবে। শুনে হাসিই পেল রানার। একা চন্দনার হামলাই ওদেরকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। আসলে কবীর চৌধুরী সম্ভবত কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না। তবে এক সেকেন্ড পরই রানার ভুলটা ভাঙল। এতক্ষণে বোঝা গেল চ্যাপ্টা ধাতব ডিস্ক আকৃতির জিনিসগুলো আসলে কি।

প্রথমে রানা ইলেকট্রিক মোটরের নরম গুঞ্জন শুনতে পেল। পরমুহূর্তে দেখল মাটিতে পড়ে থাকা ডিস্কগুলো একযোগে শূন্যে উঠে যাচ্ছে, নিচ থেকে খাড়া হচ্ছে মোটা ধাতব রড। মাটি থেকে দশ কি বারো ফুট ওঠার পর স্থির হলো রডগুলো। পুরোটা বেরুবার পর চ্যাপ্টা ডিস্ক এখন দেখতে হয়েছে গোলাকার ছোট

ট্যাংক, প্রতিটি ট্যাংকের চারপাশ থেকে বেরিয়ে এসেছে চারটে খাটো শুঁড়। ওগুলো থেকে বিরতিহীন বেরিয়ে আসছে নিচ্ছিদ্র মেঘের মত ঘন গ্যাস। চারদিকে অসংখ্য গ্যাস ট্যাংক, সবগুলো থেকে বেরিয়ে আসায় মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে গোটা কমপাউন্ড বিষাক্ত গ্যাসে ঢাকা পড়ে গেল।

নাক ও মুখে রুমাল বেঁধে ছুটছে রানা। এখনও সুযোগ আছে ওর, গেট পেরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে পারে। কিন্তু চন্দনাকে ফেলে একা পালাবার কথা ভাবতে পারছে না।

রুমালে কাজ হচ্ছে না, নাক দিয়ে ফুসফুসে পৌঁছে যাচ্ছে গ্যাস। তবে গন্ধ আর ঝাঁঝ রানার মনে খানিকটা সাহস যোগান দিল। পরিষ্কার চিনতে না পারলেও, মূল উপাদান হিসেবে ফজিন-কে নিয়ে এই গ্যাস তৈরি করা হয়েছে বলে ধারণা করল ও। হত্যা করা উদ্দেশ্য নয়, ফুসফুসের কাজে বাধা সৃষ্টি করে ভিক্টিমকে অচল করে দেবে।

মাথাটা মনে হলো সাঁতরাচ্ছে, বেলুনের মত ফুলে উঠছে ফুসফুস, দৃষ্টি হয়ে উঠল ঝাপসা, পায়ে শক্তি নেই। ধোঁয়ার ভেতর লোকজনের আকৃতি বিকৃত ও বেঢপ লাগছে রানার। সৈন্যরা সবাই গ্যাস মাস্ক পরে আছে, সেটাই কারণ। হঠাৎ রানা খেয়াল করল, গার্ডদের ইউনিফর্ম সব সাদা হয়ে গেছে। এই গ্যাস নিশ্চয়ই কবীর চৌধুরীর নিজস্ব আবিষ্কার, রঙ চেনার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

বুকে তীব্র ব্যথা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, বুঝতে পারছে চন্দনাকে বৃথাই খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে, আর খুব বেশি হলে এক মিনিট পরই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে ও। ঘুরল, দম আটকে আবার ছুটল। ধোঁয়ায় দেখতে না পেলেও আন্দাজ করল গেটের দিকেই যাচ্ছে ও।

গেট নয়, প্রথমে লম্বা শেডটা দেখতে পেল রানা। ওটাকে পাশ কাটাতে পারলেই সামনে পড়বে গেট। জানে ওখানে কোন

গার্ড নেই।

কিন্তু শেডের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হলো না, বুক ও গলা দু'হাতে খামচে ধরে ঢলে পড়ল রানা। গ্যাস মাস্ক পরা একজন গার্ড ছুটে এল ওর সাহায্যে। রানা অনুভব করল ওর ভারী শরীরটা টেনে শেডের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে গার্ড, কিন্তু শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

চন্দনা তার এই মাস্ক একজন গার্ডকে মেরে সংগ্রহ করেছে। রানাকে এত ভারী লাগছে তার, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করল দু'জন ধরা পড়ার চেয়ে একজনের অন্তত পালানো উচিত। কিন্তু যুক্তি মানতে রাজি নয় তার মন গ্যাস মাস্কটা খুলে দ্রুত হাতে রানার মুখে পরাল সে, তারপর আবার ওকে টানতে শুরু করল। শেডটা কিভাবে পার হয়ে এসেছে বলতে পারবে না সে। ফাঁকা গেট দিয়েও বেরিয়ে আসতে পারল, কিন্তু তারপরই জ্ঞান হারিয়ে ঢলে পড়ল রানার ওপর।

আট

প্রথমে রানা অনুভব করল শরীরের ত্বক শিরশির করছে, শীত লাগলে যেমন হয়। তারপর অসহ্য উজ্জ্বল একটা আলো ওর বন্ধ চোখ দুটোকে যেন পুড়িয়ে দিতে চাইল। ইচ্ছে করছে না, তবু জোর করে তাকাল ও। কয়েক সেকেন্ড অন্ধ মনে হলো নিজেকে, প্রখর আলোয় ধাঁধিয়ে গেছে চোখ। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে পানি মুছল পাতা থেকে, কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তোলার চেষ্টা করল।

আকৃতিগুলো ধীরে-ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে।

খুব বড় একটা কামরার ভেতর রয়েছে ও। এককোণে একটা ফ্লাডলাইট জ্বলছে। আবার চোখের পানি মুছল। এবার বুঝতে পারল চামড়া শিরশির করছে কেন। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র ও, শুয়ে আছে একটা কটে। ওর পায়ের দিকে, পাঁচ-সাত হাত দূরে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে বন্দনা, চিবুকটা ঠেকে আছে বুকে। চেয়ারের সঙ্গে তার হাত-পা বাঁধা। চোখ ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল রানা। চন্দনাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ওর দৃষ্টি আবার চেয়ারটার দিকে ফিরল। ধীরে-ধীরে মুখ তুলল মেয়েটা, সরাসরি ওর দিকে তাকাল। নিজের ভুলটা ধরে ফেলল রানা। চেয়ারে ও বন্দনা নয়, চন্দনা।

তাহলে বন্দনা কোথায়?

উঠে বসল রানা, পা দুটো ঝুলিয়ে দিল কট থেকে। আড়ষ্ট ভাবটা দূর করার জন্যে ঘাড় ও কাঁধের পেশী টান-টান করল বার কয়েক। বুকটা ভার হয়ে আছে, শ্বাস-প্রশ্বাস এখনও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। সরাসরি তাকায়নি রানা, তবে দেখে নিয়েছে কামরার ভেতর চারজন সশস্ত্র গার্ড দাঁড়িয়ে আছে। একটা দরজা খোলার শব্দ হতে ঘাড় ফেরাল ও। একজন টেকনিশিয়ান ঢুকছে ভেতরে, ঠেলে আনছে একটা পোর্টেবল এক্স-রে মেশিন।

টেকনিশিয়ানের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন চীনা বিজ্ঞানী। লোকটা দশাসই, হাঁটাচলার মধ্যে যান্ত্রিক একটা ভাব, যেন প্রতি পদক্ষেপে মৃদু ঝাঁকি খাচ্ছে। পরনে লম্বা সাদা ল্যাবরেটরি কোট। কামরার মাঝখানে থেমে রানার দিকে তাকাল সে, হাসল। হাসি নয়, যেন রাবার টেনে লম্বা করা হলো। এবার চিনতে পারল রানা—লোকটা আসলে মুখোশ পরে আছে। কোন সন্দেহ নেই, ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আদি ও অকৃত্রিম কবীর চৌধুরী।

'তোমার কি লজ্জা বলে কিছু নেই?' তিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল

রানা। 'কোনদিনই শিক্ষা হবে না?'

কবীর চৌধুরীর চীনা মুখে বিস্ময়ের ধাক্কাটা ফুটল না। তবে চোখ দুটো একটু বড় হলো, বোঝা গেল রানা অকস্মাৎ বিস্ফোরিত হওয়ায় অবাক হয়েছে সে। তারপর তার চোখ দুটো দপ করে জ্বলে উঠল যেন। রানা জানে, এখুনি কঠিন ও ভারী শব্দ দিয়ে তৈরি দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু হবে।

তার আগে আরও কয়েকটা কথা বলে মনের ঝাল মেটাতে চাইছে রানা। 'বিজ্ঞান নিয়ে সাধনার কথা বলে, মানবকল্যাণের অজুহাতে দেশ ও দুনিয়ার কম ক্ষতি করোনি তুমি। উদ্ভট আইডিয়ার পিছনে ছুটেছ, রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুঠ করেছ, এক্সপেরিমেন্টের নামে নিরীহ মানুষ খুন করেছ, ক্ষমতার লোভে ষড়যন্ত্র করে সরকার উৎখাত করেছ। এতকিছু করেও, কোন সাফল্য কি ধরে রাখতে পেরেছ? তোমার প্রতিটি অপারেশন আমরা ব্যর্থ করে দিয়েছি। কিসের বিজ্ঞানী, তুমি একটা ক্রিমিনাল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছ গোটা দুনিয়ায়। অথচ তারপরও তোমার শিক্ষা হয়নি। এখন আবার বেইজিংকে বোকা বানিয়ে...'

ধীরে ধীরে হাত দুটো বুকে ভাঁজ করল কবীর চৌধুরী, স্বভাব-সুলভ জলদগম্ভীর গলায় বলল, 'বেইজিং নেতৃবৃন্দ আমাকে পরম বন্ধু বলে জানেন, তাঁদেরকে বোকা বলে তুমি আসলে আমাকে অপমান করছ, রানা!'

রানা কিছু বলতে গিয়েও পারল না, কবীর চৌধুরী গর্জে উঠল।

'খামোশ! এতক্ষণ তুমি বলেছ, এবার আমি বলব।' দীর্ঘ পদক্ষেপে পায়চারি শুরু করল সে, তবে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'অতীত? অতীত আমি অস্বীকার করি। আমি প্রতিদিন নতুন করে বাঁচি। বর্তমান আমার প্ল্যাটফর্ম, ভবিষ্যৎ আমার টার্গেট।' হঠাৎ মুষ্টিবদ্ধ একটা হাত মাথার পাশে তুলে ঝাঁকাল সে। 'আমার এই বাহুতে এখন এতই ক্ষমতা যে, তোমার

মত লোককে আমি পিঁপড়ের চেয়েও তুচ্ছ জ্ঞান করি। খবরদার, বলছি! আমার নতুন আইডিয়া, বিজ্ঞানসাধনা আর মানবকল্যাণ নিয়ে বিদ্রূপ করা হলে আমি তা সহ্য করব না। যে লোক চিরটা কাল মূর্খ হয়ে থাকার পণ করেছে, এ-সবের মর্ম সে কি বুঝবে! এখন নামো, এক্স-রে মেশিনের পিছনে এসে দাঁড়াও।'

'কেন?'

'এইমাত্র খবর পেলাম তোমার হিপে নাকি একটা ভয়েস অ্যাকটিভেটর সিগন্যল ইউনিট আছে। আর পাউচে আছে শেভিংক্রীমের একটা ক্যান। তোমার কাপড়চোপড়ের সঙ্গে ক্যানটা আগেই আমরা পেয়েছি, এখন সেটা ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে পরীক্ষা করে দেখার জন্যে। সত্যি ওটা নিউক্লিয়ার ডিভাইস কি না একটু পরই জানা যাবে। তার আগে এক্স-রে করে সিগন্যল ইউনিট সম্পর্কে নিশ্চিত হই আমরা।'

রানার মনে একটা ভয় জাগল, তবে একটু পরই সেটা অমূলক প্রমাণিত হলো। টেকনিশিয়ান লোকটা শুধু ওর হিপ-এর এক্স-রে করল, শরীরের আর কোথাও কিছু আছে কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না।

আসলে একটা নয়, দুটো শেভিং ক্রীমের ক্যান সঙ্গে করে এনেছে রানা। দুটো হুবহু একই রকম দেখতে, মোচড় দিয়ে সাত ভাগে ভাগ করা যায়, তবে দ্বিতীয়টায় কোন নিউক্লিয়ার ডিভাইস নেই। হংকঙে এই দ্বিতীয় ক্যানটাই চন্দনাকে দেখিয়েছিল রানা—ভেবেছিল, চুরি গেলে নকলটাই যাক।

কাজ শেষ করে রানাকে ওর নিজের কাপড়চোপড় অর্থাৎ শার্ট, ট্রাউজার আর জ্যাকেট পরতে দিল টেকনিশিয়ান। রানা ওগুলো পরছে। পিস্তল, ছুরি, বেল্টে লুকানো খুদে কিছু অস্ত্র, সবই সরিয়ে ফেলা হয়েছে। চোখাচোখি হতে গম্ভীর হলো কবীর চৌধুরী। 'এত বড় বড় কথা বলো, অথচ নিজে তুমি কি, ভেবে দেখেছ কখনও? আমার পাঁচজন গার্ডকে খুন করেছ তুমি। তাদের মধ্যে দু'জনকে

খুন করেছ শুধু ইউনিফর্মের লোভে...'

তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'বন্দনা কোথায়, কবীর চৌধুরী?'

দু'সেকেন্ড রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল কবীর চৌধুরী। তারপর বলল, 'এ প্রশ্নের উত্তর তোমার মুখ থেকেই জানতে চাই আমি, রানা। শোনা যাক, তার সম্পর্কে কতটুকু কি জানো তুমি।'

'আমি শুধু এটুকু বলতে পারি, বন্দনা তোমার এজেন্ট,' বলল রানা, আঁতকে ওঠার শব্দ পেয়েও চন্দনার দিকে তাকাচ্ছে না। 'তাকে তুমি এখানে আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়েছিলে । এই মুহূর্তে তোমার বিলাসবহুল কোয়ার্টারে বিশ্রাম নিচ্ছে সে।'

দরাজ গলায় হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। 'তোমার আন্দাজ আংশিক সত্য, রানা। হ্যাঁ, বন্দনা আমারই এজেন্ট ছিল। কিন্তু পরে সে ডাবল এজেন্ট হয়ে গেছে। এটা তার প্রথম অপরাধ।'

'একটু খুলে বলো। ডাবল এজেন্ট মানে?'

'তাকে যখন আমি প্রস্তাব দিই তখনই বলে দিয়েছিলাম, আমার হয়ে কাজ করতে চাইলে শুধু আমার স্বার্থ দেখতে হবে, ভারতীয় স্বার্থরক্ষার জন্যে কিছুই করতে পারবে না। কিন্তু তোমাকে এসকর্ট করে এখানে নিয়ে আসার কাজটা হাতে পেয়েই ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যে উঠে পড়ে লাগে সে। প্রথম সুযোগেই হংকঙে খুন করে ফেলল আইএসআই-এর দু'জন এজেন্ট, আসগর আর কাইয়ুমকে। আরও শুনবে, কত বড় বোকা সে? আমার এক এজেন্ট চন্দনার গলায় ছুরি ধরেছিল, মনে পড়ে? বন্দনার বোন হতে পারে, কিন্তু আমি চন্দনাকে শুধু ভারতীয় এজেন্ট হিসেবেই দেখি। সেই ভারতীয় এজেন্টকে বাঁচাবার জন্যে বন্দনা কি করল? আমারই লোক হয়ে পিছন থেকে ছুরি মেরে খুন করে বসল আমার সেই বিশ্বস্ত এজেন্টকে।'

আইএসআই এজেন্ট আসগর ও কাইয়ুমকে যে বন্দনা খুন করেছে, এমন কোন তথ্য-প্রমাণ পায়নি রানা; যদিও পরে একসময় উপলব্ধি করে যে ওদেরকে খুন করার সুযোগ বন্দনার ছিল। কবীর চৌধুরীর কথা শুনে ব্যাপারটা সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া গেল। তবে বন্দনা যে কবীর চৌধুরীর হয়ে কাজ করছে এটা রানা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারে লাউ ঝেমির জাঙ্কে। সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও কবীর চৌধুরীর অন্তত দু'জন এজেন্টকে খুন করেনি সে। একজনের গলায় তার পেঁচিয়েছিল। দ্বিতীয়জনকে রানার বুক থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামায়। এ-সব ছিল তার অভিনয়, রানা যাতে তাকে সন্দেহ করতে না পারে। পরে ওই দু'জন লোক আবার হামলা চালায়। তবে এ-ও ঠিক যে কবীর চৌধুরীর একজন এজেন্টকে বন্দনা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছিল ওই জাঙ্কে। আসলে চন্দনাকে বাঁচানোর জন্যে এই খুনটা না করে উপায় ছিল না তার।

'তোমার বোধহয় একটু ভুল হচ্ছে,' কবীর চৌধুরীকে বলল রানা, আড়চোখে তাকিয়ে দেখল নিঃশব্দে কাঁদছে চন্দনা। 'আসগর আর কাইয়ুমকে বন্দনা ভারতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্যে খুন করেনি। খুন করেছে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে। যেভাবেই হোক ওরা জেনে ফেলে যে বন্দনা তোমার হয়ে কাজ করছে। আসগর এই তথ্যটা আমাকে দেয়ার চেষ্টা করছিল, বুঝতে পেরে বন্দনা তাকে খুন করে। তথ্যটা হয়তো কাইয়ুমও জানে, এই সন্দেহে তাকেও খুন করে সে।'

'ওর বোকামির কোন শেষ নেই,' বলল কবীর চৌধুরী। 'ও আমার হয়ে কাজ করছে, এটা আসগর ও কাইয়ুম যদি জেনে থাকে, সেজন্যে ও-ই দায়ী। সে যাই হোক, এবার ওর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অপরাধের কথা শোনো।

'দ্বিতীয় অপরাধ হলো, ওকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম সেটা পালন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। কি দায়িত্ব দিয়েছিলাম? শুধু

তোমাকে এসকর্ট করে নিয়ে আসবে? না। ওকে একটা খুদে রেডিও দিয়ে বলা হয়েছিল, তোমরা কখন কোথায় থাকো দু'ঘণ্টা পর-পর আমাকে জানাতে হবে। তা সে জানায়নি, তাকে সার্চ করে এমনকি রেডিওটাও পাওয়া যায়নি। ইন্টারোগেটরকে বলছে, ওটা নাকি সঙ্গে করে আনতে ভুলে গেছে। তুমিই বলো, এ-ধরনের গাফিলতি ক্ষমা করা যায়? তোমার সঙ্গে আমার এজেন্ট রয়েছে, অথচ আমি জানতেই পারলাম না তুমি আমার মিসাইল ঘাঁটিতে ঢুকে পড়েছ!

'তৃতীয় অপরাধ...'

খুক করে কেশে কবীর চৌধুরীর সামনে চলে এল টেকনিশিয়ান, এক্স-রে রিপোর্টটা দেখাতে চায়। রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে তিক্ত হাসল কবীর চৌধুরী। 'নেহাতই নিরীহ শ্র্যাপনেল। তবে আমি কোন ঝুঁকি নেব না। অপারেশন করে বের করব ওগুলো।

'তো যা বলছিলাম। বন্দনার তৃতীয় অপরাধ। আজও সে প্রফেশনাল হতে পারেনি: ভেবে দেখো না, তা না হলে কি বিশ্বাস করে যে এক ঘণ্টা পর সে ডাইভারশন ক্রিয়েট করলে তোমরা কমপাউন্ডে ঢোকার চেষ্টা করবে? চতুর্থ অপরাধ, পিছনদিকের গেটে পৌঁছাতে তার প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লাগে—কেন, কাঁটাতারের বেড়ার কাছে এসে গার্ডদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারত না? তাতে অন্তত ত্রিশ মিনিট সময় বাঁচত। তার অপরাধ আসলে গুনে শেষ করা যাবে না। গেটে পৌঁছে আমার সঙ্গে নয় সে দেখা করতে চায় আমার অফিসারদের সঙ্গে। তাদেরকে সে অনুরোধ করে, তারা যেন তার হয়ে আমাকে সুপারিশ করে ভারতকে রেহাই দেয়ার জন্যে। এ-সব শুনে আমার সন্দেহ হলো ও নিশ্চয়ই বন্দনা নয়, চন্দনা। মনিটর স্ক্রীনে ওকে দেখেও চিনতে পারলাম না, দুই বোন তো একই রকম দেখতে। তারপর কোড নাম্বার শুনে নিশ্চিত হলাম—না, ও বন্দনাই, তবে নেমকহারামী

শুরু করেছে।'

'তোমার এতসব অভিযোগের উত্তরে কি বলছে বন্দনা?'

'তুমি ভেবেছ তাকে আমি কিছু বলার সুযোগ দিয়েছি?' মাথা নাড়ল কবীর চৌধুরী। 'ওদেরকে বলে দিয়েছি, আমি তার মুখও দেখতে চাই না!'

'তোমার সঙ্গে তার এখনও দেখাই হয়নি?'

'না। দেখা হবেও না। স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের অফিসারদের আগেই বলা ছিল, তারা তাকে টরচার চেম্বারে নিয়ে গিয়ে ইন্টারোগেট শুরু করে। ওখান থেকেই মাঝে-মধ্যে দু'একটা তথ্য পাচ্ছি...'

হঠাৎ আবার ফুঁপিয়ে উঠল চন্দনা।

ঝট করে তার দিকে ফিরে কবীর চৌধুরী কর্কশ গলায় বলল, 'বোনের দুঃখে কাঁদছ, মাই ডিয়ার লেডি? স্রেফ পানির অপচয়। তারচেয়ে নিজের দুঃখে কাঁদার জন্যে প্রস্তুত হও। কারণ ওই টরচার চেম্বারে তোমাকেও একটু পর পাঠানো হবে...'

'কেন, কি করেছে ও?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'যদি কিছু জানার থাকে তো আমাকে প্রশ্ন করো।'

সাদা অ্যাপ্রন পরা একজন ল্যাব কর্মী ঢুকল কামরায়। তার হাতে একটা শেভিং ক্রীমের ক্যান দেখা যাচ্ছে, সাত ভাগ করা। ওগুলোর সঙ্গে একটা কাগজও রয়েছে হাতে। 'স্যার, ল্যাব রিপোর্ট।'

রিপোর্টটা নিয়ে পড়ল কবীর চৌধুরী। 'ক্যানের টুকরোগুলোয় নির্ভেজাল ক্রীমই পাওয়া গেছে। কোন নিউক্লিয়ার ডিভাইস পাওয়া যায়নি। তার মানে বন্দনার দেয়া ইনফরমেশন ভুল। শুধু এই অপরাধেই আমি মনে করি তার মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত।' হাত ঝাঁকিয়ে ল্যাব কর্মীকে বিদায় করে দিল। রানাকে বলল, 'নিউক্লিয়ার ডিভাইসই যেখানে নেই, তাহলে আর সিগন্যাল ইউনিট থাকে কি করে? কাটাছেঁড়ার কষ্ট থেকে আপাতত তোমার

নিতম্ব রক্ষা পেল।' একটু থেমে চন্দনার দিকে তাকাল সে। 'তবে তোমার বিপদ বাড়ল, মাই ডিয়ার লেডি।'

'তোমাকে না বললাম, কিছু জানার থাকলে আমাকে প্রশ্ন করো!'

হাসল কবীর চৌধুরী। 'তুমি কি সত্যি কথা বলবে, রানা? ঠিক আছে, দেখা যাক। আমার প্রথম প্রশ্ন, রানা। জানা কথা, আমার মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্যেই এসেছ তুমি। আমি জানতে চাই, কিভাবে ধ্বংস করতে চেয়েছিলে?'

'আমরা মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস করতে এসেছি, তোমার এই ইনফরমেশন বা ধারণা ঠিক নয়,' বলল রানা। 'এই মিসাইল সম্পর্কে বিসিআই ও আইসিআই কোন তথ্য পায়নি, শুধু গুজব শুনেছে। আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে গুজবটা সত্যি কি না জানার জন্যে। অপারেশনাল মিসাইল যদি পাই, মেসেজ পাঠিয়ে কর্তৃপক্ষকে জানাব আমরা, তারপর ভারত ও বাংলাদেশ সরকার যৌথভাবে বেইজিংকে তোমার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অভিযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলবে। আমার কাছে একটা রেডিও আছে—পাহাড়ে লুকিয়ে রেখে এসেছি। ঠিক কোথায় বলা সম্ভব নয়, তবে সঙ্গে লোক পাঠালে জায়গাটা চিনিয়ে দিতে পারব।'

'গুরুত্বহীন,' মন্তব্য করল কবীর চৌধুরী। 'ওটা ওখানেই মরচে ধরে নষ্ট হোক। মিসাইল ঘাঁটি গুজব নয়, এটা তো তোমরা পাহাড় থেকে দেখেই বুঝতে পেরেছ, কমপাউন্ডে ঢুকলে কেন?'

'ঘাঁটির অস্তিত্ব গুজব নয়, বুঝলাম,' বলল রানা, 'কিন্তু মিসাইলগুলো ডামি কি না কাছ থেকে না দেখে বুঝব কিভাবে?'

'মিসাইল ডামি হবে কেন?'

'ট্রেনিঙের কাজে নকল মিসাইল ব্যবহার করতে দেখেছি আমি—পাকিস্তানে, ইসরায়েলে...'

'বেশ বিশ্বাসযোগ্য একটা গল্প।' হাসল কবীর চৌধুরী। 'তবে চন্দনার দুর্ভাগ্য যে গল্পটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'কেন?'

'নিরেট তথ্য না পেলে বিসিআই অন্তত তাদের সেরা এজেন্ট মাসুদ রানাকে পাঠাত না। আর বেইজিংকে বলে কোন লাভ হবে না, এ-ও তোমাদের সরকার খুব ভাল করে জানে। চীন সরকার আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বিশ্বাসই করবে না। তারমানে, এটাও মিথ্যে কথা। তুমি মিসাইল ঘাঁটি ধ্বংস করতেই এসেছ, রানা। কিভাবে ধ্বংস করবে, তাও আগে থেকে ঠিক করা আছে। সেই তথ্যটাই চন্দনার পেট থেকে বের করা হবে।'

'কেন ভাবছ গোপন সেই তথ্যটা চন্দনা জানে?'

'না জানলেও টরচার করা হবে ওকে, ওর কষ্ট দেখে তুমি যাতে আমাকে সত্যি কথাটা বলো।' আবার হাসল কবীর চৌধুরী। 'ইতিমধ্যে এ খবরও আমি পেয়েছি যে চন্দনা নাকি তোমার প্রতি সাংঘাতিক দুর্বল—বন্দনার ভাষায়, তোমার অন্ধ ভক্ত সে।'

কবীর চৌধুরী বা বন্দনা, কারও মাথাতেই এ চিন্তাটা আসছে না যে ধরা পড়ার আগেই নিউক্লিয়ার ডিভাইসগুলো জায়গামত বসাবার কাজ শেষ করেছে ওরা। এর কারণও আছে, দু'জনেই ওরা ধরা পড়েছে কমপাউন্ডের বাইরে। এই ব্যাপারটা রানার মনে যে স্বস্তি এনে দিয়েছিল, চন্দনাকে ইন্টারোগেট করা হবে শুনে তা কর্পুরের মত উবে গেছে। কবীর চৌধুরীর মাথায় কুবুদ্ধির অভাব নেই, তার নিষ্ঠুরতারও কোন সীমা নেই; নির্যাতনের এমন পদ্ধতি ব্যবহার করবে সে, চন্দনা মুখ না খুলে থাকতে পারবে না।

রানা উপলব্ধি করল, ভয়ঙ্কর একটা পরিস্থিতির উদয় হতে যাচ্ছে। চন্দনা মুখ খোলার আগেই, কিংবা সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের সবচেয়ে কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে। খুদে নিউক্লিয়ার ডিভাইসগুলো মাটির তলা থেকে বের করে সরিয়ে ফেলার সুযোগ কবীর চৌধুরীকে দেয়া যাবে না, সেরকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে দেখলে ওগুলো ফাটিয়ে দিতে হবে ওকে। সাতটা বিস্ফোরণ গোটা কমপাউন্ডকে স্রেফ ধুলো, ধোঁয়া আর আগুনের কুণ্ডে পরিণত

করবে। একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত বাঁচবে না। বাঁচবে না চন্দনা। বাঁচবে না ও নিজেও।

একদিকে নিজের ও চন্দনার প্রাণ, আরেক দিকে সাতটা দেশের দেড়শো কোটি মানুষের জীবন।

'রানা, সাবধান!' চেঁচিয়ে উঠল চন্দনা।

অন্যমনস্ক রানা খেয়াল করেনি, গার্ডদের নিঃশব্দে কিছু একটা ইঙ্গিত করেছে কবীর চৌধুরী। চন্দনার চিৎকার শুনে মাত্র ঘুরতে শুরু করেছে ও, নিতম্বের ওপরে লাগল গার্ডের বুট পরা লাথি। ছিটকে পড়ে গেল রানা, আরেকজন গার্ড ছুটে এসে সর্বশক্তি দিয়ে লাথি মারল ওর পাঁজরে। শরীরটা গড়িয়ে দিয়ে সরে যাবার চেষ্টা করল ও, এবার কবীর চৌধুরী নিজেই নকল পা দিয়ে লাথি চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে।

'উফ! বাবারে!' খোঁড়াতে-খোঁড়াতে পিছিয়ে গেল সে। 'দিস ইজ ব্যাড, রানা! তোমার ঘাড়ের ওপর ইস্পাতের মাথা বসিয়ে রেখেছ। আমার পা-টা বোধহয় ফেটেই গেল! এই, সং সেজে দাঁড়িয়ে আছ কেন তোমরা? বদলা নাও!'

চারজন শক্ত-সমর্থ গার্ডের বিরুদ্ধে একা রানা কি করতে পারবে। ডিফেন্স বাদ দিয়ে অফেন্স শুরু করলেও কোন লাভ নেই, কারণ ওদের সঙ্গে অস্ত্র রয়েছে। তারচেয়ে মার খেয়ে জ্ঞান হারানোটাই কৌশল হিসেবে ভাল।

'পায়ে মারো!' নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। 'উল্টো করা রাইফেল দিয়ে মারো! কত্তো বড় সাহস, আমার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করছে কিভাবে আমার সর্বনাশ করা যায়! শুধু কি তাই? মনে মনে আমাকে শালা-বানচোত বলে গালও দেয়া হচ্ছে!'

রাইফেলের বাড়ি আর বুট জুতোর লাথি বিরতিহীন শুরু হলো টরচার করার ট্রেনিং পাওয়া লোক ওরা, জ্ঞান হারিয়ে রানাকে মুক্তি পেতে দেবে না—প্রতিটি মার হিসাব করা—মাপা, দীর্ঘ একটা সময় ধরে সহ্যসীমার মধ্যেই ব্যথা দেবে, কোন হাড়

ভাঙবে না। ওদের এই চালাকি ধরতে রানার খুব বেশি সময় লাগল না। জ্ঞান হারিয়ে মুক্তি পাবার আশা যখন নেই, ওর মাথায় বিকল্প চিন্তা ভিড় করল। সর্বশেষ সমাধান হিসেবে নিউক্লিয়ার ডিভাইসগুলো অ্যাকটিভেট করার রাস্তা তো খোলাই আছে। মরতে হয় মরবে, দরকার হলে তাও করবে রানা। তবে তার আগে আরও একটা কাজ করতে পারে রানা। কবীর চৌধুরীকে এখানে, এই মুহূর্তে খুন করার একটা উপায় আছে।

দু'হাতে মাথা ঢেকে কামরার মেঝেতে গড়াগাড়ি খাচ্ছে রানা, লক্ষ রাখছে কে কখন লাথি মারছে আর কে কখন উল্টো করা রাইফেল চালাচ্ছে। অকস্মাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল ওর শরীরে। একটা রাইফেল ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। ওর শরীরের ওপর দিয়ে উড়ে গেল লোকটা, রাইফেল ছেড়ে দিয়েছে। এক লাফে সিধে হলো, রাইফেলটা সরাসরি তাক করে আছে কবীর চৌধুরীর বুকে।

বুকে ঠেকা রাইফেলের দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। চোখ দুটো বিস্ফারিত। আড়চোখে গার্ডদের দিকে তাকাল সে, প্রত্যেকের হাতের রাইফেল উল্টো করে ধরা।

'আই সারেন্ডার,' বলল সে। 'প্লীজ, রানা, গুলি কোরো না!'

'রাইফেল ও পিস্তল ফেলে দিতে বলো ওদেরকে,' বলল রানা, হাঁপাচ্ছে, ব্যথা সহ্য করার চেষ্টায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ।

'অস্ত্র ফেলে দাও তোমরা,' শুকনো গলায় নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী। গার্ডরা ইতস্তত করছে দেখে বাঘের মত গর্জে উঠল সে, 'তোমরা আমাকে খুন করতে চাও নাকি? যার কাছে যা আছে সব ফেলে দাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের রাইফেল মেঝেতে নামিয়ে রাখল গার্ডরা। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল, উল্টো করে ধরে সেগুলোও নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

'দেয়ালের সামনে চলে যাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'মাথার

পিছনে হাত তুলে দাঁড়াও, আমার দিকে পিছন ফিরে।'

গার্ডরা আবার ইতস্তত করছে দেখে কবীর চৌধুরী ম্লানকণ্ঠে বলল, 'ওর প্রতিটা নির্দেশ এখন আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। যাও, যা বলছে করো।'

গার্ডরা দেয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'এখন যাই ঘটুক, কেউ পিছন ফিরে তাকাতে পারবে না,' বলল রানা। 'গুলির শব্দ হলেও না। যে তাকাবে তাকেই আমি খুন করব।'

'গুলির শব্দ হবে?' কবীর চৌধুরীর গলায় অবিশ্বাস। 'রানা, তুমি কি সত্যি আমাকে খুন করতে যাচ্ছ?'

হাসল রানা। 'আমার ট্রেনিং সম্পর্কে তোমার পরিষ্কার ধারণা আছে, কবীর চৌধুরী। আমার প্রফেশনে সুযোগ হাতছাড়া করা শুধু বোকামি নয়, অপরাধ নয়, তারচেয়েও বড়–পাপ।'

'তাহলে কি আমি ধরে নেব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা এভাবে শেষ হয়ে যাবে? এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান মাত্র একটা বুলেটে ধ্বংস হয়ে যাবে? নিয়তির এ কেমন বিচার, বলো তো? মানুষকে এই মাটির পৃথিবীতেই স্বর্গ উপহার দিতে চেয়েছিলাম আমি। বিজ্ঞান তা পারে। কবীর চৌধুরী তা পারে। অথচ সেই কবীর চৌধুরীর বুকে রাইফেল ধরেছ তুমি। ভাবো রানা, চিন্তা করো–আমাকে খুন করা আর ছ'শো কোটি মানুষকে স্বর্গ থেকে বঞ্চিত করা কি এক কথা নয়?'

'তোমার এই অসার বক্তৃতা আমি অনেক শুনেছি,' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলে শেষবারের মত স্মরণ করো তাকে, চৌধুরী। এখন থেকে ঠিক দশ সেকেন্ড পর আমি গুলি করব।'

'তবে তাই হোক, চালাও গুলি!' গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী, কামরার ভেতর তার ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল। 'এ তোমারই দুর্ভাগ্য যে, ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পাপ নিয়তি

তোমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। চালাও গুলি, চালাও!'

কবীর চৌধুরীর অতি নাটকীয়তা রানার মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলল 'এটা তোমার একটা কৌতুক, আমাকে তুমি বোকা বানিয়েছ রাইফেলটা সিলিঙের দিকে তুলে ট্রিগার টেনে দিল রানা।

অট্টহাসিতে ভরে উঠল কামরার বাতাস। একা শুধু কবীর চৌধুরী নয়, তার সঙ্গে চারজন গার্ডও দাঁত বের করে হাসছে।

হাতের রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিল রানা, ওটায় বুলেট নেই। গার্ডরা আগেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে, শরীরের গোপন জায়গা থেকে তাদের হাতে বেরিয়ে আসছে চকচকে পিস্তল।

'আজও তুমি আমার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীই আছ কিনা, সেটাই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম, রানা,' হাসি থামিয়ে ভারী গলায় বলল কবীর চৌধুরী। 'পরীক্ষায় তুমি পাস করেছ। যত চেষ্টাই করি, অন্তত এ জন্মে তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে পাব না, জানি। তবে এ-কথা স্বীকার করতে আমি কুণ্ঠিত নই যে শত্রু হিসেবেও তুমি আমার শ্রদ্ধা পাবার যোগ্য। আই স্যালুট ইউ, মাই ডিয়ার এনিমি রিয়েলি, বিলিভ ইট অর নট, তোমাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত। এমন ক্ষুরধার উপস্থিত বুদ্ধি ক'জনের হয়! একেবারে শেষ মুহূর্তে হলেও, ঠিকই ধরে ফেলেছ রাইফেলে গুলি নেই। তবে একটা প্রশ্ন, রানা। যদি জানতে বুলেট আছে, তুমি কি শেষ পর্যন্ত গুলিটা আমাকে করতে? দিস ইজ দা মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন। সত্যি তুমি গুলি করতে?'

'করতাম,' বলল রানা।

মাথা নত করে রানাকে অভিবাদন জানাল কবীর চৌধুরী। 'অকপটে সত্যি কথা বলার জন্যে ধন্যবাদ। আমি তোমার সাহসেরও ভূয়সী প্রশংসা করি।'

ব্যাপারটাকে যদি আবেগ বলা হয়, নিজেকে কবীর চৌধুরী সেটা

থেকে দ্রুতই মুক্ত করে নিল। আবার গম্ভীর হয়ে উঠল সে, সেই সঙ্গে অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল। 'তোমাকে লোভনীয় একটা প্রস্তাব দিই, রানা। ভেবে দেখো গ্রহণ করবে কিনা।'

'কি প্রস্তাব?'

'তার আগে তোমাকে আমি এভাবে চিন্তা করতে বলি–তিনজনই তোমরা ধরা পড়ে গেছ, তোমাদের সঙ্গে কোন রেডিও বা বীপার নেই যে কাউকে কোন মেসেজ দিতে পারবে, ঘাঁটি ধ্বংস করার জন্যে যে-সব উপকরণ নিয়ে এসেছ সে-সব এই মুহূর্তে তোমাদের সঙ্গে নেই, যেখানে রেখেছ সেখান থেকে নিয়ে আসাও সম্ভব নয়–সব মিলিয়ে তোমাদের মিশন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে; কাজেই, উপকরণগুলো কোথায় রেখেছ বলে দিয়ে নির্যাতন এড়িয়ে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'তোমার প্রস্তাবটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'উপকরণগুলো কোথায় আছে বলো আমাকে, বিনিময়ে আমি তোমাদের দু'জনকে নিজের অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাব। ওটা আমার বাড়িও। অত্যাধুনিক সমস্ত ফ্যাসিলিটি পাবে ওখানে। আমার অপারেশন শুরু হতে আরও তিন দিন বাকি, এই তিনদিন তোমরা দু'জন চুটিয়ে প্রেম করতে পারবে। বন্দী নয়, আমার মেহমান হিসেবে ওখানে থাকবে তোমরা। এবং কথা দিচ্ছি, আমার অপারেশন শেষ হলে তোমাদেরকে মুক্তি দেয়া হবে, যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে। আর উপরি পাওনা হিসেবে দেখতে পাবে, কত সহজে সাতশো বিলিয়ন ডলার আয় করি...'

'তোমার অপারেশনাল হেডকোয়ার্টার বা বাড়ি, কোথায় সেটা?' রানা উত্তেজিত, তবে চেহারা বা গলার আওয়াজে সেটা বুঝতে দিল না। কবীর চৌধুরী পাহাড়ের ওপর চীনা স্থাপত্য রীতিতে তৈরি দালানটার কথা বলছে। কমপাউন্ড থেকে যথেষ্ট দূরে ওটা, বিস্ফোরণের ফলে ওটার কোন ক্ষতিই হবে না। চন্দনাকে নিয়ে ওখানে যেতে পারলে নিউক্লিয়ার ডিভাইসগুলো

ফাটাতে আর কোন বাধা থাকে না।

'কাছেই, পাহাড়ের মাথায়,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তুমি ফালতু প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করছ। আমার কথার জবাব দাও। তুমি রাজি?'

'যে জিনিস নেই সে জিনিস আমি তোমার হাতে তুলে দেব কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। প্রস্তাবটা রানা গ্রহণ করতে চায়, কিন্তু কবীর চৌধুরীকে সন্তুষ্ট করার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না।

কবীর চৌধুরী আরও গম্ভীর হয়ে গেল। 'তার মানে তুমি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করছ।'

কথা না বলে চিন্তা করছে রানা। হঠাৎ এমন চমকাল, কামরার ভেতর বোমা পড়লেও বোধহয় এরকম চমকাত না।

'মিস্টার চৌধুরী, আপনি আমার দিকে তাকান!' তীক্ষ্ণকণ্ঠে কথা বলে উঠল চন্দনা।

ঘুরল কবীর চৌধুরী। হেসে উঠল। 'ইয়ং লেডি, মনে হচ্ছে তোমার কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ, আছে,' বলল চন্দনা। 'রানাকে আপনি ভাল করেই চেনেন, বন্দী হয়েও হাল ছাড়ার পাত্র নয়। বোকার মত এখনও ভাবছে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে, ঘাঁটিটাও ধ্বংস করতে পারবে।'

'এরকম ভেবে থাকলে আমিও ওকে তোমার মত বোকাই বলব।'

'কিন্তু আমি জানি, মিশন ব্যর্থ হয়েছে,' বলল চন্দনা। 'তার ওপর, নির্যাতন যেহেতু আমার ওপর চালানো হবে, সব গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে নিজেকে আমি রক্ষা করতে চাই।'

'নট আ ব্যাড আইডিয়া!' মুখোশ পরে থাকায় মুখের ভাব দেখা গেল না, তবে কবীর চৌধুরীর কণ্ঠস্বরে উৎফুল্ল ভাব স্পষ্ট। 'গো অ্যাহেড।'

'চন্দনা, খবরদার!' রানার গলা কেঁপে গেল। 'তুমি যদি গোপন

তথ্য ফাঁস করো, তোমাকে আমি এই মুহূর্তে খুন করব!' এই মুহূর্তে খুন করবে বলে রানা যে নিউক্লিয়ার ডিভাইস অ্যাকটিভেট করার হুমকি দিচ্ছে, চন্দনার এটা না বোঝার কথা নয়।

'এই, ওকে বাঁধো তোমরা!' গার্ডদের নির্দেশ দিল কবীর চৌধুরী।

দু'জন গার্ড এগিয়ে এল, বাকি দু'জন তাদেরকে কাভার দিচ্ছে। ধস্তাধস্তি করে কোন লাভ হলো না, রানার হাত দুটো পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল তারা।

'হ্যাঁ,' তাগাদা দিল কবীর চৌধুরী, 'এবার তুমি নির্ভয়ে বলতে পারো।'

'রানা যে তখন আপনাকে বলল রেডিও আছে, মেসেজ পাঠাবে—এ-সব সত্যি নয়,' বলল চন্দনা। 'কিভাবে কি করা হবে সবই আমাকে বলেছে ও। বন্দনা যা বলছে সেটাই সত্যি। শেভিং ক্রীমের ক্যানে সত্যি নিউক্লিয়ার ডিভাইস নিয়ে এসেছে রানা। তবে ক্যান একটা নয়, দুটো।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং!' বলল কবীর চৌধুরী। 'আমরা তাহলে নকল ক্যানটা পেয়েছি। আসলটা কোথায়, চন্দনা?'

'আসলটা বন্দনা রানার পাউচ থেকে চুরি করেছিল। নিশ্চয়ই আপনাকে দেবে বলে...'

'কিন্তু বন্দনাকে সার্চ করে আমার অফিসাররা কিছুই পায়নি!'

'পাবে কি করে, আজ সকালে ঝর্নায় গোসল করতে গিয়ে ওটা আমি বন্দনার পাউচ থেকে চুরি করি...'

'তারপর কি করেছ? কোথায় রেখেছ?' কবীর চৌধুরী উত্তেজিত। 'তোমাকে সার্চ করেও তো কিছু পাওয়া যায়নি!'

'চন্দনা! চন্দনা!' হাহাকার করে উঠল রানা। 'একি সর্বনাশ করছ তুমি!'

'আমার কাছে থাকলে তো পাবেন,' হতাশ গলায় বলল চন্দনা, রানার কথা যেন শুনতে পায়নি। 'কোথায় আছে আমরা

জানি, কিন্তু সারাটা দিন গাধার খাটনি খেটেও উদ্ধার করতে পারিনি।'

'তারমানে? তুমি কি আমার সঙ্গে হেঁয়ালি করছ?' গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী।

'যা সত্যি তাই বলছি, মিস্টার চৌধুরী,' ম্লান গলায় বলল চন্দনা। 'চুরি করার পর ওটা নিয়েই গোসল করতে নামি আমি ঝর্নার পানিতে। কখন যে পড়ে গেছে, টেরও পাইনি। হঠাৎ দেখি কোমরে নেই ওটা। চুপি-চুপি রানাকে বললাম। দু'জন বুদ্ধি করে গুহায় পাঠিয়ে দিই বন্দনাকে—ওই গুহায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। তারপর পানির তলায় খুঁজতে শুরু করি ওটা। নিচে শুধু কাদা আর কাদা। পায়ে কিছু ঠেকলে যতবার তুলি, দেখি পাথর। সারাদিন চেষ্টা করেও পেলাম না ওটা।'

'টরচারের ভয়ে দেড়শো কোটি মানুষের সঙ্গে বেঈমানী করে বসলে!' রানাকে উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে।

আবার পায়চারি শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'ঝর্নাটা আমি দেখেছি। খুব ছোট নয়, তবে বেশি বড়ও নয়। পাম্প করে সমস্ত পানি সরিয়ে ফেলতে দিন দুয়েক লাগতে পারে। দরকার হলে আট-দশটা পাম্প ব্যবহার করা হবে।' হঠাৎ চন্দনার চেয়ারের সামনে থামল সে। 'তোমার কথার মধ্যে কিছু ফাঁক দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'ফাঁক?' চন্দনা ভুরু কোঁচকাল।

'নিউক্লিয়ার ডিভাইস ছাড়া ঘাঁটিতে রানা ঢোকার চেষ্টা করল কেন? কি অ্যাচিভ করতে চেয়েছিল ও?'

'আপনিই বলুন, এছাড়া আর কি করার ছিল ওর?' পাল্টা প্রশ্ন করল চন্দনা। 'আমাকে বলল, ভেতরে ঢুকে কবীর চৌধুরীকে জিম্মি করা ছাড়া আর কোন উপায় খোলা নেই...'

'বেশ, বুঝলাম' চন্দনার দিকে ঝুঁকে পড়ল কবীর চৌধুরী। 'সিগন্যাল ইউনিট? সেটা কোথায়? ওর হিপে, শ্র্যাপনেলের ভেতর লুকানো আছে?'

'বন্দনাকে রানা সত্যি কথাটা বলেনি, মিস্টার চৌধুরী। ওই ক্যানের ক্যাপেই লুকানো আছে সিগন্যাল ইউনিটটা।'

'বন্দনাকে বলল না, অথচ তোমাকে বলল?'

'আমার সঙ্গে ওর বিশেষ একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে...' বাকিটা আর শেষ করল না চন্দনা।

পায়চারি শুরু করে হঠাৎই আবার চন্দনার সামনে থমকে দাঁড়াল কবীর চৌধুরী, চোখ দুটো চকচক করছে। 'তোমার কথা বিশ্বাস বা অবিশ্বাস, কোনটাই আমি করা পছন্দ। তবে তোমার কথার সঙ্গে বন্দনার দেয়া কিছু তথ্য মিলে গেছে। তোমরা দুই বোন যদি সত্যি কথা বলে থাকো, ক্ষমা করা যায় কিনা, অবশ্যই আমি বিবেচনা করে দেখব। আপাতত তোমার লাভ হয়েছে এই যে এখুনি তোমাকে টরচার চেম্বারে পাঠাচ্ছি না

'কিন্তু আপনার প্রস্তাব ছিল...'

হুংকার ছাড়ল কবীর চৌধুরী। 'সে প্রস্তাব আমি ফিরিয়ে নিইনি! শেভিং ক্রীমের আসল ক্যানটা আগে পাই, ওটা পরীক্ষা করে দেখি, তারপর না বুঝব তুমি সত্যি কথা বলছ কিনা। তখন রানার সঙ্গে তোমাকেও মেহমান হিসেবে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যেতে আমার আপত্তি থাকবে না। তবে তার আগে, রানাকেও স্বীকার করতে হবে যে তুমি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছ না।'

হাতে সময় পাওয়া যাবে, কাজেই অভিনয়টা চালিয়ে গেল রানা। 'আমি এখন যাই বলি, ঝর্নার কাদা তুমি ঘাঁটবেই,' ম্লান সুরে বলল রানা। 'সময় নিয়ে খুঁজলে ক্যানটা তুমি পেয়েও যাবে। সর্বনাশ যা করার করে ফেলেছে চন্দনা...'

'তুমি তাহলে বলছ যে চন্দনা আমার সঙ্গে বেঈমানী করছে না?'

'বেঈমানী ও আমার সঙ্গে করেছে, কবীর চৌধুরী!' দাঁতে দাঁত চাপল রানা।

'এটা যদি তোমার অভিনয় হয়, চন্দনার মত তোমাকেও কিন্তু

আমার হাতে মরতে হবে!' হুঁশিয়ার করে দিল কবীর চৌধুরী।

'মিস্টার চৌধুরী,' বলল চন্দনা, 'আমার বোনের কি হবে? মানলাম, তার অনেক ব্যর্থতা আছে, কিন্তু আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এ-কথা কি বলা যায়?'

দুই সেকেন্ড কি যেন চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, তার কেসটা পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। আপাতত তার দণ্ড স্থগিত করা যেতে পারে। তবে তোমাদের দুই বোনকে এক সঙ্গে রাখার পক্ষপাতী নই আমি। এক চেহারা, চিনতে আমার অসুবিধে হবে। দেখি কি করা যায়।' গার্ডদের দিকে ফিরল সে। 'বেসমেন্টে নিয়ে গিয়ে দু'জনকে দুটো আলাদা সেলে আটকে রাখো। কাল সকাল দশটায় শুধু রানাকে আমার হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাবে। আর, হ্যাঁ, টরচার চেম্বারে গিয়ে ডক্টর কো হো-কে বলো, বন্দনার শাস্তি আপাতত স্থগিত করেছি আমি। সেবা-যত্ন দিয়ে ওকে যেন সুস্থ করে তোলা হয়। কাল সকালে তাকেও আমি হেডকোয়ার্টারে দেখতে চাই।' কথা শেষ করে প্রায় ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

নয়

কবীর চৌধুরীর নাটকীয় প্রস্থান রানার মনে খুঁতখুঁতে একটা ভাব এনে দিয়েছে। তার এই আচরণের বিশেষ একটা তাৎপর্য না থেকেই পারে না। সেটা কি, রানার কোন ধারণা নেই।

একজন গার্ড রশি খুলে চন্দনাকে চেয়ার থেকে মুক্ত করল,

তবে হাতের বাঁধন খুলল না। কবীর চৌধুরী যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে তার উল্টোদিকের দরজাটা ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল আরেকজন গার্ড। পিঠে পিস্তলের খোঁচা খেয়ে করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। রানার পাশেই রয়েছে চন্দনা।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে তা রাখতে পারবে কিনা জানা নেই, সম্ভাবনা নেহাতই ক্ষীণ, তবু রানা নিচু গলায় অভয় দিল, 'চেষ্টা করব আমরা কেউ যাতে না মরি।'

'আমার মৃত্যুর বদলে ভারত যদি রক্ষা পায়, তুমি ইতস্তত করবে না,' জবাবে ফিসফিস করল চন্দনা।

'কথা নয়!' পিছন থেকে সাবধান করল একজন গার্ড। তার ভাষাটা ইংরেজি, বাচনভঙ্গিতে মার্কিনি টান।

করিডরের একটা জানালাকে পাশ কাটাল ওরা। বাইরে জোড়া ওভারহেড ট্যাংক দেখে এই ভবনের অবস্থান আন্দাজ করতে পারল রানা। ছয় ও সাত নম্বর সাইলোর কাছাকাছি রয়েছে ওরা, বলা যায় মিসাইল ঘাঁটির প্রায় মাঝখানে। সাতটা নিউক্লিয়ার ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটলে গোটা কমপাউন্ডের সঙ্গে ভবনটা চোখের পলকে ধুলোর মেঘে পরিণত হবে।

একটা চৌকাঠ পেরিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছে ওরা। ছোট্ট জায়গার ভেতর ছয় জোড়া জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে, বন্দনার নিচু গলা শুধু রানাই শুনতে পেল, 'ভেবেছিলাম বিদায় নেয়ার আগে তোমার অটোগ্রাফ চাইব। প্রসঙ্গটাই এখন হাস্যকর হয়ে উঠেছে। তবে কি জানো, অনেক ভেবেও ঠিক করতে পারিনি আমার তরফ থেকে কি দেয়া যায় তোমাকে। অথচ, এখন জানি তোমাকে আমি কি দিতে চাই।'

'কি, চন্দনা?'

'আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস, রানা। আমার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ!' আবেগে বুজে এল চন্দনার গলা। 'আমি তোমাকে আমার সবটুকু আয়ু দান করলাম।'

বেসমেন্টে নেমে এল ওরা। সঙ্গে-সঙ্গে আরও চারজন গার্ড এগিয়ে এল। দু'দল গার্ড নিজেদের মধ্যে দ্রুত আলাপ করল। তারপর করিডরের দু'দিকে রওনা হলো তারা, একদলের সঙ্গে রানা রয়েছে, আরেক দলের সঙ্গে চন্দনা।

সকাল ঠিক ন'টায় রানাকে নিতে এল একদল গার্ড। সেলে কোন বিছানা নেই, তার ওপর কি ঘটতে যাচ্ছে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা, সারাটা রাত এক ফোঁটা ঘুমাতে পারেনি ও। সেলের বাইরে করিডরে গার্ডরা টহল দিয়েছে, কিন্তু এক গ্লাস পানি চেয়েও পাওয়া যায়নি।

আবার একপ্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে গ্রাউন্ড লেভেলে উঠতে হলো। দালানের বাইরে একজোড়া টয়োটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে, গার্ডরা তার একটায় রানাকে নিয়ে উঠে বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিল। কবীর চৌধুরী কোন রকম ঝুঁকি নিচ্ছে না, কয়েকজন গার্ডকে নিয়ে দ্বিতীয় জীপটাও পিছু নিল।

রানা ও চন্দনা কাল রাতে যে গেট দিয়ে কমপাউন্ডে ঢুকেছিল তার উল্টো দিকের গেট দিয়ে বেরিয়ে এল জীপ। কমপাউন্ডের বাইরে কিছুদূর রাস্তাটা পাকা, একপাশে কিছু নিচু দালান, আরেক পাশে একটা হেলিপ্যাড। হেলিপ্যাডে পাশাপাশি দুটো মাঝারি আকৃতির হেলিকপ্টার দেখল রানা।

এরপর জীপ কাঁচা রাস্তায় পড়ল। মাটির ওপর প্রচুর কাঁকর ছড়ানো আছে, শেষ রাতের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হলেও কাদা জমেনি। আঁকাবাঁকা রাস্তাটা ধরে বেশ অনেকটা পথ পেরিয়ে এল জীপ; তারপর একটা নদীর কিনারা ধরে ছুটল। নদীটা প্রায় তিনশো ফুট চওড়া। ওপারে রেগুলার চাইনিজ আর্মির বেশ বড় একটা ছাউনি দেখা যাচ্ছে। ট্যাংক, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান, মর্টার ইত্যাদি সবকিছু নিয়ে সতর্ক অবস্থায় আছে ওরা। কয়েকটা হেলিকপ্টার গানশিপও দেখল রানা। সেনাছাউনি থেকে নদীর

এপার পর্যন্ত একটা ঝুলন্ত সেতু রয়েছে।

নদীর সঙ্গে বাঁক নিল রাস্তাটা। আরও আধমাইল এগোবার পর এপারে একটা জেটি দেখল রানা, শেষ মাথায় পানিতে দোল খাচ্ছে কয়েকটা স্পীডবোট আর একটা ইয়ট। নদীকে পিছনে ফেলে পাহাড়ের দিকে ঘুরে গেল রাস্তা। কিছু দূর আসতে আবার শুরু হলো পাকা রাস্তা, পাহাড়টাকে পেঁচিয়ে উঠে গেছে চূড়ার দিকে। মিসাইল ঘাঁটির কমপাউন্ড থেকে কবীর চৌধুরীর হেডকোয়ার্টার ও বাড়ি তিন কি চারশো গজ দূরে একটা পাহাড়ের ওপর, সেখানে পৌঁছাতে একটা গাড়ির সাত-আট মিনিট লাগার কথা নয়। রানা বুঝতে পারল, ওকে অনেকটা পথ ঘুরিয়ে আনা হয়েছে। কে জানে, হয়তো কোন উদ্দেশ্য আছে কবীর চৌধুরীর।

কাঁল ভোরে সূর্য ওঠার সময় কমপাউন্ডের উল্টোদিক থেকে পাহাড় চূড়ায় যে সুদৃশ্য দালানটা দেখেছিল রানা, কাঁচ মোড়া লম্বা জানালাটা ছিল সেই দালানের পিছনদিক। পুরো দালানের সবটুকু দৈর্ঘ্য জুড়ে ওই জানালা।

দালানের সামনের দিকটাও প্রায় একই রকম। পিলারগুলো মোটা, লাল ও কালো পেইন্ট করায় চকচক করছে, ওগুলোর ওপর দালানের মাথার দিকটা প্যাগোডার আদলে তৈরি। গ্রাউন্ড ও ফার্স্ট ফ্লোর-এর সামনের অংশ সাজাতে টিক, বাঁশ ও ইঁটের সাহায্যে ঐতিহ্যবাহী চীনা ডিজাইন ব্যবহার করা হয়েছে। পিঠে পিস্তলের খোঁচা খেয়ে জীপ থেকে নামল রানা। বাড়ির ভেতরটা সাদামাঠা, তবে আধুনিক। হলরুম থেকে খুব চওড়া একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপর দিকে। পাশে আরেকটা ছোট সিঁড়ি, গ্রিল দিয়ে ঘেরা, নিচে নেমে অন্ধকারে হারিয়ে গেছে ধাপগুলো।

রানার সঙ্গে তিনজন গার্ড, দোতলায় উঠে করিডর ধরে এগোল তারা। বাঁক ঘুরে একটা মেহগনি কাঠের দরজার সামনে থামল। 'এটা আপনার স্যুইট,' ওর হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বলল একজন গার্ড। 'বস্ বলেছেন, এই বাড়িতে আপনি সম্পূর্ণ

স্বাধীন। তবে তিনি আশা করেন যে এই স্বাধীনতার আপনি অপব্যবহার করবেন না।'

'তাকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ো।'

'এই বাড়ির যেখানেই থাকুন আপনি, আপনার প্রতিটি নড়াচড়া কমিউনিকেশন রুমের মনিটরে ধরা পড়বে,' বলল গার্ড। 'তার ওপর আছে লেযার বীম, আপনি পালাতে চেষ্টা করলে অ্যালার্ম বেজে উঠবে।'

'ঠিক আছে, বুঝেছি,' বলল রানা। 'তার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে কখন?'

'আপনি এখন শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাবেন, নতুন কাপড়চোপড় পরবেন, ব্রেকফাস্ট সারবেন, তারপর ঠিক সাড়ে দশটার সময় একজন এসে বসের কাছে নিয়ে যাবে আপনাকে।'

রানা বলল, 'আমার একটা প্রশ্ন ছিল।'

'জিজ্ঞেস করুন। সম্ভব হলে উত্তর দেব।'

'আজ সকালে বন্দনাকেও এখানে নিয়ে আসার কথা,' বলল রানা। 'তাকে কি ইতিমধ্যে আনা হয়েছে?'

মাথা নাড়ল গার্ড। 'এ-ব্যাপারে আমরা কিছু জানি না।' পকেট থেকে চাবি বের করে স্যুইটের দরজা খুলে দিল সে। 'প্লীজ।' ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল রানাকে।

ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। কান পেতে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল, তবে তালায় চাবি ঢোকানোর কোন শব্দ পেল না।

তিন কামরার বিলাসবহুল স্যুইট, ফাইভ স্টার হোটেলের ফ্যাশন ও স্টাইল অনুকরণ করে সাজানো হয়েছে। সিটিংরুমে দুই সেট সোফা ছাড়াও সেটী, ইজি-চেয়ার ইত্যাদি দেখা গেল। ডাবল বেডে দু'জনে শোয়ার আয়োজন। ওয়ার্ড্রোব খুলে ওর মাপমত অ্যাশ কালারের কমপ্লিট সুট, শার্ট, টাই আর জুতো দেখল রানা। বাথরুমে বিশাল একটা বাথটাব, শাওয়ারে গরম ও ঠাণ্ডা পানির

ব্যবস্থা। সন্দেহ নেই, রানাকে এভাবে খাতির করার প্ল্যানটা অনেক আগেই করে রেখেছিল কবীর চৌধুরী।

বাথরুম থেকে আধঘণ্টা পর নতুন কাপড়চোপড় পরেই বেরুল রানা। ইতিমধ্যে কেউ একজন ঢুকেছিল স্যুইটে, সিটিংরুমের নিচু একটা টেবিলে ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেছে। রাক্ষসের মত খিদে পেয়েছে রানার, নাস্তার আয়োজন দেখেই পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল। টেবিলে প্রচুর নুডলস দেয়া হয়েছে, সঙ্গে চিকেন ও ভেজিটেবল সুপ, কবুতরের সেদ্ধ ডিম চারটে, মাখন লাগানো দু'পীস পাউরুটি, দুটো আপেল, এক থোক আঙুর, এক গ্লাস অরেঞ্জ জুস আর পট ভর্তি গরম কফি।

ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে মাত্র, নক হলো দরজায়। হাতে কফির কাপ, সোফা ছেড়ে উঠতে যাবে রানা, এই সময় কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল মেয়েটা। দশ হাত দূর থেকে হঠাৎ দেখে রানা ঠিক চিনতে পারল না। চন্দনা হবার সম্ভাবনা নেই, কাজেই ধরে নিল এ বন্দনাই হবে।

সতর্ক হয়ে গেল রানা। বন্দনা একটা দু'মুখো সাপ; নতুন জীবন ফিরে পাবার পর আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠার কথা। কবীর চৌধুরীও নিশ্চয়ই কোন বিশেষ মতলবেই তাকে পাঠিয়েছে ওর কাছে।

দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল বন্দনা। ধবধবে সাদা সুতী একটা চাদর জড়ানো তার শরীরে, ফাঁক হওয়া ঠেকাতে এক হাতে কিনারা ধরে আছে। 'হাই, মিস্টার রানা! তোমাকে বসের কাছে নিয়ে যেতে এলাম।'

ম্লান দেখাচ্ছে বন্দনাকে। চোখের নিচে কালি। সে হেঁটে এল অদ্ভুত এক আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। 'তোমার এ বেশ কেন?' টেবিলে কাপ রেখে সোফা ছাড়ল রানা।

'ডক্টর হো-র হাতে তো পড়োনি, পড়লে এ প্রশ্ন করতে না,' এগিয়ে এসে রানার এক হাত সামনে দাঁড়াল বন্দনা। নাকের বাঁ

পাশে ছোট্ট কালো তিলটা দেখে এখন নিঃসন্দেহে চিনতে পারছে রানা, এ বন্দনাই। 'সারা শরীরে গরম লোহার ছ্যাঁকা তো দিয়েইছে, তার ওপর ইলেকট্রিক শক। বিশ্বাস করো, মরেই যাচ্ছিলাম।' হঠাৎ হাসল সে, রানার মনে হলো যেন একটা পাগলিনী হাসছে। 'তবে মিস্টার কংসু চউ, মানে আমার বস্ বলেছেন, যত কষ্টই পেয়ে থাকি, ওই নির্যাতনকে আমি যেন তাঁর তরফ থেকে আদর বলে ধরে নিই। তাহলেই আর কোন ব্যথা-বেদনা অনুভব করব না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, ঘটেছেও ঠিক তাই। ঘাগুলো শুকাতে দু'দিন সময় লাগবে, তবে সত্যি বলছি কোন ব্যথা-ট্যথা নেই। রক্ত আর রস বেরুচ্ছে তো, তাই ফরমাল ড্রেস পরতে পারছি না···কি, অবাক লাগছে তোমার?' আবার হাসল সে। 'দূর বোকা, আদর করেছে ভাবলেই কি আর ব্যথা চলে যায়! বস্ আসলে পেইনকিলার ট্যাবলেট খাইয়েছেন আমাকে!'

'কবীর চৌধুরী তোমাকে তাহলে ক্ষমা করে দিয়েছে?'

নার্ভাস ভঙ্গিতে হেসে উঠল বন্দনা। 'হ্যাঁ, এখন আবার আমি বসের গুডবুকে স্থান পেয়েছি, মিস্টার রানা। বস্ বললেন, আমাকে তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি করার কথা ভাবছেন।'

'কিন্তু ভারতের কি হবে, বন্দনা?"

'কি জানো, মিস্টার রানা, আসলে দু'নৌকায় পা দিয়ে সত্যি চলা যায় না। বস্ আমাকে বললেন, দুটোর একটা বেছে নিতে। আমি বেছে নিলাম কেকেএস।'

'কেকেএস মানে?'

'কেকেএস মানে জানো না? তাহলে তো তুমি কিছুই জানো না। আরে, এই কেকেএসই তো সাতটা দেশের কাছ থেকে সাতশো বিলিয়ন ডলার চাঁদা আদায় করছে। কেকেএস-এর হেড অফিস আমেরিকার নিউ ইয়র্কে, ট্রেনিং সেন্টার মরক্কোর কাসাব্লাঙ্কায়। সারা দুনিয়ায় ওদের দশহাজার প্রতিনিধি আছে।

কমান্ড্যান্ট আছে বারোজন...'

'তুমি কিন্তু কেকেএস শব্দটার মানে আমাকে বলছ না,' বাধা দিল রানা।

'ওহ্, সরি, মিস্টার রানা। শব্দটা তুমি আলাদাভাবেও উচ্চারণ করতে পারো—কে.কে.এস। এর মানে হলো কবীর অ্যান্ড খায়রুল সিন্ডিকেট।'

'ও।' তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'কবীর চৌধুরী তাহলে নিজের নামের সঙ্গে ছেলেকে জড়িয়ে একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট গঠন করেছে?'

'দেখো, মশাই, শব্দ নির্বাচনে সাবধান না হলে কিন্তু তোমার কপালে খারাবি আছে!' হুমকির মত শোনাল বন্দনার কথাগুলো। 'কোথায়, কার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছ এটা তোমার ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেকেএস কোন ক্রাইম সিন্ডিকেট নয়। কেকেএস-এর চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো দুনিয়ার সমস্ত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে এক জায়গায় জড়ো করে বিজ্ঞান চর্চার সুযোগ করে দেয়া, ডক্টর কংসু চউ-এর নেতৃত্বে তাঁরা যাতে দুনিয়াটাকে স্বর্গ বানাবার সাধনায় নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারেন, বুঝলে!'

'আমাকে কিছু না বোঝালেও চলবে,' বলল রানা। 'চন্দনার কোন খবর জানা থাকলে বলো। কবীর চৌধুরী তার সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত নিল?'

হঠাৎ অসহায় আর উদ্বিগ্ন দেখাল বন্দনাকে। 'আচ্ছা, চন্দনা এরকম একটা বোকামি কেন করতে গেল বলো তো?' প্রশ্ন করার ভঙ্গি আর গলার স্বর ঠিক যেন আদুরে একটা বাচ্চা মেয়ের, রানার সন্দেহ হলো কাল রাতে কবীর চৌধুরী সম্ভবত তার ব্রেন ওয়াশ করেছে।

'কেন, কি বোকামি করল চন্দনা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বসকে বলেছে, আমি নাকি তোমার পাউচ থেকে একটা শেভিং ক্রীমের ক্যান চুরি করেছি! বলার সময় এ-কথা একবার

ভাবল না যে আমাকে প্রশ্ন করে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবেন বস্? কেউ যদি নিজের কপাল নিজেই পোড়ায়, কার কি করার আছে, বলো!'

'কবীর চৌধুরীকে বিশ্বাস করাবার জন্যে দু'একটা মিথ্যেকথা চন্দনা হয়তো বলে থাকতে পারে,' বলল রানা, 'তবে আসল ক্যানটা যে ঝর্নার পানিতে হারিয়ে ফেলেছে, এটা মিথ্যে নয়।'

'সত্যি-মিথ্যে তোমরাই জানো,' বলল বন্দনা। 'তবে বস্ কিন্তু বলে দিয়েছেন ক্যানটা ওখানে খুঁজে পাওয়া না গেলে চরম ব্যবস্থা নেবেন তিনি। সেজন্যেই বলছি, এখনও সময় আছে, মিস্টার রানা—আসল কথাটা বলে দিয়ে নিজেকে তো বটেই, চন্দনাকেও তুমি বাঁচাতে পারো।'

'ভাল করে খুঁজলে কাদার ভেতর ক্যানটা অবশ্যই পাওয়া যাবে,' জোর দিয়ে বলল রানা।

'কাল রাতেই পাম্প বসানো হয়েছে,' বলল বন্দনা। 'আজ সকাল থেকে বিশজন লোক কাদা ঘাঁটছে। কিন্তু আমি খুব ভাল করেই জানি, ওখানে ঘোড়ার ডিম পাওয়া যাবে।'

'মানে?'

'আমাকে গুহায় সরিয়ে দিয়ে সারাদিন ক্যানটা তোমরা খুঁজেছ, এটা কি সত্যি কথা? চন্দনার এই বানানো কথা থেকেই তো বোঝা যায় যে ক্যানটা ওখানে হারায়নি।'

'তাহলে তুমিই বলো কোথায় সেটা?'

'তা যদি জানতাম আমি, এই চরম বিপদ থেকে চন্দনাকে বাঁচানো আমার জন্যে কোন সমস্যা হত না,' বলল বন্দনা। 'ক্যানটা খুঁজে বের করে বসের হাতে তুলে দিয়ে চন্দনার প্রাণ ভিক্ষা চাইতাম। এখন এই কাজটা একমাত্র তুমি পারো, মিস্টার রানা।'

'এ-ব্যাপারে নতুন কিছু বলার নেই আমার। এখন চলো, দেখি কবীর চৌধুরী কিভাবে চাঁদা আদায় করছে।'

গর্বের হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বন্দনার চোখ-মুখ। 'বসের আয়োজনে কোন খুঁত নেই, মিস্টার রানা। দেখে তুমিও মুগ্ধ না হয়ে পারবে না। এসো।'

করিডরে দু'জন গার্ড অপেক্ষা করছিল। সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় ওঠার পর আরও তিনজনকে দেখা গেল। মেহগনি কাঠের বিশাল দরজা দিয়ে একটা হলরুমে ঢুকল বন্দনা, রানা ঠিক তার পিছনেই রয়েছে।

হলরুমটা পিছনদিকে, বাড়ির পুরো দৈর্ঘ্য জুড়ে বিস্তৃত। একদিকের সবটুকু দেয়াল কাঁচ মোড়া জানালা। এই জানালাটাই কমপাউন্ডের উল্টোদিকের পাহাড় থেকে কাল দেখেছিল রানা। কামরার ডান দিকে দেয়াল নেই, তার বদলে বসানো হয়েছে প্রকাণ্ড একটা টিভি স্ক্রীন। রানা ধারণা করল, এটাই সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মনিটর। স্ক্রীন একটা হলেও, চার বর্গফুট আকারে অন্তত বিশ ভাগে ভাগ করা ওটা, সিরিয়াল বা চ্যানেল নাম্বার সহ; প্রতি ভাগে আলাদা আলাদা জ্যান্ত ছবি ফুটে আছে। কয়েকটা ছবি দেখামাত্র চিনতে পারল রানা। দুটো চ্যানেলে বাংলাদেশ ফুটে আছে। তিনে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভেতরের দৃশ্য, একটা করিডরের ছবি–কয়েকজন ফটো-জার্নালিস্ট একটা দরজার দিকে ক্যামেরা তাক করে অপেক্ষা করছে, দরজার গায়ে সোনালি হরফে লেখা 'মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী'। চারে কোন ছাদ থেকে ধারণ করা মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকার ছবি, বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে যানজট লেগে আছে। পাঁচ, ছয়, সাত ও আট নম্বর চ্যানেলে যথাক্রমে নয়া দিল্লী, ইসলামাবাদ, ইয়াঙ্গুন ও কাঠমাণ্ডু। ষোলো ও সতেরো নম্বর চ্যানেলে নিউ ইয়র্ক–একটায় জাতিসংঘ ভবন, আরেকটায় ম্যানহাটন এলাকা। মূল স্ক্রীনের নিচে ও সামনে ইন্সটল করা হয়েছে অত্যাধুনিক স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম। এক ঝাঁক কমপিউটর সহ বেশ বড় ও ঢালু একটা কন্ট্রোল প্যানেল

রয়েছে এখানে।

কামরার বাঁ দিকের দেয়ালে বিশাল একটা মানচিত্রে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, নেপাল ও দক্ষিণ কোরিয়া, এই সাতটা দেশকে হাইলাইট করা হয়েছে উজ্জ্বল আলো দিয়ে। মায়ানমার, দক্ষিণ কোরিয়া আর শ্রীলঙ্কার মানচিত্রে একটা করে রক্তবর্ণ ক্রসচিহ্ন ফুটে আছে।

কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে মাথায় হেড গিয়ার পরে বসে আছে চারজন কমিউনিকেশন অপারেটর। টিভি চ্যানেল, কমপিউটর মনিটর, ফ্যাক্স মেশিন, ওয়্যারলেস, স্যাটেলাইট ফোন ও প্রিন্টারগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে তারা। ওদের সঙ্গে তিনজন গার্ড ভেতরে ঢুকেছে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তারা। বাঁ দিকে, মানচিত্রের পাশে, আরও একটা বন্ধ দরজা। কামরার কোথাও কবীর চৌধুরী নেই।

টিভির স্ক্রীন থেকে চোখ নামিয়ে বন্দনার দিকে তাকাল রানা। 'কোথায় সে?'

'বস্? উচ্ছে চেনো–করলা? বস্ এখন ওই করলার রস খাচ্ছেন। গ্লাস ভর্তি করে খান তো, জিনিসটাও তেতো, তাই একটু সময় লাগে। এসে পড়বেন।' মুখ তুলে স্ক্রীনের দিকে তাকাল সে। হেসে উঠল। 'দুঃখিত, মিস্টার রানা। তোমাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। ওই দেখো, বস্ এখন প্রার্থনায় বসেছেন।'

বন্দনার দৃষ্টি অনুসরণ করে স্ক্রীনের দিকে তাকাল রানা। মূল স্ক্রীনের মাঝের অংশ জুড়ে রয়েছে একটা পিতলের বুদ্ধমূর্তি, ওটার সামনে চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে রয়েছে কবীর চৌধুরী, পরনে ঢোলা গেরুয়া। দেখে পেটফাটা হাসি এলো রানার। 'এর মানে কি? আমি যতদূর জানি কবীর চৌধুরী মুসলমান...'

'তুমি ভুল জানো,' বলল বন্দনা। 'আসলে কিছু দিন আগে পর্যন্ত বসের কোন ধর্ম ছিল না, মানে কোন ধর্মের প্রতিই তাঁর

বিশ্বাস ছিল না। পরে তিনি উপলব্ধি করেন, মুখে যে যাই বলুক, প্রায় সব মানুষই কোন না কোন ধর্মের প্রতি দুর্বল—এবং তারা ধর্ম না মানা লোককে একদমই পছন্দ করে না। যেহেতু সব ধর্মের মূল কথা একই, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন পক্ষপাতিত্ব না করে প্রচলিত সব ধর্মীয় রীতিই তিনি চর্চা করবেন।'

'তার মানে?'

'বস্ নামাজ পড়েন, আবার পূজাও করেন। প্যাগোডাতে যান, আবার চার্চেও ঢোকেন।'

'এমন ভণ্ডামি খুব কমই দেখা যায়,' বিড়বিড় করল রানা।

'কি বললে?' ভুরু কোঁচকাল বন্দনা।

'না, বলছিলাম, অনেকেই মনে করে অবৈধ ও অন্যায় কাজ করেও অপরাধ-বোধ থেকে মুক্ত থাকার চমৎকার একটা উপায় হলো ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ।'

'কেউ যদি নিজের বিপদ ডেকে আনে, কার কি করার আছে। ওই দেখো, তোমার কথা শুনে বসের ধ্যান ভেঙে গেছে।'

সত্যিই তাই। চোখ মেলে তাকিয়েছে কবীর চৌধুরী। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, রোষ কষায়িত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল একবার, তারপর প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে স্ক্রীন থেকে বেরিয়ে গেল।

দশ মিনিট পর কমিউনিকেশন রুমে ঢুকল কবীর চৌধুরী। ইতিমধ্যে গেরুয়া ছেড়ে কালো সিল্কের একটা আলখেল্লা পরেছে সে, মাথায় ফেজ টুপি, হাতে একটা স্যাটেলাইট ফোনের রিসিভার। এই মুহূর্তে তার মুখোশবিহীন চেহারায় কোন আবেগ বা ক্রোধ নেই; বরং পূত-পবিত্র একটা ভাব, সাধুসুলভ প্রশান্তিই লক্ষ করা গেল। 'হ্যালো, রানা—আমার হেডকোয়ার্টারে তোমাকে স্বাগত জানাই। কেমন দেখছ?'

সরাসরি জানতে চাইল রানা, 'তিনটে দেশের ম্যাপে লাল ক্রস চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, ওগুলোর মানে কি, কবীর চৌধুরী?'

'মায়ানমার, দক্ষিণ কোরিয়া আর শ্রীলঙ্কা,' বলল কবীর

চৌধুরী। 'কেকেএস-এর দাবি অনুসারে চাঁদা দিতে অস্বীকার করেছে ওরা। ক্রস চিহ্নের মানে হলো, ওই তিন দেশের সরকার চাইছে আমরা ওদের রাজধানী বোমা ফেলে ধ্বংস করে দিই।'

'ওরা জানে, চাঁদা না দিলে তুমি ওদের রাজধানীতে নিউক্লিয়ার বোমা ফেলবে?'

'আমি নই, আমি নই!' হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। 'কেকেএস। তবে কেকেএস বলতে কি বোঝায় তা ওরা জানে না।'

'কেকেএস-এর হাতে নিউক্লিয়ার বম্ব আছে, এটা কি ওদেরকে বিশ্বাস করানো গেছে?'

'বলো কি! রাষ্ট্র প্রতি যেখানে একশো বিলিয়ন ডলার করে চাঁদা চাওয়া হয়েছে, আমাদের প্রথম কাজই তো ছিল বিশ্বাস করানো। তোমাকে সব খুলেই বলি। সাতটা রাষ্ট্রকে এই মিসাইল ঘাঁটির ভিডিও করা ক্যাসেট পাঠিয়েছি আমরা, মিসাইলের রেঞ্জ ও ওঅরহেডের শক্তি সম্পর্কে সমস্ত তথ্যসহ। তাতে দেখানো হয়েছে, ঘাঁটির অবস্থান মায়ানমারের গহীন জঙ্গল।

'আর কেকেএস সম্পর্কেও পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়েছে। এই সংগঠনের অনেক কাজের একটি হলো, আন্ত:রাষ্ট্রীয় পারমাণবিক সমরসজ্জায় ভারসাম্য রক্ষা করা। কেকেএস-এর দৃষ্টিতে সব রাষ্ট্র সমান, কেউ কারও ওপর পারমাণবিক মাতব্বরি ফলাতে পারবে না। আরও খোলসা করে বলি। কেকেএস সার্ভিস বা প্রোটেকশন বিক্রি করে। উদাহরণ দিয়ে বোঝাই। যেমন ধরো, পাকিস্তান ও ভারতের কাছে অ্যাটম বোমা আছে, কিন্তু শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের নেই। কেকেএস বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার কাছে প্রোটেকশন বিক্রি করবে। কিভাবে? পাকিস্তান বা ভারত যদি কখনও ওই দুই রাষ্ট্রকে পারমাণবিক হুমকি দেয়, ওদের হয়ে পাকিস্তান ও ভারতকে পাল্টা হুমকি দেবে কেকেএস—খবরদার, ট্যাঁ-ফোঁ করেছ কি মরেছ; তোমাদের রাজধানী উড়িয়ে দেব।

'আমাদের সার্ভিস কেনার জন্যে ক্রেতাদেরকে আগ্রহী হতে হয় না, আমরাই ঠিক করি কোন রাষ্ট্রকে প্রটেকশন দেব। বিনিময়ে কত টাকা চাঁদা দিতে হবে, তাও বলে দিই।'

'তুমি যতই মজার মজার কথা বলো, আমি হাসব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি,' বলল রানা। 'কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান তো পারমাণবিক শক্তি, ওদেরকে তুমি ক্রেতা হিসেবে নির্বাচন করছ কোন যুক্তিতে?'

'এরমধ্যে আবার তুমি আমাকে জড়াচ্ছ!' কবীর চৌধুরীকে অসন্তুষ্ট দেখাল। 'বারবার বলছি না, গোটা ব্যাপারটা কেকেএস নিয়ন্ত্রণ করছে? আরে, বোকা, ভারত-পাকিস্তান পারমাণবিক শক্তি বলেই তো কেকেএস-এর সার্ভিস আরও বেশি দরকার ওদের! আণবিক বোমা থাকলেই যদি তা ব্যবহার করা যেত, ইতিমধ্যে বারকয়েক ধ্বংস হয়ে যেত দুনিয়াটা। বোমা থাকলে বরং দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়, সংযম প্রদর্শন জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু তারপরও যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বোমা না ফেলে কোন উপায় নেই, তখন বোমা ফেলার দায়িত্বটা ভারত বা পাকিস্তান কেকেএস-এর ওপর ছেড়ে দিয়ে ভিজে বিড়াল হয়ে বা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতে পারবে।'

'তারমানে ওদের হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে কেকেএস বোমা ফেলবে?'

কবীর চৌধুরী হাসল। 'বোমা কেকেএস ফেলবে কি ফেলবে না সেটা তো পরের কথা। ভারত বা পাকিস্তান যে কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রে বোমা ফেলতে চায় সেই কারণটাই যদি না থাকে তাহলে আর বোমা ফেলার দরকারই বা কি। আমরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রটিকে প্রস্তাব দেব—কৃতকর্মের জন্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কাছে ক্ষমা চাও, ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজি হও; এবং মধ্যস্থতা করার জন্যে কেকেএসকে মোটা টাকা চাঁদা দাও...'

'তারমানে কেকেএস-এর আরেক নাম শাঁখের করাত?'

'তুমি যা খুশি তাই বলতে পারো, আমি বলব–ব্যবসা।' কবীর চৌধুরী হাসছে না।

'তবে রেসপন্স দেখে তো মনে হচ্ছে না তোমার এই নতুন ব্ল্যাকমেইলিং ব্যবসা জমবে,' বলল রানা। 'সাতটার মধ্যে তিনটে রাষ্ট্র বলে দিয়েছে চাঁদার বিনিময়ে তারা তোমার সার্ভিস কিনতে রাজি নয়, নিশ্চয়ই তারা ইতিমধ্যে বেইজিংকে তোমার সম্পর্কে অভিযোগ করেছে?'

'এরমধ্যে বেইজিং বা চীনকে তুমি পেলে কোথায়? কেকেএস-এর সদর দফতর যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগনে। শাখা অফিস নিউ ইয়র্ক থেকে সাতটা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে...'

'যে মাধ্যমেই যোগাযোগ করো, ট্রেস করা পানির মত সহজ,' বলল রানা। 'এফবিআই তোমার সদর দফতর ও শাখা অফিসে হানা দেবে না? ওখানকার অপারেটরদের ইন্টারোগেট করলেই তো বেরিয়ে পড়বে যে চীনের কোয়াংটুং প্রদেশ থেকে কলকাঠি নাড়ছ তুমি স্টার..'

হাত তুলে রানাকে থামিয়ে দিল কবীর চৌধুরী। 'আমি আমার সহকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি নিজস্ব স্যাটেলাইট-এর মাধ্যমে, রানা। ওই স্যাটেলাইটের সন্ধান না পেলে কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয় কেকেএস-এর চীফ, মানে আমি, কোথায় বসে কলকাঠি নাড়ছি। এফবিআই হানা দেবে? কোথায়, রানা? সদর দফতর বা শাখা অফিসের যে ঠিকানা ব্যবহার করা হচ্ছে, সবই তো ভুয়া।'

'বুঝলাম, সব দিক বিবেচনায় রেখেই কাজে হাত দিয়েছ,' বলল রানা। 'এবার বলো, শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে যাচ্ছে?'

'তোমাকে বলতে আমার আপত্তি নেই, কারণ অন্যান্যবারের মত এবার আর তোমাকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে দেয়া হবে না...'

'ক্যানটা পেলেও নয়?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'এখনও যখন পাওয়া যায়নি, 'ওটা আর পাওয়া যাবে না

বলেই ধরে নিয়েছি আমি।' কবীর চৌধুরী গম্ভীর। 'ক্যানটা তোমরা অন্য কোথাও লুকিয়ে রেখেছ। এই যে মিথ্যে তথ্য দিয়েছ আমাকে, এর একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।' হঠাৎ হাসল সে। 'যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তোমাকে যে আমি কতটা সমীহ করি, মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করার আয়োজন দেখলে সেটা তুমি বুঝতে পারবে। ইউ উইল বি ইমপ্রেসড, আই য়্যাম শিওর অভ দ্যাট। বিলিভ ইট, রানা—এই পদ্ধতিতে আগে কেউ মারা যায়নি। ভবিষ্যতেও আর কেউ এভাবে মারা যাবে বলে মনে হয় না। মৃত্যুর মাধ্যমে আমি তোমাকে ইতিহাসে জায়গা করে দেব।'

'কোথায় লুকাই বলো তো?' রানা হাসছে না।

ওর সূক্ষ্ম বিদ্রূপ গায়ে মাখল না কবীর চৌধুরী। 'ভয় পেয়ো না, রানা। আমি জানি, অ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চের ভক্ত তুমি। কথা দিচ্ছি, তোমার শেষ যাত্রায় অ্যাডভেঞ্চার আর রোমাঞ্চের কোন অভাব থাকবে না। কল্পনা করলে আমারই শিহরণ জাগছে। আরও একটা সুখবর দিই তোমাকে। মাতৃভূমিকে তুমি নিজের চেয়েও বেশি ভালবাস, আমি জানি। কাজেই এটা কি তোমার জন্যে বিরাট একটা সুখবর নয় যে শেষ পর্যন্ত দেশের পবিত্র মাটিতেই তুমি স্থান পেতে যাচ্ছ?'

'আমি লুকাতে চাইছি মৃত্যুভয়ে নয়,' বলল রানা। 'তোমার লেকচারের ভয়ে। সে যাক, তুমি বলছিলে আমাকে কি যেন বলতে আপত্তি নেই তোমার।'

'না, আপত্তি নেই।' হলরুমের মাঝখানে পায়চারি শুরু করল কবীর চৌধুরী। 'কেকেএস-এর এটা প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট, রানা। ভাল একটা ইমেজ তৈরি করতে না পারলে ব্যবসাটা সত্যি জমবে না। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চাঁদা না দিলেই ভাল, সাতটা রাজধানী উড়িয়ে দিয়ে আমরা একটা দৃষ্টান্ত তৈরি করব। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'কিন্তু, ধরো, কোন রাষ্ট্রই চাঁদা দিতে রাজি হলো না,' বলল

রানা। 'তুমিও সাতটা রাষ্ট্রে বোমা ফেললে। লাভ কি হলো? টাকা তো পেলে না। শুধু ইমেজে তোমার পেট ভরবে?'

পায়চারি থামিয়ে হাসল কবীর চৌধুরী। 'ইমেজ তৈরিটাই আসল কাজ, রানা। চিন্তা করে দেখো না, ঢাকা ধ্বংস হবার পর বাংলাদেশ চাঁদা না দেয়ার ঝুঁকি নেবে, যদি বলা হয় পরবর্তী বোমাটা চট্টগ্রামে পড়তে যাচ্ছে? দৃষ্টান্ত স্থাপন করার দরকার আছে, রানা, কারণ তাহলেই শুধু চাহিবামাত্র চাঁদা দিতে রাজি হবে সবাই।'

'তোমার টাইম শেডিউল কি?' জানতে চাইল রানা।

'সবগুলো রাষ্ট্রকেই পাঁচ দিন সময় দেয়া হয়েছিল। মেয়াদ শেষ হবে কাল সন্ধ্যা ছ'টায়। চারটে রাষ্ট্র এখনও কোন জবাব দেয়নি।'

'তারমানে কাল সন্ধ্যায় যে মিসাইলটা ঢাকায় আঘাত করবে, সেটার ওঅরহেডের সঙ্গে বাঁধা হবে আমাকে, এই তো?'

'হোয়াট!' কবীর চৌধুরীকে হতচকিত দেখাল। 'ওহ্, গড!' এগিয়ে এসে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'তুমি বুঝে ফেলেছ? কি করে!' ভাব দেখে মনে হলো আবেগে অভিভূত হয়ে রানাকে আলিঙ্গন করতে যাচ্ছে সে। 'বিশ্বাস করো, রানা, তোমাকে সত্যি মিস করব আমি। তুমি চলে গেলে দুনিয়াটা ফাঁকা ফাঁকা লাগবে আমার। কিন্তু এ-ও নির্মম সত্য–তুমি বেঁচে থাকলে আমার কোন স্বপ্নই পূরণ হবে না। এক্সকিউজ মি।' ঘুরল সে, কালো আলখেল্লা উড়িয়ে হলরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

নিস্তব্ধতা ভেঙে বন্দনা নিচু গলায় বলল, 'বস্ ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলেন। তুমি এর অর্থ বোঝো, মিস্টার রানা?'

নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বিকৃত মস্তিষ্ক একজন লোকের আবেগ নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নয়।

'এর অর্থ হলো, বস্ তোমাকে তাঁর একজন সমর্থক, একজন

পার্টনার হিসেবে চান,' বলল বন্দনা। 'কিন্তু এ-ও জানেন যে তা কোনদিন সম্ভব হবে না, তাই তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতেও পারছেন না, আর সেজন্যেই মানসিকভাবে কাতর হয়ে পড়েছেন।'

রানা অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'তোমার বোনের কি হবে, বন্দনা?'

'বস্ বলেছেন, আমাকে একবার ওর কাছে পাঠাবেন,' বলল বন্দনা। 'কিন্তু কখন পাঠাবেন তা বলেননি।'

'কেন পাঠাবে, তাও বলেনি?'

'সবটুকু ব্যাখ্যা করেননি, শুধু বলেছেন–তোমাকেই তোমার বোনের সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

কবীর চৌধুরীর এই কথার কি অর্থ হতে পারে চিন্তা করছে রানা, এই সময় একটা কমপিউটর মনিটরে কবীর চৌধুরীকে দেখা গেল, স্পীকার সিস্টেম থেকে বেরিয়ে আসা তার ভারী কণ্ঠস্বরও শুনতে পেল ওরা।

'বন্দনা, গার্ডদের বলো তারা যেন রানাকে ওর স্যুইটে রেখে আসে।'

'ইয়েস, স্যার!'

'আর শোনো, তুমি এখুনি একবার আমার চেম্বারে চলে এসো,' বলল কবীর চৌধুরী।

'ইয়েস, স্যার।' গার্ডদের দিকে তাকাল বন্দনা। 'যাও, রানাকে স্যুইটে পৌঁছে দাও।'

'এক মিনিট,' বলে কমপিউটর মনিটরের দিকে তাকাল রানা। 'কবীর চৌধুরী, আমার দুটো প্রশ্ন আছে।'

'হ্যাঁ, বলো?'

'মিসাইলগুলো সত্যি তো আর মায়ানমারের জঙ্গলে নেই, আছে এখানে,' বলল রানা। 'ওগুলো ছোঁড়ার পর বেইজিংকে কি ব্যাখ্যা দেবে তুমি?'

'কেন, এখানে আসার পথে হেলিকপ্টারগুলো দেখোনি?'

পাল্টা প্রশ্ন করল কবীর চৌধুরী। 'আরও আছে ত্রিশটা জীপ ও দশটা বোট। কবীর চৌধুরী তার দলবল নিয়ে কেটে পড়লে বেইজিং কার কাছে ব্যাখ্যা দাবি করবে, বলো?'

'তাহলে পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্টের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখান থেকে পালালে তোমার অবস্থা ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দারের মত হবে না?'

'আমি তোমার ক্ষুরধার বুদ্ধির অকুণ্ঠ প্রশংসা করি, কিন্তু তুমি ভুলেও কখনও আমার বুদ্ধির তারিফ করো না, এটা সত্যি দুঃখজনক। কি ভাবো তুমি, কবীর চৌধুরী ঘাস খায়? যতগুলো প্রয়োজন, ঠিক ততগুলো মিসাইলই তৈরি করে রাখা আছে, সময় মত সরিয়ে ফেলা হবে। সন্তুষ্ট?'

'কিন্তু নদীর ওপারে রেগুলার আর্মি রয়েছে,' বলল রানা। 'মিসাইল ছুঁড়লে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসবে ওরা। তুমি পালাবার সময় পাবে?'

'ওখানে রেগুলার আর্মির নেতৃত্বে রয়েছেন কর্নেল তাও চাও তিয়েন,' বলল কবীর চৌধুরী, মনিটরে হাসছে। 'তার ওপর বেইজিঙের কড়া নির্দেশ আছে, আমার লিখিত অনুমতি ছাড়া কোন অবস্থাতেই মিসাইল ঘাঁটিতে তারা ঢুকতে পারবে না। মিসাইল নিক্ষেপ করা হচ্ছে দেখলে কর্নেল তিয়েন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করবেন, কিন্তু আমাকে পাবেন না। তারপর বেইজিঙের সঙ্গে যোগাযোগ করে নতুন নির্দেশ চাইবেন। ততক্ষণে আমি কোথায় থাকব জানো? আমার নিজস্ব প্লেনে। এয়ার স্ট্রিপটা এখান থেকে বেশি দূরে নয়, রানা।'

'স্বীকার করছি আটঘাট বেঁধেই কাজে হাত দিয়েছ,' বলল রানা। 'আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন। ঠিক প্রশ্ন নয়, অনুরোধ বলতে পারো।'

'জানি, ফাঁসীতে লটকাবার আগে আসামীকে জিজ্ঞেস করা হয় তার শেষ কোন ইচ্ছা আছে কি না। তা তোমার শেষ ইচ্ছাটা কি,

মাসুদ রানা?'

'চন্দনাকে কি মুক্তি দেয়া যায় না?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল কবীর চৌধুরী। 'তুমি কি সত্যি ওকে ভালবেসে ফেলেছ, রানা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আসলে উল্টোটা সত্যি,' বলল রানা। 'পরিচয় হবার আগে থেকেই মেয়েটা আমার প্রতি দুর্বল। আমি তোমার কাছে সঠিক উত্তর চাই, কবীর চৌধুরী। চন্দনাকে কি মুক্তি দিতে পারো না?'

'পারি,' বলল কবীর চৌধুরী। 'মুক্তি দেবও। খুশি, রানা?'

'ধন্যবাদ, কবীর চৌধুরী।' ধীরে-ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, অকস্মাৎ বিরাট স্বস্তি বোধ করায় শরীরটা ঠাণ্ডা ও হালকা লাগছে। 'তাহলে আমি ধরে নিতে পারি, কাল বিকেলের আগে এখানে ওর সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে?'

'দুঃখিত,' বলল কবীর চৌধুরী। 'তা বোধহয় হচ্ছে না। চন্দনাকে মুক্তি দেয়া হবে ঠিকই, কিন্তু তোমার সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছা বা ক্ষমতা কোনটাই তার থাকবে না।' মনিটর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল কবীর চৌধুরীর ছবি ।

দশ

এরপর স্যুইটের ভেতর রানাকে বন্দী করল কবীর চৌধুরী। গার্ডরা ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিল দরজায়। বন্দনার জন্যে দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, কিন্তু সে এলো না। বেলা দেড়টায় স্পীকার সিস্টেম থেকে ওকে নির্দেশ

দেয়া হলো, 'মিস্টার রানা, পাঁচ মিনিটের জন্যে আপনি সিটিংরুম ত্যাগ করুন, প্লীজ। আমরা লাঞ্চ পরিবেশন করব।'

'আমাকে এত ভয় পাওয়ার কি আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার কাছে কি কোন অস্ত্র আছে?'

কোন জবাব এল না।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেডরুমে চলে এল রানা। শব্দ শুনে বুঝতে পারল তালা খুলে স্যুইটে কেউ ঢুকেছে। পাঁচ মিনিট পর সিটিংরুমে ফিরে দেখল টেবিলে লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়েছে।

বিকেলের দিকে অস্থির হয়ে উঠল রানা। তিনটে ঘরে অনেকগুলো জানালা। এক-এক করে সবগুলো পরীক্ষা করল। অত্যন্ত মজবুত গ্রিল, খালি হাতে ভাঙা সম্ভব নয়। ভাঙতে পারলেও কোন লাভ হবে না, কারণ গ্রাউন্ড লেভেল থেকে প্রতিটি জানালার ওপর নজর রাখছে রাইফেলধারী গার্ডরা। স্পীকার সিস্টেম থেকে ওকে জানিয়েও দেয়া হলো, 'শুধু শুধু সময়ের অপচয়, মিস্টার রানা। এখান থেকে আপনি কোনভাবেই পালাতে পারবেন না।'

প্রতিটি ঘরে ক্যামেরা লুকানো আছে, ঘুরে-ঘুরে লেন্সগুলো খুঁজে বেরও করল রানা। প্রায় সবগুলোই সিলিঙে, নষ্ট করতে প্রচুর সময় লাগবে। তাছাড়া, নষ্ট করে লাভই বা কি!

রাত দশটায় একই পদ্ধতিতে ডিনার পরিবেশন করল ওরা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'বন্দনা কোথায়?'

কোন জবাব নেই।

তারপর বলল, 'আমি কবীর চৌধুরীর সঙ্গে জরুরী একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই।'

কোন জবাব নেই।

রাতটা কাটল বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করে, আর দুঃস্বপ্ন দেখে। একটা স্বপ্নে চন্দনাকে আকুল হয়ে কাঁদতে দেখল, বলছে, 'রানা, আমি বাঁচতে চাই!' উত্তরে রানা বলছে, 'দুঃখিত, চন্দনা,

আমি হেরে গেলাম–পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো।'

সকালে শাওয়ার সেরে, দাড়ি কামিয়ে, কাপড়চোপড় পরে অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু ব্রেকফাস্ট নিয়ে কেউ এল না।

বেলা দশটার দিকে দেয়ালে বসানো রিসিভার সেটের দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসল রানা, বলল, 'আতিথেয়তার এখানেই সমাপ্তি, কবীর চৌধুরী?'

কেউ সাড়া দিল না।

রানা সন্দেহ করল, সিরিয়াস কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু সেটা কি হতে পারে আন্দাজ করতে পারছে না।

ইতিমধ্যে পরাজয় মেনে নিয়েছে রানা–চন্দনাকে বাঁচানো ওর পক্ষে সম্ভব হবে না। হাতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, এরমধ্যে সুযোগ পেলেও কমপাউন্ডে যাওয়া উচিত হবে না ওর। গেলেই যে চন্দনাকে মুক্ত করতে পারবে, তারপর তাকে নিয়ে নিরাপদ কোথাও সরে গিয়ে নিউক্লিয়ার ডিভাইসের বিস্ফোরণ ঘটাতে পারবে, তার নিশ্চয়তা কোথায়। কবীর চৌধুরীর স্পেশাল ফোর্সের গার্ডরা ধরে ফেললে ওকেও হয়তো কমপাউন্ডেই বন্দী করে রাখবে। তখন নিজেও নির্ঘাত মারা যাবে জেনেই উড়িয়ে দিতে হবে মিসাইল ঘাঁটি, অন্য কোন পথ খোলা থাকবে না।

বিকেল ঠিক চারটের সময় একদল গার্ড ওকে নিতে এল। 'ডক্টর কংসু চউ আপনার জন্যে কমিউনিকেশন রুমে অপেক্ষা করছেন,' তাদের একজন বলল। লোকগুলোর চোখ-মুখে চাপা উল্লাস লক্ষ করল রানা। কয়েকটা প্রশ্ন করল ও, কিন্তু একটারও উত্তর পেল না।

করিডর ধরে এগোচ্ছে, বন্দনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরনে সেই আগের মতই সাদা চাদর জড়ানো। দূর থেকেই রানাকে দেখতে পাবার কথা তার, চিনতে না পারারও কোন কারণ নেই, কিন্তু ওর দিকে ভুলেও একবার তাকাল না। পরিষ্কার বোঝা গেল,

ওকে দেখেও না দেখার ভান করছে মেয়েটা। রানা জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ, বন্দনা?'

পাশ কাটিয়ে চলে গেল সে, রানার কথা যেন শুনতেই পায়নি।

'কি হয়েছে ওর?' গার্ডদের জিজ্ঞেস করল রানা।

গার্ডরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, জবাব দিল না।

কমিউনিকেশন রুমে ঢুকে রানা দেখল কন্ট্রোল প্যানেলের সামনে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে কবীর চৌধুরী, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

'কি এমন ঘটল যে তোমাকে এরকম অস্থির লাগছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আলটিমেটামের মেয়াদ শেষ হবার আগেই মিসাইল ছুঁড়ব,' রানার সামনে থেমে বলল কবীর চৌধুরী। 'এখন থেকে ঠিক এক ঘণ্টা পর।'

'হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টালে যে?'

'আমার এজেন্টরা গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়েছে, সাতটা রাষ্ট্র অনুরোধ করায় রুশ ও মার্কিন এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার থেকে অ্যান্টি-মিসাইল রকেট নিয়ে কয়েক ঝাঁক ফাইটার প্লেন রওনা হতে যাচ্ছে। আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আসছে ওগুলো, সাতটা রাষ্ট্রের আকাশ সীমায় টহল দেবে।'

'তোমার জন্যে বিরাট একটা দুঃসংবাদই বলতে হবে।' হাসিতে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হলেও, রানার ঠোঁট সামান্যই প্রসারিত হলো।

'কেউ যদি ভাল করে না হাসে, তার হাসি থামিয়ে দিয়ে মজা কোথায়?' মট-মট করে আঙুল মটাকাচ্ছে কবীর চৌধুরী। 'হ্যাঁ, খবরটা সময় মত না পেলে দুঃসংবাদই বলতে হত। কিন্তু আমি হিসেব করে বের করে ফেলেছি ফাইটারগুলো এখন থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে একটা দেশেও পৌঁছাতে পারবে না। কিন্তু আমি

আঘাত করতে যাচ্ছি এখন থেকে কাঁটায় কাঁটায়…' হাতঘড়ি দেখল, '…বাহান্ন মিনিট পর। তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখি, সর্বশেষ অর্থাৎ সাত নম্বর মিসাইলটা ঢাকায় যাচ্ছে।'

'দেখো হয়তো তোমার এজেন্টরা ভুল তথ্য পাঠিয়েছে,' বলল রানা। 'প্লেনগুলো এরই মধ্যে যদি পৌঁছে গিয়ে থাকে…'

কবীর চৌধুরী হাসল। 'আমার মনে সংশয় জাগাবার চেষ্টা না করে তুমি বরং ঈশ্বরকে স্মরণ করো, রানা। তোমার আয়ু বেশি হলে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক…ভাল কথা, রানা, আসার পথে বন্দনার সঙ্গে দেখা হয়নি তোমার?'

স্থির হয়ে গেল রানা। মুখ থেকে নিঃশেষে মুছে গেল হাসির রেখাগুলো। সতর্ক চোখে কবীর চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে আছে। 'হ্যাঁ, দেখা হয়েছে। কেন?'

'ওকে দেখে কিছু মনে হয়নি তোমার?' কবীর চৌধুরীর ঠোঁটে এক চিলতে ধূর্ত শেয়ালের হাসি ঝুলছে, অথচ চোখ দুটোয় জ্বলজ্বল করে উঠল আশ্চর্য একটা নিষ্ঠুর ভাব।

আর কিছুর দরকার ছিল না, কি ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলল রানা। এ যেন সহজ একটা যোগ অঙ্ক, দুইয়ে-দুইয়ে চার। বন্দনার ওই আচরণে তাচ্ছিল্যের প্রকাশ ছিল না, ছিল না সযত্নে এড়িয়ে যাওয়াও–সে ঘোরের মধ্যে ছিল, বিশেষ কোন কাজের প্রোগ্রাম দিয়ে নিক্ষিপ্ত একটা মিসাইল। সেই বিশেষ কাজটা কি আন্দাজ করতে পেরে শিউরে উঠল রানা।

'বেশ বুঝতে পারছি, আমার ধূর্ত প্রতিপক্ষ এতক্ষণে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরেছে,' বলল কবীর চৌধুরী, শেয়ালে হাসিটা এবার ছড়িয়ে পড়ল আরও। 'হ্যাঁ, রানা, তোমাকে যেমন কথা দিয়েছিলাম–চন্দনাকে মুক্তি দেয়ার জন্যেই পাঠিয়েছি বন্দনাকে। শর্টকাট পথ ধরে যাবে ও, এতক্ষণে বোধহয় পৌঁছে গেছে। সম্মোহন বিদ্যায় আমি যে একজন বিশেষজ্ঞ, তা তো তুমি জানোই। বন্দনাকে আমি ক্ষমা করলেও, ও যে একজন ভারতীয়

এজেন্টকে বাঁচাবার জন্যে আমার এক বিশ্বস্ত লোককে খুন করেছে, এটা আমি ভুলিনি। তাই সাজেশন দিয়ে ওকেই পাঠালাম সেই ভারতীয় এজেন্টকে চিরমুক্তি দেয়ার জন্যে। একটু পরেই ফিরে আসবে সে। আমি ওর ঘুম ভাঙাবার পর কি ঘটিয়ে এসেছে কিছুই মনে করতে পারবে না। তার আগে, এসো, কিভাবে কি ঘটতে যাচ্ছে তোমাকে দেখাই।'

গার্ডদের দিকে তাকাল রানা। মাত্র তিনজন ওরা, তবে পজিশন নিয়েছে হলরুমের তিন জায়গায়, এই মুহূর্তে সবাই ওর নাগালের বাইরে। আর আছে চারজন কমিউনিকেশন অপারেটর, কন্ট্রোল প্যানেল সামনে নিয়ে বসে আছে।

'টিভির স্ক্রীনেই সব দেখা যাবে,' বলল কবীর চৌধুরী, ঝুঁকে কন্ট্রোল প্যানেল থেকে একটা রেডিও সেটের মাউথপীস তুলে নিল। 'তবে জানালা দিয়ে সরাসরি দেখার মজাই আলাদা।' এগিয়ে এসে জানালার একটা কাঁচ খুলল সে। 'এসো, দেখে যাও।'

কবীর চৌধুরীর পাশে এসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। মিসাইল ঘাঁটির কমপাউন্ডটা এত কাছে, যেন লাফ দিয়ে চোখের সামনে চলে এল। এরই মধ্যে সাতটা মিসাইল বেরিয়ে এসেছে সাইলো থেকে। আশপাশে কেউ নেই, টেকনিশিয়ান ও গার্ডদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে।

'মিসাইলগুলোয় আমার তৈরি নতুন একটা ডিভাইস আছে, রানা,' বলল কবীর চৌধুরী। 'মিসাইল সাইলো ছেড়ে আকাশে ওঠার পরই শুধু নিউক্লিয়ার ওঅরহেড অ্যাকটিভেট হবে। ওটা একটা সেফটি ডিভাইস, গ্রাউন্ডে থাকা অবস্থায় নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ ঠেকিয়ে রাখবে।'

এবার রানার পার্লা-চোখের দৃষ্টি নির্দয় হয়ে উঠল, ঠোঁটে ফুটল বিদ্রূপাত্মক হাসি। 'কল্পনাও করতে পারবে না কি রকম স্বস্তি বোধ করছি।'

একটু বিস্মিত দেখাল কবীর চৌধুরীকে। 'তোমার মধ্যে হঠাৎ যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি? অবশ্য জীবনের শেষ মুহূর্তে সাহসীর ভূমিকায় অভিনয় করা ছাড়া বুদ্ধিমান মানুষের আর কিছু করারও থাকে না।'

এখনই সময়, সিদ্ধান্ত নিল রানা। হিসাবটা আগেই করা আছে ওর: প্রতিটি ডেটোনেটরে সিগন্যাল ট্র্যান্সমিট করতে এক সেকেন্ড সময় লাগবে অ্যাকটিভেটরের। আরও এক সেকেন্ড লাগবে সিগন্যাল রিসিভ করার পর ওটাকে ইলেকট্রনিক অ্যাকশনে ট্র্যানস্লেট করতে। সাতটা মিসাইল, প্রতিটির জন্যে দু'সেকেন্ড। সব মিলিয়ে চোদ্দ সেকেন্ড। এই চোদ্দ সেকেন্ড সাতটা দেশের ইতিহাস বদলে দিতে পারে। রানা কোন কারণে ব্যর্থ হলে প্রায় সাত কোটি মানুষ একটু পর একসঙ্গে মারা যাবে।

দরজা খোলার শব্দ হলো। কে এসেছে জানে রানা, ঘৃণায় সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করল না, চোখের কোণ দিয়ে শুধু সাদা চাদরটা দেখতে পেল।

'ওয়েলকাম, মাই ডিয়ার লেডি,' দরাজ গলায় বন্দনাকে অভ্যর্থনা জানাল কবীর চৌধুরী। পটকা ফাটানোর মত শব্দ করে চুটকি বাজাল সে। 'এই তুমি ঘুম থেকে জাগলে, বন্দনা! কেমন বোধ করছ?'

'ওহ্, বস্!' বন্দনা খানিকটা হতচকিত। 'আশ্চর্য, আমি এখানে কি করছি? আপনি তো আমাকে ঘুমাতে বলেছিলেন!'

'সব ঠিক আছে, বন্দনা।' হাসল কবীর চৌধুরী। 'এ নিয়ে কোন চিন্তা কোরো না। একটা চেয়ারে বসে বিশ্রাম নাও। আমি জানি, তুমি একটু ক্লান্ত বোধ করছ।'

'ধন্যবাদ, স্যার,' বলল বন্দনা, তবে চেয়ারে না বসে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কবীর চৌধুরী। রানাকে বলল, 'আমার লোকজনকে আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রস্তুতি

শেষ হওয়া মাত্র লঞ্চিং অপারেশন শুরু করবে তারা। যে-কোন মুহূর্তে রিপোর্ট পাব তাদের প্রস্তুতি শেষ হয়েছে।'

'তোমার বেসুরো গান এবার থামাও, কবীর চৌধুরী,' শান্ত গলায় বলল রানা।

'গান? হোয়াট ডু ইউ মীন?' কবীর চৌধুরী অবাক হয়ে তাকাল।

'এখানে আসার পর থেকে তোমার কর্কশ সঙ্গীত-চর্চা আমার কান দুটোর জন্যে রীতিমত পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছে।' রানা বিরক্ত। 'এই যে নির্লজ্জের মত গান গাইছ, বলি সঙ্গীত সম্পর্কে তোমার প্রাথমিক ধারণাও কি আছে?'

বন্দনার দিকে তাকাল কবীর চৌধুরী। 'স্যাড! ভেরি স্যাড! ব্যর্থতা মেনে নিতে পারেনি, তার ওপর নিজেও মরতে যাচ্ছে, সব মিলিয়ে প্রচণ্ড একটা চাপ পড়েছে ওর মনের ওপর, আর তাই পাগল হয়ে গেছে ও। সত্যিই দুঃখজনক!'

'তুমি যে সঙ্গীত সম্পর্কে কিছুই জানো না, আমি তা প্রমাণ করতে পারব,' চ্যালেঞ্জের সুরে বলল রানা। 'একটা-দুটো নয়, সাত-সাতটা প্রমাণ আছে আমার কাছে।'

হেসে উঠল কবীর চৌধুরী। 'এ আমি কল্পনাও করিনি! মাসুদ রানা পাগল হয়ে গেল!'

'পাগলই যদি হই, তাহলে স্বরগ্রামের সাতটা সুর আমার মনে আছে কি করে?' রানা হাসছে না। 'এখন তোমার পরীক্ষা হবে, কবীর চৌধুরী। এগুলোর মানে কি বলতে হবে তোমাকে।'

'এ তো আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেল!' খানিকটা বিব্রত, খানিকটা অসহায় দেখাল কবীর চৌধুরীকে। 'ভেবেছিলাম ছ'টা মিসাইল ছোঁড়ার পর সাত নম্বরে ওকে বাঁধব। এখন দেখছি এক নম্বরেই ওকে বাঁধতে হবে।'

'চোপ শালা!' কবীর চৌধুরীকে হতভম্ব করে দিয়ে খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'জানে লাড্ডা মারবে, তাই পরীক্ষা না দেয়ার

পাঁয়তারা কষছে! ছাড়া হবে না তোমাকে, এগুলো কি বলতে হবে–ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ? কি এগুলো? কি?'

'এ কি, বস্, মিস্টার রানা তো দেখছি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে–চু-চু-চু,' বলতে বলতে এগিয়ে এল বন্দনা। 'আপনি আপনার কাজ করুন, স্যার। ওকে আমি সামলাচ্ছি...'

'সে-ই ভাল,' বলে ওদের দিকে পিছন ফিরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল কবীর চৌধুরী।

রানার হাত ধরে টানল বন্দনা। কিন্তু রানা একচুল নড়ল না। অগত্যা ওকে দু'হাতে প্রায় জড়িয়ে ধরল সে। হঠাৎ রানা টের পেল জড়িয়ে ধরার ছলে ওর হাতে শক্ত কি যেন গুঁজে দিচ্ছে বন্দনা। ধস্তাধস্তির ফাঁকে মেয়েটার দিকে এই প্রথম ভাল করে তাকাল ও। ওর গোটা অস্তিত্বে হঠাৎ একটা উল্লাসের ঢেউ আছড়ে পড়ল যেন। এ মেয়ের নাকের পাশেও একটা ছোট্ট তিল আছে, তবে ডান পাশে। রানা জানে, বন্দনার তিলটা বাঁ পাশে।

তারমানে সম্মোহিত অবস্থায় বোনকে খুন করতে গিয়ে বন্দনা নিজেই খুন হয়ে গেছে!

এরপর দু'জন মিলে মৃদু ধস্তাধস্তির অভিনয়টা চালিয়ে গেল ওরা। তারই মধ্যে চিৎকার করে রানা বলল, 'ছি-ছি, কি লজ্জা! তুমি সাদা খাতা জমা দিলে, কবীর চৌধুরী?'

রানার দিকে না তাকিয়ে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত ঝাপটাল কবীর চৌধুরী।

'শোনো তাহলে, আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও,' বলল রানা। গলা চড়াল, 'প্রথম স্বর সা–ষড়জ।' এটাই ওর এক নম্বর ভয়েস সিগন্যাল, প্রথম ডেটোনেইটরটাকে অ্যাকটিভেট করবে। শব্দগুলোর উচ্চারণ করার সঙ্গে-সঙ্গে গলার পাশে মৃদু নড়াচড়া অনুভব করল ও, জায়গাটা যেন সুড়সুড় করছে–অ্যাকটিভেটর জ্যান্ত হবার প্রমাণ।

বড় করে একটা শ্বাস টানছে রানা, প্রথম ডেটোনেইটর ফাটার শব্দ পেল, পরমুহূর্তে প্রচণ্ড গর্জন তুলে বিস্ফোরিত হলো মিসাইল। কংক্রিট অ্যাপ্রন সহ মিসাইলটা উঁচু হলো, যেন কোন দানব নিচে থেকে ধাক্কা দিয়েছে, খানিকটা শূন্যে উঠে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। প্রথম সাইলোটা ব্যারাকের কাছাকাছি, রানা দেখল বিস্ফোরণে ওটার কাঠের ছাদ উড়ে গেছে। কংক্রিট, ইস্পাত আর মানুষের দেহ প্রথমে চরকির মত পাক খেলো, তারপর নিচে নেমে পরিণত হলো আবর্জনার স্তূপে। আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ, জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে কবীর চৌধুরী। হাতের মাউথপীস মুখের সামনে তুলে হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'অপারেশনস! অপারেশনস! দিস ইজ ডক্টর কংসু চউ। কি...কি ঘটল? ...হ্যাঁ, অপেক্ষাই তো করছি, ইডিয়ট! খবর নিয়ে এখুনি জানাও আমাকে।'

'স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর রে–ঋষভ!' উদ্ভ্রান্তের মত বলে উঠল রানা, এটা ওর দু'নম্বর ভয়েস সিগন্যাল।

দ্বিতীয় ডেটোনেটর ফাটল, তারই সঙ্গে বিস্ফোরিত হলো দ্বিতীয় মিসাইল। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে যাওয়ায় মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা, সেই সঙ্গে থরথর করে কেঁপে উঠল পাগল বিজ্ঞানী। রেডিওর মাউথপীসে বাঘের মত গর্জন করে ঘটনার ব্যাখ্যা চাইছে সে।

'স্বরগ্রামের তৃতীয় স্বর গা–গান্ধার!' বলল রানা।

তৃতীয় বিস্ফোরণের শব্দ শুনে জানালায় ঘুসি মারল কবীর চৌধুরী, তারপর উদভ্রান্ত চেহারা নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। তার বোধগম্যের বাইরে কিছু একটা ঘটছে। হলরুমে ছুটোছুটি শুরু করল সে। অপারেটরদের একজনকে লাথি মেরে ফেলে দিল মেঝেতে, আরেকজনের নাকটা চ্যাপ্টা করে দিল ঘুসি মেরে। এ-সব কেন ঘটছে তা ব্যাখ্যা করতে না পারাই তাদের অপরাধ। কন্ট্রোল প্যানেলের একটা চেয়ারে বসে হাতের

কাছে যে ক'টা স্পীকার পেল, এক-এক করে সবগুলো তুলে হুঙ্কার ছাড়ছে, বলছে এই ঘটনার জন্যে যারা দায়ী তাদেরকে কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে টগবগে গরম তেলে ভাজবে সে।

গার্ডরা সরে এসে জানালা দিয়ে বাইরে উঁকি দিচ্ছে, তাদের একজন ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেও, ধ্বংসের মাত্রা দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারল না, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল কবীর চৌধুরী চন্দনাকে বলল, 'ওর কি হয়েছে? ও কেন কাঁদে? বন্দনা, গলা দিয়ে আর একটাও যদি শব্দ বেরোয়, ঘাড় ধরে বের করে দেবে ওকে!' গার্ড ভয়ে হাতচাপা দিল মুখে।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ, ডক্টর কংসু চউ?' জিজ্ঞেস করল রানা, ঠোঁটে ক্রূর হাসি। 'স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর মা–মধ্যম।'

চার নম্বর মিসাইল সহস্র টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ছুটল কবীর চৌধুরী, একটার চেয়ার সহ আছাড় খেলো কন্ট্রোল প্যানেলের ওপর। টলতে-টলতে সিধে হবার সময় হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

রানা নির্মম। বলল, 'টের পাচ্ছ, কবীর চৌধুরী? কত ধানে কত চাল? স্বরগ্রামের পঞ্চম স্বর পা–পঞ্চম।'

'বন্দনা! প্লীজ! আমাকে ঠেকাও, তা না হলে আমি আত্মহত্যা করে বসব!' পাঁচ নম্বর মিসাইল বিস্ফোরিত হতে হাসতে ভুলে গেল কবীর চৌধুরী, শুরু হলো তার অদম্য কান্না। 'বিরল একটা প্রতিভার যুগান্তকারী সব আবিষ্কার থেকে দুনিয়ার মানুষ বঞ্চিত হবে, এটাই কি তোমরা চাও? মারো আমাকে, জখম করো, যেভাবে পারো ঠেকাও! আমাকে আত্মহত্যা করতে দিয়ো না!'

'স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর ধা–ধৈবত!' উচ্চারণ করল রানা।

জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নিচে পড়তে যাচ্ছিল কবীর চৌধুরী, ছয় নম্বর মিসাইল বিস্ফোরিত হতে দেখে ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল সে, গড়াগড়ি খেলো কিছুক্ষণ, তারপর দেয়াল ধরে দাঁড়াল,

নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে। জিজ্ঞেস করল, 'আমি এমন করছি কেন? কি হয়েছে আমার? মিসাইল গেলে মিসাইল পাব, কিন্তু আমি যদি পাগল হয়ে যাই তাহলে তো সবই শেষ!'

'পাগল তুমি আজ হওনি, কবীর চৌধুরী,' বলল রানা। 'এ তোমার অনেক পুরানো ব্যাধি।'

হঠাৎ রানার দিকে নতুন দৃষ্টিতে তাকাল কবীর চৌধুরী। তার মুখের প্রতিটি পেশী একেকটা আলাদা ও জ্যান্ত প্রাণীর মত মোচড় খাচ্ছে, মনে জমে ওঠা কুয়াশা কেটে যাওয়ায় চোখে ফুটে উঠেছে স্বচ্ছ দৃষ্টি। 'তুমি! কিভাবে জানি না, তবে তুমিই দায়ী!'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, আমি!' বলল রানা, চোখ দুটো দু'টুকরো আগুনের মত জ্বলছে।

'শত্রু! তুমি আমার জন্মশত্রু! আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, মাসুদ রানা! তোমার দুঃখে যেন কুকুর-বিড়ালও না কাঁদে! তোমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে! তুমি যেন...'

'এবার নি,' শেষ ভয়েস সিগন্যালটাও উচ্চারণ করল রানা। 'স্বরগ্রামের সপ্তম স্বর নি–নিষাদ!

'সাত নম্বর মিসাইল!' গর্জে উঠল কবীর চৌধুরী, মুখের সামনে ধরা মাউথপীস থরথর করে কাঁপছে। 'লঞ্চ মিসাইল সেভেন!' তার নির্দেশের উত্তরে শোনা গেল আরও একটা বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ, লম্বা জানালাটা ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল। ঘুরল উন্মাদ চৌধুরী, আহত পশুর মত গোঙাচ্ছে, অকস্মাৎ ডাইভ দিল রানাকে লক্ষ্য করে। ঝট করে এক পাশে সরে গিয়ে একটা পা বাড়াল রানা, ল্যাং খেয়ে মেঝেতে পড়ল কবীর চৌধুরী, হড়কে গিয়ে ধাক্কা খেলো দরজার কবাটে, চিৎকার করে গার্ডদের বলছে, 'কিল হিম! কিল হিম! কিল হিম!'

প্রথম গার্ড মুখ থেকে হাত সরাল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গার্ড হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করছে। চন্দনার দেয়া পিস্তলটা পরপর দু'বার গর্জে উঠল রানার হাতে। চন্দনা ঝাঁপিয়ে পড়ল

তৃতীয় গার্ডের ওপর। কন্ট্রোল প্যানেলের অপারেটররা নিরস্ত্র হলেও, ডক্টর কংসু চউকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। তাদের মাথার ওপর দিয়ে ফাঁকা গুলি করল রানা।

এত সব হাঙ্গামার মধ্যে কেউ খেয়ালই করেনি যে দরজা খুলে পালিয়েছে কবীর চৌধুরী। খেয়াল হতে এক লাফে চৌকাঠ পেরুল রানা, দেখল চওড়া সিঁড়িতে হারিয়ে যাচ্ছে কবীর চৌধুরীর কালো আলখেল্লা। পিছু নিল ও, ধাপ বেয়ে নামতে যাবে, এই সময় সিঁড়ির নিচে চারজন গার্ডকে দেখা গেল। অটোমেটিক রাইফেল তুলেই গুলি করল তারা। ইতমধ্যে করিডরের মেঝেতে শুয়ে পড়েছে ও, অনুভব করল ক্রল করে ওর পাশে চলে এল চন্দনা।

একই সঙ্গে দুটো শব্দ পেল ওরা। গার্ডরা ধাপ বেয়ে উঠে আসছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের কোথাও স্টার্ট নিল একটা জীপ।

প্রথম গার্ড সিঁড়ির মাথায় পা দিতেই তার গোড়ালি ধরে প্রথমে টান দিল রানা, তারপর ভারী বস্তার মত ছুঁড়ে দিল বাকি তিনজনের ওপর। রাইফেল লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা, ওটা হাতে পেয়ে পাক খেলো, ট্রিগার টানল ফুল অটোমেটিকে দিয়ে। সিঁড়ির ধাপে স্তূপ হয়ে পড়ে থাকল গার্ডরা, গুলি খাবার ভয়ে নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে। লাফ দিয়ে তাদেরকে টপকাল রানা, ওকে অনুসরণ করার আগে চন্দনাও একটা রাইফেল তুলে নিল ধাপ থেকে।

গ্রাউন্ড ফ্লোরে নামার আগে আরও তিনজন গার্ড পড়ল ওদের সামনে, তিনজনই চন্দনার গুলি খেয়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

গাড়ি বারান্দায় দুটো জীপ রয়েছে, কিন্তু কবীর চৌধুরীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

'খানিক আগে এখানে তিনটে জীপ ছিল,' বলল চন্দনা, উঁকি মেরে একটা জীপের ইগনিশনে চাবি আছে দেখে লাফ দিয়ে উঠে বসল ড্রাইভিং সীটে। 'নিশ্চয়ই হেলিপ্যাডের দিকে গেছে!' পাশের

সীটে রানা উঠে বসতেই স্টার্ট দিয়ে ছেড়ে দিল জীপ।

পেঁচানো রাস্তা ধরে পাহাড় থেকে নিচে নামছে গাড়ি, ওদের মাথার ওপর আকাশ কালো ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। রাস্তাটা আধ চক্কর ঘুরতেই বিধ্বস্ত মিসাইল ঘাঁটিটা দেখতে পেল ওরা। গোটা কমপাউন্ডে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। ভেতরে গার্ড আর টেকনিশিয়ানরা যে যেখানে ছিল, একজনও সম্ভবত বাঁচেনি। কমপাউন্ডের আশপাশেও প্রচুর লোকজন ছিল, তারা যে যেদিকে পারে পালিয়েছে। তবে কমপাউন্ডের উল্টোদিকে একদল ট্রুপ দেখতে পেল রানা, সতর্কতার সঙ্গে আগুনটাকে ঘিরে ফেলছে। সাতটা নিউক্লিয়ার ওঅরহেডের কথা মনে পড়ল রানার; অ্যাকটিভেটর মেকানিজম কাজ না করায় একটারও ফাটার কথা নয়, ফাটেওনি; তার ওপর প্রতিটিতে কবীর চৌধুরীর নিজের তৈরি সেফটি ডিভাইস থাকায় আগুনের তাপে ফাটবেও না। তবে নদীর ওপার থেকে রেগুলার আর্মি পৌঁছাবার আগে কবীর চৌধুরীর স্পেশাল ট্রুপস ওগুলো সরিয়ে না ফেললেই হয়।

সমতল রাস্তায় নেমে এল ওদের জীপ। ফাঁকা রাস্তা, বাধা দেয়ার কেউ নেই। স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে চাদরের তলায় একটা হাত ঢোকাল চন্দনা, একজোড়া ভিডিও ক্যাসেট বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল।

'কি এগুলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ধস্তাধস্তির সময় হলরুমের একজন অপারেটর এ দুটো লুকাবার চেষ্টা করছিল,' বলল চন্দনা। 'একটা ক্যাসেটে রেকর্ড করা হয়েছে ডক্টর কংসু চউ-এর ভাষণ। সে তার এই প্রোগ্রাম বা অপারেশন সম্পর্কে সহকারী বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানদের ব্রিফ করেছিল। দ্বিতীয় ক্যাসেটে রেকর্ড করা হয়েছে কেকেএস-এর নিউ ইয়র্ক শাখার সঙ্গে সাতটা দেশের মেসেজ বিনিময়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ইমেজসহ।'

'ধন্যবাদ, চন্দনা।' রানা খুশি। 'এগুলো পেলে চীনা তদন্ত-

কারীদের দারুণ উপকার হবে।' ক্যাসেট দুটো বেল্টের সঙ্গে কোমরে গুঁজে রাখল ও।

সামনে নদী দেখতে পেল রানা।

'হেলিপ্যাডে গিয়ে কোন লাভ হবে কি?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা। 'ডক্টর চউ আমাদের জন্যে নিশ্চয়ই ওখানে বসে নেই।'

'তা নেই,' বলল রানা। 'আগে জেটিতে চলো, দেখি একটা বোট দখল করতে পারি কিনা। না পারলে হেলিপ্যাডে যেতেই হবে। ওখানে আমরা দুটো হেলিকপ্টার দেখেছিলাম, মনে পড়ে?'

জবাবে চেঁচিয়ে উঠল চন্দনা, 'রানা, দেখো!'

চন্দনার দৃষ্টি অনুসরণ করে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে আকাশে তাকাতেই এক ঝাঁক চাইনিজ হেলিকপ্টার গানশিপ দেখতে পেল রানা, নদীর উজান ও ওপার থেকে দ্রুতবেগে মিসাইল ঘাঁটির দিকে যাচ্ছে।

বন-বন করে হুইল ঘুরিয়ে বাঁক নিল চন্দনা, নদীর কিনারা ধরে ছুটল জীপ।

জেটিটা দূর থেকেই দেখা গেল। মিসাইল ঘাঁটি থেকে কবীর চৌধুরীর অপারেশনাল হেডকোয়ার্টারে যাবার সময় জেটির শেষ মাথায় বেশ কয়েকটা বোট ও একটা সাদা ইয়ট দেখেছিল ওরা। এই মুহূর্তে একটা বোটও নেই, নিঃসঙ্গ ইয়টটা শুধু ঢেউয়ের তালে তালে দুলছে।

'সাবধান, চন্দনা!' বলল রানা, দু'জনেই ওরা দেখতে পেল রাস্তার উল্টোদিক থেকে একটা জীপ আসছে—ওদেরটার মতই, সাদা একটা টয়োটা। 'নামতে হলে একা আমি নামব,' আবার বলল ও। 'তুমি আমাকে কাভার দেবে।'

জেটির মাথায় গাড়ি দুটো মুখোমুখি অবস্থায় থামল। স্টার্ট বন্ধ করে কোলের ওপর পড়ে থাকা রাইফেলটা ধরল চন্দনা।

সামনের গাড়ি থেকে দু'জন প্রৌঢ় শ্বেতাঙ্গ নামল, পরনে সাদা ল্যাব কোট, হাতে একটা করে সুটকেস। জেটিতে পা ফেলতে

ইতস্তত করছে তারা, সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সামনে দাঁড়ানো জীপের দিকে।

রানার পরনে এখনও কমপ্লিট সুট, ওকে এগিয়ে আসতে দেখে দুই প্রৌঢ় জোর করে হাসল। একজন বলল, 'হ্যালো, ইয়াং ম্যান!'

'আপনাদের পরিচয়?' ভারী গলায় জিজ্ঞেস করল রানা। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

জবাব দেয়ার আগে ঘাড় ফিরিয়ে ফেলে আসা রাস্তার দিকে একবার তাকাল প্রথম লোকটা। রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, একদম ফাঁকা। 'আমরা মিসাইল এক্সপার্ট–,' নিজের বুকে আঙুল ঠেকাল, 'মাইকেল ট্যালবট।' ইঙ্গিতে সঙ্গীকে দেখাল। 'জন ম্যাকেনরো। ডক্টর চউ আমাদেরকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন।'

'কি ঘটল ওখানে?'

'কিছুই বলতে পারব না। আমরা যারা কমপাউন্ডের বাইরে ছিলাম তারাই শুধু বেঁচে গেছি...'

'আর সবাই কোথায়, যারা বেঁচে গেছে?'

'ট্রাক আর জীপ নিয়ে যে যেদিকে পারে পালিয়েছে,' বলে আবার পিছন দিকে তাকাল লোকটা। 'দেখুন, ইয়াংম্যান, চাইনিজ আর্মিকে নদী পেরুতে দেখে এসেছি আমরা। এদিকেও তারা আসতে পারে, কাজেই...'

'কাজেই ডক্টর চউ-এর দেখাদেখি আপনারাও পালাচ্ছেন, এই তো?' রানার হাতে পিস্তল বেরিয়ে এল। 'গাড়িতে উঠে চুপচাপ বসে থাকুন, আর্মি এলে আত্মসমর্পণ করবেন। যান!'

'কিন্তু আমরা তো কোন অন্যায় করিনি!' এবার দ্বিতীয় লোকটা কথা বলল। 'ডক্টর চউ...'

'শাটআপ, ইউ বাস্টার্ড!' এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিল রানা। 'ডক্টর চউ সাতটা দেশকে ব্ল্যাকমেইল করতে যাচ্ছে

জেনেই তোমরা তাকে সাহায্য করছিলে, তারপরও বলছ কোন অন্যায় করোনি? যাবে, নাকি গুলি করে ফেলে রেখে যাব?'

এবার চন্দনাও হাতে দুটো রাইফেল নিয়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'তুমি নোঙর তোলো, রানা। আমি এদেরকে কাভার দিচ্ছি।'

তিনি মিনিট পর জেটি ধরে ছুটল চন্দনা, লাফ দিয়ে ইয়টের ডেকে উঠল, সেই মুহূর্তে স্টার্ট দেয়া ইয়টও ছেড়ে দিল রানা।

'ওদিকে যাচ্ছি কেন?' চন্দনা হতভম্ব। 'উজানে যাব না? সাগরের দিকে?'

হুইল ধরে জেটি ও রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'মাথা খারাপ! চীনা আর্মি গিজ গিজ করছে ওদিকে। হয়তো দেখামাত্র গুলি করবে। তা যদি না-ও করে, তিন মাসের ডিটেনশন দিয়ে জেলখানায় ফেলে রাখবে।'

'কিন্তু এভাবে চীনের আরও ভেতর দিকে গেলে পরে বেরুতে পারব তো?'

'আগে তো বিপদ এড়াই, বেরুবার কথা পরেই ভাবা যাবে,' বলে একটা হাত তুলে জেটি আর রাস্তার দিকটা দেখাল রানা। 'একটা বিপদ থেকে যে বেঁচেছি, ওই দেখো তার প্রমাণ।'

রাস্তার দিকে তাকাতেই রেগুলার আর্মির একটা জীপ আর তিনটে ভ্যান দেখতে পেল চন্দনা। ভ্যানগুলো থেকে সৈন্য উপচে পড়ছে, প্রত্যেকের হাতে বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক রাইফেল। ইয়ট বাঁক নেয়ার আগে ওরা দেখতে পেল মাথার ওপর হাত তুলে কবীর চৌধুরীর দুই শ্বেতাঙ্গ সহযোগী সাদা টয়োটা জীপ থেকে বেরিয়ে আসছে। তবে সেই সঙ্গে এ-ও দেখল যে সৈন্যরা ওদের ইয়টটার দিকে তাকিয়ে আছে।

রানা জানে না, সামরিক জীপটা চালাচ্ছেন কর্নেল তাও চাও তিয়েন। হেলিকপ্টার নিয়ে পালিয়ে যাবার আগে রেডিওর সাহায্যে কবীর চৌধুরী তাকে একটা মেসেজ দিয়েছে, মেসেজে মাসুদ

রানার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলা হয়েছে, মিসাইল ঘাঁটি স্যাবটাজ করার জন্যে এই বিদেশী স্পাই মাসুদ রানাই দায়ী।

কর্নেল তিয়েন সেই বিদেশী স্পাইকে শিকার করতে বেরিয়েছেন।

এগারো

হুইল হাউসে পাওয়া চীনের একটা ডিটেইলড ম্যাপ খুলে মিনিট দশেক পরীক্ষা করল রানা, তারপর চন্দনাকে বলল, 'ভাল কি খারাপ জানি না, তবে এই নদীর একটা শাখা ধরে এগোলে যে পথ ধরে এসেছিলাম সেই পথে পৌঁছাতে পারব।'

'মানে?'

'সেই শহরটার কথা মনে আছে তোমার—ফুচাং?' হাসল রানা। 'তোমরা দুই বোন হোটেলে বসে ভাত খেলে?'

'দুই বোন' শুনে ম্লান হয়ে গেল চন্দনার মুখ, চোখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল। 'হ্যাঁ, কেন মনে পড়বে না।'

'শাখা নদীটা ওই শহরের কাছাকাছি পর্যন্ত গেছে,' বলল রানা। 'দুঃখিত, চন্দনা। তার কথা আমি তোমাকে ইচ্ছা করে মনে করিয়ে দিইনি।'

'সে আমি জানি,' বিড়বিড় করে বলল চন্দনা। 'প্রসঙ্গটা একবারও তুমি তোলোনি, সেজন্যে তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, রানা। তবে এক সময় আমাকে বলতেই হবে, তা না হলে হালকা

হতে পারব না...'

'কি ঘটেছিল? তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে যে বন্দনাকে সম্মোহিত করা হয়েছিল?'

এগিয়ে এসে রানার বুকে মাথা ঠেকাল চন্দনা। মৃদু গলায় থেমে-থেমে কথা বলছে। 'আমার সেলে কোন জানালা ছিল না, লোহার দরজায় কোন ফুটোও ছিল না, দিনের বেলা ঘরটা অন্ধকার। তবে ছোট্ট একটা বাথরুম ছিল। ওখান থেকেই দরজা খোলার ও বন্ধ হবার আওয়াজ পাই আমি।'

'তারপর?'

'তাড়াতাড়ি বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসি আমি। বাথরুমের আলোয় দেখি, আমার কটের দিকে পিস্তল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা, একা একাই হাসছে আর বিড়বিড় করে কি সব বলছে। পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুই? কি করছিস?" শুনেই ঘুরল বন্দনা, পিস্তলটা আমার বুকে তাক করল। বলল, "হ্যাঁ, আমি, ভারতীয় এজেন্ট চন্দনা দেবীকে খুন করতে এসেছি!" চোখ দেখেই বুঝতে পারি, ও সুস্থ নয়, স্বাভাবিক নয়। বললাম, "কি যা-তা বকছিস! দে, পিস্তলটা আমাকে দে।" পিস্তলটা ধরে টান দিলাম আমি। কিন্তু বন্দনা ছাড়ল না। শুরু হলো ধস্তাধস্তি। এক পর্যায়ে একটা গুলি হলো। বন্দনার বগল দিয়ে ভেতরে ঢোকে বুলেটটা। সঙ্গে সঙ্গে নেতিয়ে পড়ে ও।

'কি ঘটে গেছে বুঝতে পেরে আমি আর দেরি করিনি। তাড়াতাড়ি কাপড়চোপড় খুলে ওকে পরাই। ওর চাদরটা আগেই গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। গার্ডদের বোধহয় নির্দেশ দেয়া ছিল তারা যেন বন্দনার কাজে বাধা না দেয়। গুলির শব্দ শুনেও দরজা খোলেনি তারা। তবে আমি নক করতেই খুলে দিল। ওদের একজনকে আমি বললাম, শরীরটা খারাপ লাগছে, আমাকে একটু ধরো। সেই গার্ডই আমাকে পথ দেখিয়ে ডক্টর চউ-এর বাড়ির গেটে পৌঁছে দিল। বাকিটা তো তুমি জানোই।'

চন্দনাকে এক হাতে জড়িয়ে রাখল রানা, মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'বড় বাঁচা বেঁচে গেছ, চন্দনা। আপন কারও হাতে খুন হবার মত দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। আর, বন্দনাকে তুমি এই ভেবে ক্ষমা করে দিতে পারো যে ও স্বেচ্ছায় বা সজ্ঞানে তোমাকে খুন করতে যায়নি।'

রানার হাত থেকে রুমাল নিয়ে চোখ মুছল চন্দনা। আবার একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল।

চন্দনাকে ছেড়ে হুইলের কাছে ফিরে এল রানা। হাতঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা বাজে। আর আধঘণ্টা পর সন্ধ্যা নামবে। 'ভাবছি,' বলল ও, 'ওরা পিছু নিয়ে আমাদেরকে দেখতে পাবার আগেই শাখা নদীটায় ঢুকে যেতে পারব কিনা।'

নদীর দু'পাশে শহর, তীরে সারিসারি অসংখ্য নৌকা আর বোট ভাসছে। রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করে চন্দনা বলল, 'খুব বেশিক্ষণ ফাঁকি দেয়া সম্ভব বলে মনে হয় না। পিছু নিয়ে যারা আসবে তাদের ক্লুর কোন অভাব হবে না। সাদা একটা ইয়ট সবারই চোখে পড়ছে, জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে কোন দিকে যাচ্ছে এটা।'

'সন্ধেটা নির্বিঘ্নে কাটতে দাও,' রানার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি, 'তারপর দেখবে ফাঁকি দেয়ার কি বুদ্ধি বের করি।'

ইয়টটা পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা, অত্যন্ত শক্তিশালী এঞ্জিন, স্পীড ঘণ্টায় বিশ নট। তিনটে যাত্রীবাহী লঞ্চ পড়ল সামনে, কে কার আগে যাবে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে, রানাও তাদের সঙ্গে যোগ দিল। একটা লঞ্চকে পিছনে ফেলল ইয়ট, দ্বিতীয় লঞ্চটার পাশে চলে এল, তৃতীয়টা এখনও একশো গজ সামনে। হঠাৎ আঁতকে উঠে চন্দনা বলল, 'বিপদ, রানা!'

ঘাড় ফেরাতেই পিছনে একটা হেলিকপ্টার গানশিপ দেখতে পেল রানা, শিকারী বাজপাখির মত ধেয়ে আসছে। পাইলটের পাশে দরজা খোলা, হ্যান্ডমাইক হাতে একজন অফিসার নিচের

দিকে ঝুঁকে সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। গানশিপের দু'দিকে রকেট লঞ্চার দেখতে পেল রানা। দরজার মুখে, লোকটার পাশে, বসানো রয়েছে একটা মেশিন গান।

রণে ভঙ্গ দিয়ে লঞ্চ তিনটে পিছিয়ে পড়ছে দেখে রানাও স্পীড কমিয়ে ওগুলোর কাছাকাছি থাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু কৌশলটা কাজে লাগল না। গানশিপের নির্দেশ শুনে এঞ্জিন বন্ধ করে তীরের দিকে ফিরে যাচ্ছে তিনটে লঞ্চই। দেখতে দেখতে মাঝ নদীতে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ল ওদের ইয়ট।

হ্যান্ড মাইক থেকে লোকটা বলল, 'আমি চাইনিজ রেগুলার আর্মির মেজর উন ফেং বলছি। মিস্টার মাসুদ রানা, এই মুহূর্তে ইয়ট থামান আপনি। তা না হলে আমরা গুলি করব।'

'আমার মনে হয়,' বলল চন্দনা, 'গুলি খেয়ে মরার চেয়ে আত্মসমর্পণ করা ভাল।'

'আমারও তাই মনে হয়,' সায় দিল রানা। 'তবে আমার কৌতূহল তোমার চেয়ে বেশি। একটু পরখ করে দেখতে চাই সত্যি ওরা গুলি করবে কিনা।' স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। শাখা নদীর মুখটাকে পাশ কাটিয়ে এল ইয়ট। গানশিপকে সাক্ষী রেখে বাঁক নিতে রাজি নয় রানা।

গানশিপ সরাসরি ইয়টের মাথার ওপর দিয়ে এসে এক পশলা গুলি করল। ইয়টের নাকের সামনে, প্রায় ত্রিশ ফুট দূরে পড়ল বুলেটগুলো।

'আর পরখ করার দরকার নেই,' তাগাদা দিল চন্দনা। 'বোঝাই তো গেল গুলি করার অনুমতি আছে ওদের।'

'তোমার সঙ্গে আমি একমত নই।' রানা বলেই এই বিপদের মধ্যে হাসতে পারল। 'গুলি করার অনুমতিও কয়েক রকমের হয়। ফাঁকা গুলি করা তার মধ্যে একটা।'

হ্যান্ড মাইক থেকে বারবার একই নির্দেশ আসছে। মাঝে

মধ্যে গুলিও হচ্ছে। এক সময় চন্দনাও বুঝতে পারল, গানশিপ ইচ্ছা করেই ইয়টকে টার্গেট করছে না।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে। গানশিপ নাছোড়বান্দার মত লেগে থাকল পিছনে। ইতিমধ্যে সার্চলাইট জ্বেলেছে পাইলট, আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে ইয়ট। উদ্বেগ ও উত্তেজনায় কখনও রানার বাহু আঁকড়ে ধরছে চন্দনা, কখনও কাঁধ। তাকে একটা কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখতে চাইল রানা। 'গ্যালিতে দেখলাম সবই রাখা আছে,' বলল ও। 'তুমি দু'কাপ কফি বানিয়ে আনছ না কেন?'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল চন্দনা, সে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। 'কি বললে? এখন তুমি কফি খেতে পারবে?'

এক হাতে জড়িয়ে ধরে চন্দনাকে কাছে টানল রানা, একটা চুমো খেলো ঠোঁটে। 'আরও অনেক কিছু পারব। তুমি কফি বানিয়ে আনো, তারপর দেখবে আমি নির্দেশ দিলে কেমন লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায় মেজর উন ফেং।'

'যাহ্, মিথ্যে কথা!'

'বিশ্বাস হচ্ছে না? ঠিক আছে, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। তবে তার আগে কফি চাই আমার।'

ছুটে চলে গেল চন্দনা। দু'মগ গরম কফি নিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল আবার। মগে চুমুক দিয়ে হাসল রানা, 'বাহ্, সুন্দর হয়েছে। কি করে জানলে দুধ চিনি খাই আমি।'

'ভুলে গেছ, আমি তোমার ফ্যান?' নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে একটু কামড়ে ধরে হাসছে চন্দনা। তারপর সিরিয়াস দেখাল তাকে। 'আমি কিন্তু ভুলিনি। কই, দেখি তো, কিভাবে তুমি ফেরত পাঠাও গানশিপকে।'

আরেকটা চুমুক দিল রানা। তারপর বলল, 'এই মিয়া, মেজর উন ফেং, কথা কানে যায় না? এই শেষবার বলছি, ঘাঁটিতে ফিরে

যাও।'

জানে কিছুই ঘটবে না, তবু উত্তেজনায় টান-টান হয়ে গানশিপের দিকে তাকিয়ে থাকল চন্দনা। ইতিমধ্যে একশো ফুটের মত পিছিয়ে পড়েছে ওটা, তবে আগের মতই পিছু নিয়ে আসছে। দু'মিনিট পার হয়ে গেল। নতুন কিছুই ঘটল না। নদীর দু'পাশে এখন লোক বসতি দেখা যাচ্ছে না, তীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ঘন কালো জঙ্গল।

'কই?' চন্দনার গলায় একাধারে বিদ্রূপ ও হতাশা।

রানা ভান করল চন্দনার কথা শুনতে পায়নি, ম্যাপটা খুলে কি যেন দেখছে আবার। 'সামনে আরেকটা শাখা পড়বে, ওটা ধরে গেলেও ফুচাং-এ পৌঁছাতে পারব আমরা।'

'এই যে মশাই, আমার সঙ্গে চালাকি করছ কেন?' রানার কাঁধ ধরে ঝাঁকাল চন্দনা। হঠাৎ স্থির হয়ে গেল তার হাত। চেহারায় বিস্ময় ফুটে উঠল। ধীরে-ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে হুইল হাউসের বাইরে, আকাশের দিকে তাকাল সে। এঞ্জিনের আওয়াজ কমে আসছে, এটা আগেই টের পেয়েছে, এখন তাকাতেই দেখতে পেল একটা অর্ধবৃত্ত তৈরি করে ফিরে যাচ্ছে হেলিকপ্টার গানশিপ। দেখতে দেখতে লাল টেইললাইট মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। 'মানে?' বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে চন্দনা। 'সত্যি-সত্যি চলে গেল? কি করে জানলে তুমি, রানা?'

'জাদু,' বলে হাসল রানা।

ছোট্ট মেয়ের মত ডেকে পা ঠুকল চন্দনা। 'না, বলতে হবে আমাকে। এই, বলো না!'

'আরে বোকা, ভেবে দেখো না, একটা হেলিকপ্টারে কতই আর ফুয়েল থাকতে পারে? অর্ধেক ফুয়েল শেষ হয়ে এসেছে ওদের, কাজেই ফিরে না গিয়ে উপায় কি।'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো!'

ইয়টের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল রানা। তীর ও জঙ্গলের দিকে

ঘুরে যাচ্ছে নাকটা। 'গ্যালিতে একটা ছোট বোট দেখেছ না? যাও, রশি খুলে হুকে উইঞ্চের শিকলগুলো পরাও। আমি আসছি।'

'ইয়েস, স্যার!' স্যালুট করল চন্দনা, ছুটে বেরিয়ে গেল হুইল হাউস থেকে।

দু'মিনিট পর ডেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল বোটে রাইফেল দুটো তুলে অপেক্ষা করছে চন্দনা। উইঞ্চের শিকলগুলোও বোটের হুকে পরিয়েছে সে। তার হাতে একগাদা কাপড় ধরিয়ে দিল রানা, বলল, 'একটা কেবিনে পেলাম। শুধু প্যান্ট-শার্ট, দেখো সাইজে মেলে কিনা।'

উইঞ্চ ঘুরিয়ে আউটবোর্ড মোটর লাগানো বোটটা পানিতে নামাল রানা, তারপর মই বেয়ে নেমে এল তাতে, হাত ধরে চন্দনাকেও নামতে সাহায্য করল।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল আউটবোর্ড মোটর। ফুয়েল ট্যাংক আগেই দেখা আছে রানার, কানায়-কানায় ভরা ওটা। তারপরও পাঁচ গ্যালনের তিনটে জেরিক্যান নিয়ে এসে রেখেছিল।

'বিপদ কিন্তু কাটেনি,' বলল ও। 'শুধু ফুয়েল নয়, গানশিপটা নতুন নির্দেশ নিয়ে ফিরে আসবে। সামনের পানিতে ওদের গানবোটও থাকতে পারে, রেডিও মেসেজ পাঠিয়ে এতক্ষণে সতর্ক করে দিয়েছে।'

'জাদুকরের আস্তিনে আর কোন কৌশল নেই?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

'কৌশল থাকে না, বিপদের ধরন দেখে তৈরি করতে হয়। ওদেরকে ফাঁকি দেয়ার এখন একটাই উপায়, শাখা নদীতে ঢুকে পড়া।'

দশ মিনিট পর শাখার মুখটা দেখতে পেল ওরা। বাঁক ঘোরার পর দেখা গেল খুব সরু একটা শাখা, খাল বললেই হয়। আরও দশ মিনিট পর নদীর দু'পাশে মাঝেমধ্যে নৌকা দেখতে পেল ওরা। এক সময় চওড়া হতে শুরু করল নদীটা।

রাত দশটার দিকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল। তাড়াতাড়ি বোট থামাল রানা, তীর থেকে পানির দিকে ঝুঁকে থাকা কয়েকটা গাছের নিচে লুকাবার চেষ্টা করল। একটু পরই সার্চলাইটের আলো পড়ল পানিতে। ওরা যে পথে যাবে সেই জলপথের ওপর দিয়ে ছুটে গেল সামরিক কপ্টার।

'খুঁজছে,' ফিসফিস করল চন্দনা।

'হ্যাঁ।'

'ধরা পড়ে যাচ্ছি দেখলে গুলি করে ফেলে দেয়া যাবে তো?' জিজ্ঞেস করল চন্দনা।

হাসি চেপে রানা বলল, 'ভারতের চীন-বিদ্বেষ দেখছি এতটুকু কমেনি।'

'না!' প্রতিবাদ করল চন্দনা। 'আমি বিদ্বেষ থেকে কথাটা বলিনি! বলছি, যদি...'

'না,' জানিয়ে দিল রানা। 'কোন অবস্থাতেই ওদেরকে গুলি করা যাবে না।'

'কিন্তু যদি ধরা পড়ার অবস্থা হয়?'

'সে তখন দেখা যাবে।'

প্রায় আধ ঘণ্টা পর আবার এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। নদীর মাঝখান দিয়ে ফিরে যাচ্ছে হেলিকপ্টার গানশিপ, সার্চলাইট আগের মতই জ্বলছে।

দু'মিনিট পর আবার স্টার্ট দিয়ে বোট ছেড়ে দিল রানা। সারারাত ফুলস্পীডে ছুটল ওরা। দূর থেকে কয়েকবারই কপ্টার এঞ্জিনের আওয়াজ ভেসে এল, তবে একটাও কাছাকাছি এল না। ভোরের দিকে নদীর দু'পাশে শুধু পাথরের স্তূপ দেখতে পেল ওরা, মাইলের পর মাইল বিস্তৃত। ডাঙায় কোন লোকজন বা ঘর-বাড়ি নেই, নদীতেও নেই কোন জলযান। গোটা এলাকা খাঁ-খাঁ করছে।

সকাল সাতটার দিকে পাথুরে পাহাড়ের ফাঁকে পাশাপাশি

একজোড়া হেলিকপ্টার দেখতে পেল রানা। 'গোটা এলাকা চষে ফেলছে ওরা।' চিন্তিত দেখাল ওকে।

'চুপ!' বলে কান পাতল চন্দনা।

দেখাদেখি রানাও কান পাতল। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ঠিক শুনেছ। একটা বোট আসছে। 'আকাশে কপ্টার, পানিতে বোট–লক্ষণ ভাল নয়, চন্দনা।' বোটের এঞ্জিন বন্ধ করে দিল ও। 'চলো, নেমে পড়ি।'

তীরের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল চন্দনা। 'এই পাথরের রাজ্যে? হারিয়ে যাব না?'

'হারিয়ে যেতেই তো চাই,' বলল রানা। 'তাছাড়া, পাথরই আমাদেরকে লুকিয়ে রাখবে।'

তীরে পৌঁছে বোটটাকেও টেনে তুলল রানা। বড় আকৃতির কয়েকটা বোল্ডারের মাঝখানে, লম্বা ঘাসের ভেতর এমন ভাবে রাখল, ভেতরে না ঢুকলে কেউ দেখতে পাবে না।

'তাড়াতাড়ি করো, ওরা এসে পড়ল যে!' তাগাদা দিল চন্দনা।

বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। একটু পরই গানবোটটাকে দেখতে পেল, তীরবেগে ভাটির দিকে ছুটছে। মর্টার, মেশিনগান সবই তৈরি। সৈনিকদের হাতে বাগিয়ে ধরা রাইফেল। ডেক চেয়ারে বসে আছে যেন একটা বাঘ, মুখটা যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি টকটকে লাল। কাঁধ আর বুকে ব্যাজ ও পদকের ছড়াছড়ি। রানা আন্দাজ করল, ইনিই সম্ভবত কর্নেল তাও চাও তিয়েন। গোটা মিসাইল ঘাঁটি কিভাবে বিলুপ্ত হয়েছে দেখার পর নিজেকে আর ধরে রাখতে পারেননি, নিজেই শিকার ধরতে বেরিয়ে পড়েছেন।

চন্দনার হাত ধরে ছুটল রানা। নদী থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে ওদেরকে।

গানবোট ভাটির দিক থেকে ফিরে আসছে, এঞ্জিনের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল রানা। ওদের সামনে কোন পথ নেই, এমনকি চোখে পড়ার মত জমিনও নেই, শুধু পাথর আর পাথর। সবচেয়ে ছোটগুলো ফুটবল আকৃতির, বড়গুলো মাঝারি আকৃতির একতলা বাড়ি। বড়গুলোকে এড়িয়ে ক্যাঙ্গারুর মত লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে হচ্ছে ওদেরকে।

পিছনে গান বোটের আওয়াজ থেমে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। পাথরের আড়াল থাকায় নদীটা দেখা যাচ্ছে না, তবে সৈনিকদের গলা শুনে বোঝা গেল তীরে নামছে তারা।

এভাবে দৌড়ে একদল আর্মিকে বেশিক্ষণ ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়, জানে রানা। মিরাকল বা অলৌকিক কিছু না ঘটলে ধরা ওদেরকে পড়তেই হবে।

পিছন থেকে সৈনিকদের উল্লাসধ্বনি ভেসে এল।

'বোটটা দেখতে পেয়েছে ওরা!' আতঙ্কে বুজে এল চন্দনার গলা। রাইফেল নিয়ে দৌড়াতে হওয়ায় হাঁপিয়ে গেছে সে, ঘামে ভিজে গেছে ঢোলা শার্ট আর ট্রাউজার।

আর দুশো গজ এগোবার পর পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে জমিন দেখা গেল। এদিকে লম্বা কিছু ঘাসও আছে। অবশ্য ঘাসের ভেতর লুকিয়ে কোন লাভ নেই, সৈনিকরা ঠিকই খুঁজে পাবে। আরও খানিক এগোবার পর একটা পাহাড়ী ঝর্না পড়ল সামনে। আশপাশে প্রচুর বোল্ডার ছড়িয়ে আছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কেমন যেন বিভ্রান্ত লাগছে নিজেকে। চারদিকে ভাল করে তাকাল ও। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো, যেন এই জায়গাটা আগে দেখেছে।

'চিনতে পারছ না?' চাপা গলায় বলল চন্দনা।

এতক্ষণে রানার বিভ্রান্তি কেটে গেল। আরে, এই পথ দিয়েই

তো মিসাইল ঘাঁটিতে গিয়েছিল ওরা! ওই তো সেই ঝর্না, যেখানে শুয়ে ঘুমিয়েছিল। সবুজ শার্ট পরা কিশোর ছেলেটা ওই লম্বা ঘাসের ভেতর দাঁড়িয়ে দেখছিল রানাকে।

সেই ঘাসের দিকে তাকাতে চমকে উঠল রানা। আশ্চর্য বললেও কিছু বলা হয় না, সেই একই জায়গায় এই মুহূর্তেও দাঁড়িয়ে রয়েছে ছেলেটা।

দেখামাত্র তার দিকে রাইফেল তুলল চন্দনা।

'কি করো!' ধমক দিল রানা। 'নামাও ওটা!'

'গুলি করবেন না, প্লীজ,' বলল ছেলেটা, দ্রুত পায়ে ঘাস থেকে বেরিয়ে এসে রানার সামনে দাঁড়াল। 'বোল্ডারের মাথায় উঠে অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের দেখছিলাম। আপনাদের খুব বিপদ, তাই না?'

'আর তাই বুঝি তোর খুব মজা লাগছে?' হিসহিস করে বলল চন্দনা, তবে বাংলায়।

'হ্যাঁ, বিপদেই পড়েছি,' ছেলেটাকে বলল রানা। 'তবে কোন অন্যায় কাজ করে নয়। বলতে পারো একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার ঘটে গেছে। তুমি কি কোন সাহায্য করতে পারো?'

'হ্যাঁ, পারি। সাহায্য করতেও চাই। এই ঝর্নার কিনারা ঘেঁষে দৌড়ান,' বলে একটা পাহাড়ের দিকে হাত তুলল ছেলেটা। 'ওটার নিচ দিয়ে এই ঝর্নার পানি বেরুচ্ছে। ফাঁকটা ছোট, কোনরকমে একজন মানুষ গলতে পারে। তবে কিছুদূর যাবার পর ভেতরটা অনেক চওড়া হয়ে গেছে। দু'মাইল দূরে আরেকটা ছোট ফাঁক গলে বেরুঁতে হবে। কিছুদূর হাঁটলে একটা লেক পাবেন...'

হাত তুলে ছেলেটাকে থামিয়ে দিল রানা, চন্দনাকে বলল, 'তুমি যাও, চন্দনা। ঝর্নার মুখে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আমি এখুনি আসছি।'

দ্বিতীয়বার বলতে হলো না, নির্দেশ মেনে নিয়ে ছুটল চন্দনা।

ছেলেটার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল রানা। তার সরু চোখে

অপলক দৃষ্টি। ভাষাটা পড়া যাচ্ছে না। 'কেন?' শুধু এই একটা শব্দই উচ্চারণ করল রানা।

ছেলেটার চোখের পাতা কাঁপল না, মুখের ভাবও আগের মত নির্লিপ্ত। 'আপনি আমাকে আর আমার মাকে বাঁচিয়েছিলেন,' বলল সে।

হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা।

স্থির পাথুরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকল ছেলেটা।

'তুমি হ্যান্ডশেক করবে না?' হাতটা ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিল রানা।

উত্তর না দিয়ে ঘুরল ছেলেটা, তারপর ছুটল। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রানা। বাবার খুনীর সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি হয়নি সে। তবে ঋণ পরিশোধের সুযোগটাও ছাড়েনি।

ঘুরে রানাও ছুটল। চন্দনা ওর জন্যে টানেলের মুখে অপেক্ষা করছে।

সরু একটা ফাটল দিয়ে কুল-কুল করে পানি বেরুচ্ছে। রানাকে দেখে খুশি তো হলোই না, বরং উদ্বিগ্ন দেখাল চন্দনাকে। জিজ্ঞেস করল, 'ছেলেটাকে বিশ্বাস করা কি উচিত হচ্ছে, রানা? এটা তার কোন ফাঁদ নয় তো? হয়তো বেরুবোর কোনও পথ নেই...'

রানা হাসল। 'তাহলে তো আরও ভাল, বাকিটা জীবন আমার সঙ্গে প্রেম করে কাটিয়ে দিতে পারবে...'

ঠিক পাঁচ মিনিট পর ঝর্নার মুখে পৌঁছালেন কর্নেল তাও চাও তিয়েন, সঙ্গে সবুজ শার্ট পরা সেই ছেলেটা, পিছনে সাতজন অটোমেটিক রাইফেলধারী সৈনিক।

'এই এলাকা আমি খুব ভাল করে চিনি,' ছেলেটাকে বললেন কর্নেল তিয়েন। 'পঁচিশ বছর আগে এই পাথরের রাজ্যে আমরা ট্রেনিং নিয়েছি।' হাত তুলে ফাঁকটা দেখালেন। 'এই ঝর্নার মুখ

দিয়ে বহুবার ভেতরে ঢুকেছি আমি। ভেতরটা চওড়া হয়ে গেছে। আরেক মুখ দিয়ে লেকের কাছাকাছি বেরুনো যায়। তুই ব্যাটা আমার বউয়ের ভাই লাগিস, দুলাভাইকে সত্যি কথা বল। লোকটা জিম্মি মেয়েটাকে নিয়ে এর ভেতর ঢুকেছে, তাই না? তুই তাকে এটা দেখিয়ে দিয়েছিস?'

হাত তুলে দূরের একটা পাহাড় দেখাল ছেলেটা। 'ওইদিকে চলে গেলেন তাঁরা।'

সৈনিকদের একজন ফাঁকটার সামনে বসে নিচু করল মাথা, ভেতরটা দেখার চেষ্টা করছে। 'অন্ধকার।' হঠাৎ পায়ের সামনে, পানিতে, থাবা মারল সে। তার মুঠোয় কিছু একটা ধরা পড়েছে।

'মাছ নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

লোকটা সিধে হয়ে কর্নেলের সামনে মুঠো খুলল। একটা বোতাম, স্যার! কোটের বোতাম মনে হচ্ছে। একদম নতুন।'

'লোকটা, মাসুদ রানা, সুট পরে আছে,' বললেন কর্নেল। 'এই, ভেতরে একজন ঢোকো।'

ক্রল করে ফাঁকের ভেতর ঢুকল একজন সৈনিক। ধীরে-ধীরে তার গোটা শরীর অদৃশ্য হয়ে গেল। কিন্তু এক মিনিট পরই দেখা গেল বেরিয়ে আসছে সে।

'কি হলো?' বাজখাঁই কণ্ঠে জানতে চাইলেন কর্নেল তিয়েন। 'ঢুকেই বেরিয়ে এলে যে? কিছু দূর গিয়ে দেখে আসতে পারলে না?'

'স্যার!' লোকটা উত্তেজিত। সিধে হয়ে আবার মুঠো খুলল সে। সেখানে একই রকম আরেকটা বোতাম।

এবার খেপে গিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন কর্নেল। 'ওরে শালারা, আমি বোতাম চাই না, বোতামের মালিককে চাই! এই, সবাই ঢোকো তোমরা! একদম শেষ মাথা পর্যন্ত যাবে। তোমাদের পিছনে আমিও থাকব। কুইক!'

'মাসুদ রানা কি করেছেন?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'কি করেছে শুনবি? ওই শালা আমাদের একটা মিসাইল ঘাঁটি বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। বহু লোক মারা গেছে। এখনও আগুন জ্বলছে সেখানে। আমাদের প্রধান বিজ্ঞানী ডক্টর কংসু চউ কোনরকমে বেঁচে গেলেও, আঘাত খুব গুরুতর, চিকিৎসার জন্যে বিদেশে চলে গেছেন। কিন্তু তার প্রাইভেট সেক্রেটারিকে জিম্মি করেছে মাসুদ রানা। আর তুই কিনা দেশের এতবড় একটা শত্রুকে সাহায্য করছিস! ছিহ্!'

'কর্নেল! কর্নেল!' হঠাৎ দূর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল। ঝর্নার কিনারা ধরে তীর বেগে ছুটে আসছে একজন সৈনিক, সে-ই চেঁচাচ্ছে। কর্নেলের সামনে এসে হাঁপাতে লাগল।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

'গানবোট থেকে আসছি, কমরেড কর্নেল!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সৈনিক। 'বেইজিং থেকে জরুরী একটা ই-মেইল এসেছে...'

'কই, দাও,' বলে হাত পাতলেন কর্নেল।

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। 'মেজর চাং চু আপনাকে খবর দিতে বললেন, কমরেড! তিনি তো ই-মেইল প্রিন্ট করেননি।'

ঝর্নার মুখে তাকালেন কর্নেল। মাত্র একজন লোক ভেতরে ঢুকেছে, দু'জন ঢোকার জন্যে পানিতে শুয়ে আছে, বাকি চারজন দাঁড়িয়ে। 'তোমরা কেউ এই শালার জোড়া ফুটবলে কষে একটা লাথি মারো,' হুকুম দিলেন তিনি। 'এক মাইল দৌড়ে আমাকে খবর দিতে এসেছে, মেসেজটা সঙ্গে করে আনতে পারেনি!'

লাথি খাবার ভয়ে লোকটা বলল, 'অনুমতি দেন তো এখুনি দৌড়ে গিয়ে নিয়ে আসি, কমরেড!' অনুমতির অপেক্ষায় না থেকে আবার ছুটল সে।

পাঁচ মিনিট নিঃশব্দে কেটে গেল। সৈনিকরা সবাই টানেলের ভেতর ঢুকে পড়েছে।

'আপনি এত মুখ খারাপ করেন কেন?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ছেলেটা। 'তাছাড়া, সবাই আপনার শালা হয় কি করে?'

'চোপ, শালা!' গর্জে উঠল কর্নেল। পরক্ষণেই মস্ত বাঘা গোঁফের নিচে দাঁত দেখা গেল। অবিশ্বাস্য হলেও, ফিক-ফিক করে হাসছেন তিনি। 'আরে, বুঝলি না, এটা আসলে গাল-টাল না। আদর করে বলি। ওরা বোঝেও, তাই শালা বললে খুশিই হয়।'

'কিন্তু আমি খুশি হইনি, কারণ আপনি আমাকে আদর করে শালা বলেছেন, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলতে বলতে একটা বোল্ডারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল রানা, হাতের রাইফেল সরাসরি কর্নেলের বুকে তাক করা। উল্টোদিকের আরেকটা বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরুল চন্দনা, তার রাইফেল ঝর্নার মুখের দিকে তাক করা।

কর্নেল তিয়েনকে মাত্র এক সেকেন্ডের জন্যে বিমূঢ় দেখাল। 'তাহলে বোতাম?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'টোপ,' রানাও সংক্ষেপে জবাব দিল।

'গিলে ভুল করেছি,' স্বীকার করলেন কর্নেল। 'ভুলের প্রায়শ্চিত্তটা কি?'

'প্রায়শ্চিত্ত আমার কথা মন দিয়ে শোনা,' বলল রানা।

'আমাকে আপনি জিম্মি করেছেন, কাজেই আমি যেন আপনাকে পালাবার পথ করে দিই, এই কথা তো?'

'আপনাকে জিম্মি করা হয়নি,' বলল রানা। 'এমনকি আপনাকে আমরা নিরস্ত্রও করছি না।'

'তাহলে?'

'ওই যে বললাম, আমার কথা মন দিয়ে শুনতে হবে আপনাকে।'

'এখানে দাঁড়িয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, বলুন।'

সংক্ষেপে ডক্টর কংসু চউ-এর আসল পরিচয় ও তার সর্বশেষ

ষড়যন্ত্র সম্পর্কে একটা ধারণা দিল রানা। তারপর কোমর থেকে ক্যাসেট দুটো বের করে কর্নেলের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'আমি যে সত্যি কথা বলছি, এই ভিডিও ক্যাসেট দেখলেই তার প্রমাণ পাবেন।'

'আপনার সঙ্গিনী, মিস বন্দনা, ডক্টর কংসু চউ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারি নন বলছেন?'

'বন্দনা মারা গেছে, কর্নেল তিয়েন,' বলল রানা। । তার বোন, চন্দনা–ইন্ডিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স।'

'আর আপনি? আপনার পরিচয়?'

'কেন, কবীর চৌধুরী আমার পরিচয় সম্পর্কে কিছু বলেনি আপনাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তিনি বলেছেন, আপনি ওসামা বিন লাদেনের ডান হাত, কট্টর মৌলবাদী ও জঙ্গি...'

হাসল রানা। 'আপনাকে একটা অনুরোধ করি। ইন্টারনেটে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। অ্যাডমিরাল হো ইন অত্যন্ত স্নেহ করেন আমাকে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই...'

'সিক্রেট সার্ভিস চীফ অ্যাডমিরাল হো ইন?' ভুরু কোঁচকালেন কর্নেল তিয়েন। 'আপনাকে স্নেহ করতেন?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন তিনি।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মারা গেছেন। এটা অবশ্য গোপন তথ্য, মিডিয়াকে জানানো হয়নি,' বললেন কর্নেল। 'দু'বছর হলো মারা গেছেন অ্যাডমিরাল হো ইন ।'

'দুঃখ পেলাম,' বলল রানা আন্তরিক কণ্ঠে। 'ঠিক আছে, ওখানে আমার এক বন্ধু আছে–লিউ ফু-চুং, এজেন্ট। তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমার আসল পরিচয় সে জানে।'

'কি নাম বললেন?'

'লিউ ফু-চুং।'

বিষম খাওয়ার মত অবস্থা হলো কর্নেলের। 'তি-তিনি তো এখন চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের ডেপুটি চীফ! আপনি তাঁকে চেনেন?'

'চিনি মানে? সে আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কাজের ব্যস্ততায় বেশ কিছুদিন যোগাযোগ নেই, এই যা।'

হঠাৎ আবার সেই চিৎকার শোনা গেল, 'কর্নেল! কর্নেল!' ঝর্নার কিনারা ধরে সে-ই সৈনিকটিকেই ছুটে আসতে দেখা গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে কর্নেলের সামনে এসে স্যালিউট দিয়ে দাঁড়াল সে। রানা ও চন্দনাকে দেখে অবাক হলেও ভয় পায়নি, কারণ ওরা দু'জন নিজেদের রাইফেল লম্বা ঘাসের ভেতর ফেলে দিয়েছে।

'এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে কিভাবে?' জানতে চাইলেন কর্নেল।

'সবটুকু যেতে হয়নি, কমরেড কর্নেল,' লোকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'মেজর নিজের ভুল বুঝতে পেরে মেসেজের প্রিন্ট আউট দিয়ে একজনকে পাঠিয়েছেন, তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

'কোথায় সে?'

'আসছে,' বলে ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল লোকটা। 'এখুনি এসে পড়বে...'

'প্রিন্ট আউটটা দাও।' হাত পাতলেন কর্নেল।

আরেকবার থতমত খেয়ে গেল সৈনিক লোকটা। 'সেটা তো ওর কাছে, কমরেড কর্নেল।'

'প্রিন্টআউট যদি ওর কাছেই থাকবে, তাহলে তুই এখানে কি করছিস? এত দৌড়াদৌড়ি করার কি মানে?' অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখলেন কর্নেল।

'ব্যাপারটা খেয়াল করেছেন, কর্নেল?' জিজ্ঞেস করল কিশোর ছেলেটা। 'আপনি শালা বলতে ভুলে গেছেন!'

'চোপ…!' গর্জে উঠেও থেমে গেলেন কর্নেল তিয়েন। অমায়িক হেসে ছেলেটাকে বললেন, 'দেখছিস না, এখানে একজন ভদ্রমহিলা রয়েছেন।' রানার দিকে তাকালেন। 'হ্যাঁ, তো, আপনি দাবি করছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর কংসু চউ একজন ক্রিমিনাল, এই ক্যাসেট দুটো তা প্রমাণ করবে? আরও দাবি করছেন, চীনকে আপনি একটা মহাসঙ্কট থেকে উদ্ধার করেছেন। আবার এ-ও বলছেন যে চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের ডেপুটি চীফ লিউ ফু-চুং আপনার বন্ধু?'

রানার কিছু বলা হলো না, আরেকজন সৈনিক ছুটে এসে কর্নেলের সামনে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। তার হাত থেকে প্রিন্টআউটটা নিয়ে পড়লেন তিনি। চোখ-মুখ আরও লাল, আরও থমথমে হয়ে উঠল। রানার দিকে তাকালেন, ওর মুখের সামনে আঙুল নেড়ে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, ওই শালাকে আমি ছাড়ব না।'

রানা বিমূঢ়। 'কার কথা বলছেন?'

প্রিন্টআউটটা দেখালেন কর্নেল। 'বেইজিং থেকে সিক্রেট সার্ভিস হেডকোয়ার্টার বলছে, আপনি আমাদের পরম মিত্র। এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে ডক্টর কংসু চউ নিশ্চয়ই আমাদের শত্রু! এখন আমি ওই শালাকে ধরতে যাব!' সৈনিকদের দিকে তাকালেন। 'এই, টানেল থেকে বেরুতে বলো ওদের।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমরা তাহলে এখন যেতে পারি?'

প্রায় আঁতকে উঠলেন কর্নেল। 'যাবার কথা ওঠে কি করে?' প্রিন্টআউটটা আবার দেখালেন। 'এখানে আরও কি আছে তা তো আপনাকে বলাই হয়নি।'

'কি আছে?'

'প্রথমে, শালা বলার জন্যে দুঃখিত, মিস্টার রানা। কারণ, বেইজিং থেকে বলা হয়েছে, আপনাকে যেন জামাই আদর করা হয়। কোথাও যেতে হবে না, স্যার। গানবোট থেকে মেসেজ

পাঠিয়ে দশ মিনিটের মধ্যে আমি একটা হেলিকপ্টার আনিয়ে দিচ্ছি। বেইজিঙে ওঁরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'আর আমি?' জানতে চাইল চন্দনা। 'বিদেশী স্পাই হিসেবে গ্রেফতার করা হচ্ছে আমাকে?'

'না,' বললেন কর্নেল। 'আপনাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বেইজিং-এ। এই সুযোগে আপনাকে সম্মানের সঙ্গে দেশে ফেরত পাঠিয়ে আমরা ভারতের প্রতি বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে চাই।'

কর্নেলের সঙ্গে রওনা হতে গিয়েও থেমে কিশোরের কাঁধে হাত রাখল রানা। বলল, 'বিশ্বাস করো, আমি খুন করিনি তোমার বাবাকে। সত্যিই ওটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

পিছন ফিরে ফুঁপিয়ে উঠল ছেলেটা, তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

***

বিশেষ দ্রষ্টব্য

সেবা প্রকাশনীর প্রকাশিত গত চার বছর আগের প্রায় সকল বই পাঠক-পাঠিকার জন্য ৪০% কমিশনে বিক্রি হচ্ছে। আজই যোগাযোগ করুন। এই সুবিধা সীমিত সময়ের জন্য। অফিস চলাকালীন সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মাসুদ রানা সিরিজের আগামী বই

গোপন শত্রু

কাজী আনোয়ার হোসেন

এই দেশের প্রতি আপনার ভালবাসা নিঃস্বার্থ ও নির্ভেজাল। আপনি জানতে পারলেন ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের গোপন কিছু জরিপ রেকর্ডে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিপুল পরিমাণে খনিজ তেল আছে। আপনি তো আনন্দে আত্মহারা। কিন্তু তারপরই জানা গেল, ফোরবল নামে একটা ক্রাইম সিন্ডিকেট সেই তেল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। যদি সুযোগ থাকে, আপনার ইচ্ছে হবে না নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও ওদেরকে বাধা দিতে? এই পরিস্থিতিতে আপনি হলে যা করতেন, মাসুদ রানাও ঠিক তাই করেছে। এবং বিশ্বাস করুন, সেই 'বোতামটা' সত্যি ও টিপেছিল।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

আলোচনা

এই বিভাগে রহস্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সংকুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, বা বিষয়বস্তু পুরানো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। —কা. আ. হোসেন।

(অনেকগুলো চমৎকার চিঠি ছাপা গেল না চিঠির পাতায় ঠিকানা নেই বলে। আলোচনার শুরুতেই নিজের নাম-ঠিকানা লিখলে সবচেয়ে ভাল হয়।)

রাজিব আহমেদ সুজয়

আহ্সানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

কেমন আছেন? আমি? মোটেই ভাল নেই। হচ্ছে কি এসব? রানাকে মারার ফন্দি আঁটা হচ্ছে, না? সাবধান। এ কাজ যদি করেন, তাহলে···তাহলে আমি সেবা প্রকাশনী ভাসিয়ে দিব, স্রেফ চোখের জল দিয়ে। 'পালাও, রানা' বইয়ের আলোচনা বিভাগ দেখে আর চুপ থাকতে পারলাম না। ইচ্ছা হচ্ছে মে. জেনারেলকে দিয়ে আপনার উপর কিছুক্ষণ অগ্নিবর্ষণ করাই। রানার শেষ বইয়ে চিরনবীনটিকে না মারলে কি এমন ক্ষতি, কাজীদা? দয়া করে এমনটি করবেন না। প্লী···জ।

প্রথম চিঠিতেই একতরফা ঝগড়া করলাম, এইজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

* না-না, ঝগড়া কোথায়? দাবি।

এইচ. এম. আজম

মহেশখালী, কক্সবাজার।

আমি রানা সিরিজের একজন সাধারণ পাঠক। তাঁর সাথে আমার প্রথম পরিচয় 'রুদ্রঝড়ে'। ঝড়ের সময় তিনি এলেন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে। তারপর তাকে দেখি মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে অপারেশন চালিয়েছেন বসনিয়াতে। সবার সাথে তিনি বন্ধুর মত। তাই তাঁকে এখন থেকে তুমিই

বলব বলে ঠিক করছি। রানাকে দেখলাম দেশের মান বাঁচাতে ও ফিলিস্তিনী সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবন বাজী রেখে ইসরায়েলীদের ধ্বংস করে 'দুর্গম গিরি' পাড়ি দিয়ে বিজয় মালা ছিনিয়ে আনতে। তখন থেকে তার প্রতি আমার দুর্বলতা বাড়তে থাকে। যখন দেখলাম 'জন্মভূমি'র মান বাঁচাতে শত্রুদের 'বিষাক্ত থাবা'কে উপেক্ষা করে তাদের মধ্যে 'মহাপ্রলয়' ঘটিয়ে দিল তখনই রানার সম্পূর্ণ ভক্ত হয়ে গেলাম। এখন তাকে দেখার জন্য মন কাঁদে। সে কোন বিপদে পড়তে যাচ্ছে শুনলে হৃৎপিণ্ডের গতি ১২০ (একশত বিশ) এ পৌঁছে। তখন প্রার্থনা করি যেন কোন কিছু 'বিস্মরণ' না হয় এবং তাকে বলি 'রানা! সাবধান!!' তার সামনে কোন বিপদ আসলে সে বিপদে নিজেকে জড়িয়ে তাকে বাঁচাতে ইচ্ছে হয়।

চিঠিখানা ছাপানোর আবেদন জানিয়ে এখানেই ইতি টানলাম।

* আপনার দীর্ঘ চিঠির সবটুকু ছাপানো গেল না। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

আসিফ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

৩/এ, পুরানা পল্টন ইস্টার্ন ইডেন, ফ্ল্যাট নং ১/৫০১, ঢাকা।

প্রিয় সেবা'র সকল সদস্যগণকে শুভেচ্ছা। বিশেষ করে টিপুদা, রকিবদা ও কাজীদাকে। নিশ্চই ভাল আছেন? আমি একজন নতুন ভক্ত। (বিলিভ ইট অর নট) আমি এ বছরে তিন গোয়েন্দার শুরু থেকে 'যুদ্ধযাত্রা' পর্যন্ত যত বই আছে সব শেষ করেছি। 'পোষা ডাইনোসর' পড়ে আনন্দ পেলাম কারণ এখানে দুটি বই একত্রে। মাসুদ রানার অনেক বই কিনে এবং যোগাড় করে পড়া চালিয়ে যাচ্ছি সবচেয়ে ভাল লেগেছে কুহেলি রাত, রুদ্রঝড়, কিলার কোবরা, নরকের ঠিকানা, সেই পাগল বৈজ্ঞানিক, মৃত্যুপথের যাত্রী এবং আরও অনেক বই। টিপুদা, আমি আপনারও সব বই পড়েছি এবং ভাল লেগেছে।

পোষা ডাইনোসর পড়ে বুঝলাম আবু সাঈদ বলে কেউ নেই। ওটা রকিবদারই ছদ্মনাম। কেন রকিবদা? কেন? কি চান আপনি আমাদের মত পাঠকের কাছ থেকে? আপনি কি বাচ্চা কেউ যে, মা-বাবার ভয়ে ছদ্মনাম নিয়ে কবিতা লিখছেন? নাকি কিছুদিন পর জানা যাবে রকিব হাসানও নেই, ওটা কাজীদারই ছদ্মনাম? দেখুন, আপনারা বড় মানুষ। আপনাদের সাথে আমি বেয়াদবি করতে পারব না। শুধু আমার মনের দুঃখের কথাটা জানালাম। যদি আপনি দুঃখ পান তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। মাফ করে দেবেন।

* ছদ্মনামে লেখাকে আপনার অন্যায় মনে করার কারণটা ঠিক পরিষ্কার হলো না। কেন আপনার মনে হচ্ছে এটা পাঠক ঠকাবার জন্য লেখকের চালাকি বা অপকৌশল? পৃথিবী জুড়ে ভূরি-ভূরি দৃষ্টান্ত আছে, অনেক লেখক আট-দশটা ছদ্মনামও ব্যবহার করেছেন।

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই **মানি-অর্ডার যোগে** ১০০.০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন এক বা একাধিক সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ১৬ পৃষ্ঠার মূল্য তালিকার জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **দয়া করে খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোনও বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০.০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো যাবে।

আগামী বই

২/৬/'০২ মহাকাশের কিশোর (তিন গোয়েন্দা) রকিব হাসান

বিষয়: স্বপ্নটাকে প্রথমে গুরুত্ব দিল না রবিন। বাজপাখি 'জ্যাক' জানাল আজব স্বপ্ন সে-ও দেখে; কাতর হয়ে কে যেন ডাকে। সাহায্য চায়। কিশোর, মুসা আর জিনাও যখন একই স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করল, গুরুত্ব না দিয়ে আর পারা গেল না। সাগর যাত্রায় তৈরি হলো তিন গোয়েন্দা। ডলফিন রূপে।

আরও আসছে

৬/৬/'০২ দ্য লস্ট কিং	(কিশোর ক্লাসিক)	রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী শাহনূর হোসেন
১০/৬/'০২ দুর্ভোগ	(ওয়েস্টার্ন)	গোলাম মাওলা নঈম
১৬/৬/'০২ চাইল্ড অভ স্টর্ম	(অনুবাদ)	হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড/কাজী মায়মুর হোসেন
২০/৬/'০২ গোপন শত্রু	(রানা ৩১৬)	কাজী আনোয়ার হোসেন
২০/৬/'০২ জুয়াড়ি ১+২	(রানা রিপ্রিন্ট)	কাজী আনোয়ার হোসেন
২৭/৬/'০২ রহস্যপত্রিকা	(১৮ বর্ষ ৯ সংখ্যা)	জুলাই, ২০০২

মাসুদ রানা

চীনে সঙ্কট

কাজী আনোয়ার হোসেন

শুরু হল মাসুদ রানার সুইসাইডাল মিশন-রোমাঞ্চকর চীন অভিযান; সঙ্গে থাকছে আর্ট কলেজের দুই ভারতীয় ছাত্রী। আটঘাট বেঁধেই নেমেছে ড. কংসু চউ, অ্যাটম বোমা ফেলে বাংলাদেশকে নতি স্বীকার করাবে সে।

শুরুতেই দুজন পাকিস্তানি এজেন্ট খুন হয়ে গেল, হামলা হল ভারতীয় ও বাংলাদেশী এজেন্টদের উপর।

পাগলা বিজ্ঞানী ওকে বাগে পেয়ে বিজয়ীর হাসি হাসল। এখান থেকে ছাড়া পেলেও রক্ষা নেই রানার, ওকে ধরার জন্য রেগুলার আর্মি নিয়ে অপেক্ষা করছেন মেজর জেনারেল তাও চাও তিয়েন।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুমঃ ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০